কার্ত্তিক, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

দুর্গামঙ্গল

অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

আজ আমরা একজন জন্মান্ধ কবির কাব্যের পরিচয়, আপনাদিগের কাছে উপস্থাপিত করিলাম। এই কবির নাম—ভবানীপ্রসাদ কর রায়। ইহাঁর প্রণীত "ভবানী-মঙ্গল" গ্রন্থ 'দুর্গা-মঙ্গল' নামে ব্যোমকেশ মুস্তফীর সম্পাদকত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিয়াছেন,—

"ইংলণ্ডের অন্ধ-কবি মিল্‌টনের অস্তিত্বে ইংলণ্ডের যে গৌরব, জন্মান্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের অস্তিত্ব আবিষ্কারে বঙ্গদেশের সেরূপ গৌরব কতকটা যে হইবে না, তাহা ত বলিতে পারি না! মিল্‌টনের মৌলিক রচনা জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য—'Paradise Lost' কাব্যজগতে যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে, ভবানীপ্রসাদের "ভবানী মঙ্গল" (দুর্গামঙ্গল) সে আসন পাইতে পারে না, কিন্তু সে জন্য

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আলোচনার যোগ্য অনেক বিষয় আছে। সেই অতি পুরাতন যুগে বাঙ্গালীর সামাজিক চিত্রের পরিচয়, আমরা সেকালের সাহিত্যের ভিতরেই পাই। যাঁহারা বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন, তাঁহারা সেই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতরে হাজার বছর আগের বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাইবেন। "বৌদ্ধ গান ও দোহা" "ডাকের বচন", "খনার বচন", "শূন্য পুরাণ", "মাণিকচন্দ্রের গান", "গোবিন্দচন্দ্রের গীত", "ময়নামতীর গান", "সূর্য্যের গান", "চণ্ডীকাব্য" প্রভৃতি পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে সে-কালের বাঙ্গালীর ধর্ম্মগত ও সমাজগত যে উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল্য সামান্য নহে। কবিত্ব-মাধুর্য্যেও এই সকল লেখা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার একান্ত সমাদরের যোগ্য।

উভয় কবির অবস্থাগতিকে গৌরবের বিশেষ তারতম্য না হওয়াই উচিত।"—(২৸৵০ পৃঃ)

ইংলণ্ডের মিল্‌টনের ন্যায় ভবানীপ্রসাদের বঙ্গে সমাদর দূরের কথা, এইরূপ একজন জন্মান্ধ কবি যে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি কাব্য লিখিয়াছেন, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়াও আমরা অনেকে তাহার সন্ধান রাখি না।

"ভবানী-মঙ্গল" গ্রন্থখানি প্রধানতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'চণ্ডী' অবলম্বনে লিখিত। অনেক স্থানে ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় শক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশক অনেকগুলি 'চণ্ডী' কাব্য দেখা যায়। মাণিকদত্ত বোধ হয় এইরূপ চণ্ডী কাব্যের প্রথম রচয়িতা। মাণিক দত্তকে অনেকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন [বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়", ৩০০ পৃঃ]। পরে হরিরাম, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ অনেকে দেবী-মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ভবানীপ্রসাদের "ভবানী-মঙ্গলে"র বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দেবীমাহাত্ম্য প্রকাশক পৌরাণিক কথা অনুসৃত হইয়াছে এবং গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারে গ্রন্থকার রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ও আগমনী-বিজয়ার কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন।

কবি ভবানীপ্রসাদ প্রধানতঃ চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেও গ্রন্থের আরম্ভভাগে সুকৌশলে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ও গৌরীর পিতৃগৃহে যাত্রার কথা বর্ণন করিয়াছেন। বাল্মীকীয় রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের উল্লেখ না থাকিলেও এ ঘটনা যে পুরাণ-সম্মত,

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।"

ইত্যাদি "কালিকাপুরাণে"র বচনই তাহার প্রমাণ।

কবি ভবানীপ্রসাদ এই ভাবে গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন যে, রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রতীরে ধনুর্ব্বাণহস্তে বসিয়া আছেন, চারিদিকে সুগ্রীবাদি বানরেরা উপবিষ্ট—

"চৌদিকে বানরমধ্যে বৈসে রঘুবর।
নক্ষত্রবেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর॥
রামচন্দ্র বসিয়াছে পাতি মৃগছাল।
বীরগণ বসিলা ভাঙ্গিয়া বৃক্ষডাল॥"

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সমুদ্রবন্ধনের কোনই আয়োজন হয় নাই। তাই,—

"সুগ্রীবের স্থানে রাম জিজ্ঞাসে বচন।
সমুদ্র তরিতে মিতা করহ যতন॥
দুরন্ত সমুদ্র ঘোর নাহি কূলস্থল।
যথা দৃষ্টি চলে তথা দেখি মাত্র জল॥
দেবরথ নাহি চলে যাহার উপর।
কি মতে তাহাতে পার হইবে বানর॥
সমুদ্র নহিবে বান্ধা রাবণ সংহার।
করিতে না পারি আমি সীতার উদ্ধার॥
রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিতে নারি।
অবশ্য ত্যজিব প্রাণ অনলেতে পড়ি॥
কোন্ মুখে যাব আমি অযোধ্যা নগরে।
কি কথা কহিব গিয়া ভরত গোচরে।"

—এই ভাবে রামচন্দ্র অনেক বিলাপ করিলেন। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি-কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলিলেন,—

"পূর্ব্ব সূর্য্যবংশে ছিল সগর রাজন।
সমুদ্র তাঁহার কীর্ত্তি জানে সর্ব্বজন॥
তদন্তরে জন্মেছিল ভগীরথ নাম।
গঙ্গা আনি পৃথিবী করিলা পরিত্রাণ॥
অপরে জন্মিল গাধি রাজার নন্দন।
ক্ষত্রিয় শরীরে তেঁহো হইলা ব্রাহ্মণ॥
পৃথিবী বিখ্যাত সেহি বিশ্বামিত্র ঋষি।
তপোবলে চণ্ডালীকে কৈলা স্বর্গবাসী॥
দশরথ মহারাজা বিখ্যাত ভুবনে।
শনিকে করিলা জয় নিজ বাহুরণে॥
সেহি বংশে জন্মিলাম মুই কুলাঙ্গার।
নারী রাখিবারে শক্তি না হৈল আমার॥"

রামচন্দ্র আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

সুগ্রীব নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল; কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না।

"হেন কালে জাম্বুবান্ কহে আগ হইয়া॥
যোড় হাত হৈয়া জাম্বুবান্ কহে বাদ।
নিবেদন করি প্রভু শুন রঘুনাথ॥
যে মতে সমুদ্র প্রভু হইবে দমন।
যে মতে হইবে রাম রাবণ নিধন॥

যে মতে করিবা তুমি সীতার উদ্ধার।
মন দিয়া শুন প্রভু রঘুর কুমার॥"—

মহামুনি অগস্ত্য এক অঞ্জলিতে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আনিয়া সমুদ্র শোষণের ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে অনায়াসে লঙ্কায় গিয়া রাবণকে বধ করিতে পারিবেন এবং সীতার উদ্ধার হইবে।

"স্মরণ করহ মুনি আসিবে নিশ্চয়॥"

অগস্ত্য মুনি আসিলে রাম তাঁহাকে সীতাহরণের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া সীতার উদ্ধারের জন্য আর একবার সমুদ্র পান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মুনি বলিলেন,—

"পুনঃ পুনঃ নীর পান উচিত না হয়।
অপরাধ বিনে কিছু পুণ্যনাশ হয়॥"—

আপনি অম্বিকার পূজা করুন, তাহাতেই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।—

"শুন রাম অভয়ার চরণ কর সার।
রাবণ বধিয়া কর সীতার উদ্ধার।"

রামচন্দ্র তখন দুর্গার মাহাত্ম্য ও পূজার বিধিব্যবস্থা জানিতে চাহিলেন।

মুনি, পূজার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিলেন,—

"বসন্তে করিল পূজা সুরথ রাজন।
সেহি মতে কর পূজা অকাল আশ্বিন॥
দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী রূপধারী।
সেহি মতে কর পূজা তুমি নরহরি॥
কৃষ্ণপক্ষ নবম্যাদি দশপঞ্চ দিনে।
প্রতিপদ্ আদি করি পূজে কোন জনে॥
ষষ্ঠী আদি কল্প আছে পূজার বিধান।
তিন মত পূজা আছে শুনহ শ্রীরাম॥
প্রতিমা করিয়া পূজা করে কোন জন।
কেহ কেহ করে পূজা কুম্ভেতে স্থাপন॥
পত্রিকা স্থাপিয়া কেহ পূজে নারায়ণী।
তিন মত পূজা এহি শুন রঘুমণি॥"

অগস্ত্য ইহার পর দক্ষকর্ত্তৃক শিব-অপমানে সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের গৃহে তাঁহার জন্ম, বিবাহ ও কৈলাসে অবস্থিতির বর্ণন করিয়া বলিলেন,—

"একদিন নিশিশেষে মেনকা সুন্দরী।
স্বপনে দেখিলা রাণী সিয়রে প্রাণগৌরী।"

এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে কবি ভবানীপ্রসাদ 'আগমনী'র উপাখ্যান উত্থাপন করিয়াছেন।

রাণী মেনকা স্বপ্নে কন্যাকে দেখিয়া তাহাকে হিমালয়ে আনিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। পিতামাতার আজ্ঞায় মৈনাক, ভগিনীকে আনিবার জন্য কৈলাস যাত্রা করিলেন।

মৈনাক শিবকে প্রণাম ও স্তব করিয়া বলিলেন,—

"বিবাহের সূত্র করে গৌরী আল্যা তব ঘরে
না দেখিয়া মরে হিমগিরি॥
না দেখিয়া চাঁদমুখ বিদরে মায়ের বুক
গৌরী ছাড়ি দেও শূলপাণি।
যদি নাহি কৃপা কর শুন প্রভু মহেশ্বর
তবে মরে জনক জননী॥"

গৌরীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে শিবের দক্ষযজ্ঞের সেই অরুন্তুদ ঘটনা মনে পড়িল। তাই তিনি মৈনাকের অনুরোধ শুনিয়া নীরবে রহিলেন।—

মৈনাকের স্তব শুনিয়া মহেশ্বর।
মৌন হইয়া রহিল কিছু না দিল উত্তর॥"

গৌরী অদূরেই ছিলেন, তাঁহার—

"ভাইক দেখি মনে পৈল জনক জননী।
মৈনাকের হাতে ধরি বলে প্রিয়বাণী॥
কহ ত মৈনাক ভাই কহ সমাচার।
কুশলে আছেন পিতা জননী আমার॥"

মৈনাক বলিলেন,—

"———— দেবি কি কহিব আর।
তোমা বিনে গিরিপুর হইয়াছে অন্ধকার॥"

তাই তিনি গৌরীকে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন,—এমন কি, শেষে বলিলেন,—

"যদি না যাইবা তুমি আমার ভুবন।
তোমা বিনে বাপ মায় তেজিবে জীবন॥"

পিতামাতাকে দেখিবার জন্য গৌরীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিলেও তিনি স্বাধীন-প্রকৃতি রমণীগণের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিলেন না—

"পার্ব্বতী বোলেন ভাই শোন সমাচার।
আমার হইল ইচ্ছা মাতা দেখিবার॥
শঙ্করের বিনা আজ্ঞা যাইব কি মতে।"

পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি পাইবার জন্য গৌরী শঙ্করের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু—

"শঙ্কর বোলেন তোমায় না দিব বিদায়।
দক্ষ-অপমান দেবি মোর মনে ভয়॥
আর বার যাইতে চাহ বাপের ভুবন।
কৈলাস ছাঁড়িবা বুঝি হেন লয় মন॥"

দেবী কহিলেন,—

"———শুন প্রভু করি নিবেদন।
পূজা লহিবার যাই পিতার ভুবন॥
তথা থাকি ত্রৈলোক্যের লইব পূজন।
যাওয়ার কারণ এহি শুন পঞ্চানন॥
ষষ্ঠী আদি কল্প করি নবমীর দিনে।
কৈলাসে আসিব পুন দশমী বিহানে॥"

এইভাবে শিবকে বুঝাইয়া কেবল চারিদিনের জন্য দেবী উমা বিদায় লইলেন। তখন—

"শিখিপৃষ্ঠে কার্ত্তিক মূষিকে গজানন।
জয়া বিজয়া আদি যত সখীগণ॥
চলিলা ডাকিনী আর যতেক শাখিনী।
সঙ্গতি চলিলা তবে চৌষট্টি যোগিনী॥
নাচিয়া গাইয়া চলে বেতাল ভৈরব।
গাল বাজাইয়া করে হর হর রব॥"

ইহার মধ্যে একজন আসিয়া হিমালয়ে সংবাদ দিল যে, মৈনাক, উমাকে লইয়া আসিতেছে। মেনকা পথ চাহিয়া ছিলেন, কাজেই—

"গৌরী আইল হেন কথা মেনকা শুনিয়া।
আরোপিল পূর্ণ কুম্ভ দূর্ব্বা ধান্য লইয়া॥
প্রতি ঘরে আলিপন সুগন্ধি চন্দন।
সুগন্ধি ষড়ঙ্গ ধূপে কৈল আমোদন॥
ঘরের উপরে সব নেতের পতাকা।
দেখি (য়া) আনন্দ বড় হইল মেনকা॥
ষোড়শী বয়সী যত পর্ব্বতকুমারী।
থরে থরে দাঁড়াইল হইয়া সারি সারি॥
কার হাতে আছে (শ্বেত) চন্দনের খুরী।
কাহার হাতেতে জ্বলে রতন দিয়ারী॥"

গৌরীর শুভাগমনে এইভাবে হিমালয়, উৎসবে পরিপূর্ণ হইল। অনেক দিন পরে সন্তানের দেখা পাইয়া মেনকার অন্তঃকরণ, বাৎসল্য-রসের সুধা-ধারায় ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"বহুদিনে দেখিলাম গৌরীর বদন।
নির্জ্জীব শরীরে যেন সঞ্চারে জীবন॥
যে অবধি হর নিকেতনে গেলা চলি।
তদবধি আছি মাগো মা ডাকের কাঙ্গালী॥
পুন যদি দয়া করি আসিলা অভয়া।
জনম সফল করি ডাক মা বলিয়া॥
এত বলি গৌরীকে লইয়া নিজ ঘরে চলে।
খট্টাতে বসিয়া চাঁদমুখ নেহালে॥"

গৌরী শঙ্করের নিকট বলিয়া আসিয়াছিলেন,—

'পূজা লইবারে যাই পিতার ভুবন॥
তথা থাকি ত্রৈলোক্যের লইব পূজন।'

তা'ই,—

"কত কত দশভুজা হইলা পার্ব্বতী॥
হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া দশভুজা।
তথা বসি লইলেন ত্রৈলোক্যের পূজা॥
দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীরূপ ধরি।
স্বর্গমর্ত্ত পাতালে চলিলা মহেশ্বরী॥"

এইখানে শ্রীরামচন্দ্র, অগস্ত্য মুনিকে প্রশ্ন করিলেন,—

"দশভুজা মূর্ত্তি দেবী হইলা কি কারণ॥
... ...
কেমন মহিমা তাঁর কি মত আচার।
বিশেষিয়া কহ মুনি করিয়া বিস্তার॥"

মুনি কহিলেন,—

চারি বেদে আগমে পুরাণে গুণ গায়।
ব্রহ্মা আদি দেবে যার অন্ত নাহি পায়॥
বিধি বিষ্ণু অগোচর ত্রিগুণ-জননী।
নিরঞ্জন নিরাকার সাকাররূপিণী॥
মনোভূত দর্পহরি (?) দিতে নারে সীমা।
কি কহিতে পারি আমি তাঁহার মহিমা॥
যে মত শুনেছি রাম মার্কণ্ড পুরাণে।
সেহি কথা কহি কিছু তোমা বিদ্যমানে॥"

এইভাবে উপক্রম করিয়া কবি ভবানীপ্রসাদ অগস্ত্য মুনির মুখে সমস্ত "চণ্ডীর" ভাবানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই অনুবাদের মধ্যেও মাধুর্য্য আছে।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

ইত্যাদি দেবীস্তুতির অনুবাদে অন্ধ ভক্ত কবি লিখিয়াছেন,—

"যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
... ...
জাতিরূপে জাতিভেদ করে যেহি জনে।
তিনবার নমস্কার তাঁহার চরণে॥"

দেবী-মাহাত্ম্য প্রকাশক 'চণ্ডী' শুনিয়া—

"যোড়হাতে পুছে রাম মুনির গোচর।
কি কার্য্য করিব এখন কহ মুনিবর॥"

তখন—

"অগস্ত্যে বোলেন রাম কর অবধান।
কহিনু তোমাকে যেহি পূজার বিধান॥
মৃন্ময়ী দশভুজা করিয়া নির্ম্মাণ।
ভক্তিতে করহ পূজা সিদ্ধি হবে কাম॥
... ...
সমুদ্র হইবে বান্দা রাবণ সংহার।
হেলায় করিবা রাম সীতার উদ্ধার॥"

কিন্তু এক সমস্যা উপস্থিত হইল, প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে কে? সুগ্রীব বলিলেন, নল নীল, বিশ্বকর্ম্মার পুত্র;—

"তাহারা করিতে পারে প্রতিমা গঠন।—
আমি সবে করি অন্য দ্রব্যের আয়োজন॥"

নল নীল যে দেবী-প্রতিমা গড়িল, কবি তাহার বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"বদন শারদ ইন্দু কি মোহন শোভা।
ইন্দীবর জিনি দুই লোচনের আভা॥
মৃগমদ চর্চ্চিত তিলক বিন্দু বিন্দু।
হেরিয়া লজ্জিত তাহে শরতের ইন্দু॥
খগচঞ্চু নাসাতে বেসর মুক্তাফল।
রতন নূপুর পদে করে ঝলমল॥
শ্রুতিমূলে কর্ণফুলে তপ্ত হেমচাকী।
নীলপদ্মে স্বর্ণভৃঙ্গ করে ঝিকিমিকি॥
চাচর কেশের বেণী পবনে দোলায়।
নবীন মেঘেতে যেন বিদ্যুৎ খেলায়॥
... ...
অতসী কুসুম জিনি অঙ্গের বরণ।
নির্ম্মাইল দশভুজ মৃণাল যেমন॥
... ...
মহিষের স্কন্ধে বামপদ আরোহণ।
সিংহের পৃষ্ঠেতে দিল দক্ষিণ চরণ॥
... ...
বামহাতে ধরে দেবী অসুরের চুল।
দক্ষিণ হস্তেতে বুকে হানিছে ত্রিশূল॥
... ...
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী।
মস্তক উপরে নিলা বৃষে পশুপতি॥
ডাহিনেতে গণপতি বামে ষড়ানন।
ময়ূর বাহনে অতি দেখিতে শোভন॥
এহি মতে করিলেন প্রতিমা গঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল যত দেবগণ॥"

প্রতিমা গঠিত হইলে—

"বানরেরে আজ্ঞা দিলা কমল লোচন।
আনিল পূজার দ্রব্য করি আয়োজন॥
তবে পূজা আরম্ভিলা রাম নরহরি।
পুরোহিত হৈলা ব্রহ্মা হাতে কুশ করি॥"

তা'রপর বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের রীতিতে ষষ্ঠীতে বোধন, বিল্ববরণ, অধিবাস, সপ্তমীতে পত্রিকা প্রবেশ, মাষভক্তবলি, মহাস্নান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, গণেশাদি দেবতার পূজা, অঙ্গন্যাসাদি ধ্যান, মানসোপচারে পূজা ও পুনর্ব্বার ধ্যানের পর—

"মূলমন্ত্র উচ্চারণ করি রঘুমণি।
ষোল উপচারে পূজা করে নারায়ণী।"

ষোড়শ উপচারের ক্রমও কবি সুন্দর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন;—

"রজত আসন পূর্ব্বে দিলা রঘুনাথ।
স্বাগত বচন কহে করি প্রণিপাত॥

পুন আচমনী দিয়া করাইলা স্নান।
বিচিত্র বসন দিলা কাঞ্চনে নির্ম্মাণ॥
কাঞ্চনে নির্ম্মিত জত দিলা আভরণ।
সুগন্ধি চন্দন রাম কৈলা সমর্পণ॥
লক্ষ লক্ষ নীল পদ্ম চন্দনে মাখিয়া।
অভয়ার পদে রাম দিলা সমর্পিয়া।"

এইভাবে ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নিবেদনান্তে প্রতিমাস্থ দেবতার পূজা, আচরণ পূজা করিয়া—

"পূজা সমাপিলা রাম সপ্তমীর দিনে॥"

সপ্তমীর ন্যায় অষ্টমী নবমীতেও বিধিমত পূজা হইল। তিন দিনই ছাগ মহিষাদি বহু বলির ব্যবস্থা ছিল। বলির অন্তে—

"সমাংস রুধির রাম করে সমর্পণ।"

পূজা সাঙ্গ করিয়া রাম হোম আরম্ভ করিলেন—

"নবীন শ্রীফল-পত্র ঘৃতেতে মাখিয়া।
অগ্নিমধ্যে দিলা তাক মূল উচ্চারিয়া॥"

রামচন্দ্রের এই পূজারূপ তপস্যায় দেবী তুষ্ট হইলেন। দেবী বর দিতে প্রস্তুত হইলে রামচন্দ্র বহু স্তুতি করিয়া কহিলেন,—

"যদি বর দিবা তুমি নিবেদন করি আমি
বর দেহ কাটি দশস্কন্ধ।
পার হইয়া যাই তথা, উদ্ধার করিব সীতা
হেলায় সাগর হয় বন্ধ॥"

দেবী বর দিলেন। রামচন্দ্র আর একটী বর প্রার্থনা করিয়া লইলেন,—এই অকাল আশ্বিন মাসে—

"ভক্তি করি এহি পূজা করিবে যেহি জন।
যার যেহি বাঞ্ছা সিদ্ধি হইবে তখন॥"

দেবী অন্তর্হিত হইলে রাম বিজয়া দশমীর প্রাতঃকালে নির্ম্মাল্যবাসিনীর পূজা করিয়া বিসর্জ্জন করিলেন।

এইবারে কবি আবার কৌশলে বিজয়ার অবতারণা করিয়াছেন।

"নবমী যামিনী যদি হৈল অবসান।
কৈলাসেতে উচ্চাটন শঙ্করের প্রাণ॥"

মহাদেবের আজ্ঞায় নন্দী বৃষ সাজাইয়া আনিল। শিব তাহাতে আরোহণ করিয়া নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া গৌরী আনিতে হিমাচলে চলিলেন। শঙ্কর সপারিষদে হিমালয়ে উপস্থিত হইলে—

"মেনকার দেখি শিব উড়িল জীবন।
গৌরী নিতে আইল শিব বুঝিলা তখন॥"

রাণী মেনকা কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। গিরিরাজ অস্থির হইয়া উঠিলেন। 'আবার এক বৎসর পরে অবশ্য আসিব'—

"এহি বলি বাপ মাএ করিয়া আশ্বাস।
শিবের সঙ্গেতে দেবী চলিলা কৈলাস॥"

গিরিপুর অন্ধকার হইল।—সংক্ষেপে গ্রন্থের আখ্যান বস্তু এইরূপ।

গ্রন্থকার ভবানীপ্রসাদ, জন্মান্ধ, ইহা তিনি এই গ্রন্থ মধ্যেই একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।—

"ভবানীপ্রসাদ বলে ভবানীর পায়।
"জন্ম অন্ধ ভগবতি কৈরাছ আমায়।"—(১১৩ পৃঃ)
"জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে।
অক্ষর পরিচয় নাহি লিখিবার তরে॥"—(১৩৭ পৃঃ)
"ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া ব্যাকুল।
চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কূল॥"—(১৫৪ পৃঃ)
"জন্মকাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত॥"—(২০০ পৃঃ)

কবি অন্ধ হইলেও তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি, তাঁহাকে গ্রন্থ রচনায় প্ররোচিত করিয়াছিল। ভক্ত কবি লিখিয়াছেন,—

"জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন বটি জন্ম অন্ধ।
শরীরে ত নাহি মোর শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
ভাল মন্দ দোষগুণ নাহিক বিচার।
স্বপনে কহিলা মাতা ভাষা রচিবার॥
কণ্ঠে থাকি ভগবতী যে কহিলা বাণী।
তাহা প্রকাশিনু আমি অন্য নাহি জানি॥"—(১১৪ পৃঃ)

ইহা প্রকৃত বিদ্বানের বিনয়-বাণী—যথার্থ ভক্তের আত্ম-নিবেদন। কবির অক্ষর-পরিচয় না থাকিলেও শাস্ত্র-শ্রবণ ছিল। এই 'শ্রবণের' পর তিনি যে অনন্যচিত্তে 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসন' করিয়াছিলেন, সে পরিচয়, গ্রন্থের অনেক স্থানেই আছে। কবি যে ভাবে ভগবতীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন ও পূজাপদ্ধতির যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক বলিয়াই মনে হয়।

প্রত্যেক দেশের সাহিত্য পাঠ করিলে সেই দেশের জাতীয় প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য, সমাজের

দর্পণ। বৈদেশিক সাহিত্যের প্লাবনের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালীর জাতীয় প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইয়াছে, স্বীকার করিলেও তাহা যে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আজও বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে রামায়ণ মহাভারতের কথকতা, চণ্ডীর গান, পদাবলীর কীর্ত্তন সিংহাসন পাতিয়া বসিয়া আছে। যাঁহারা এই সকল সাহিত্যকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া তিরস্কার করেন, তাঁহাদিগকে কবি রবীন্দ্রনাথের—

"শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন, এমন অবস্থায় চরিত্র বর্ণনা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে। যথাযথের সীমা কোন্ খানে এবং কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাব্যকলা অতিশয়ে গিয়া পৌঁছে এক কথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে না।.....প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত, অন্যের কাছে তাহাই প্রকৃত।"—[প্রাচীন সাহিত্য]

—এই উক্তি স্মরণ করিতে বলি।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সেকালের আগমনী-গীতি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ফলতঃ যদি প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষার রীতির নমুনা দেখিতে হয় তাহা হইলে দু পাঁচজন পুরাতন গ্রন্থকারের রচনা ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না।.....একটি গান আমার মুখস্থ আছে, সেটি হাটে বাজারে ভিখারীরা গাহিয়া দু' এক পয়সা উপার্জ্জন করে। সেই ১০।১২ পংক্তির মধ্যে প্রকৃত বাঙ্গালা রীতির এত নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখনকার তর্জ্জমা করা আধা :ইংরাজী লেখা যাঁহাদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের সর্ব্বদা সেই ১০।১২ পংক্তি চক্ষুর সম্মুখে রাখা মন্দ নহে।.....এমন সরল ভক্ত খাঁটী বাঙ্গালী কবি এখন আর জন্মে না কেন?"—[পুরাতন প্রসঙ্গ]।

তবে কি বাঙ্গালা সাহিত্য চিরকালই এক ভাবে থাকিবে? বিদেশ হইতে বৈভব সংগ্রহ করিয়া তাহার পরিপুষ্টির চেষ্টা কি অসঙ্গত? ইহার উত্তরে বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, "প্রবন্ধ-পঞ্চক" পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই পুনরুক্তি করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

".....পরিবর্ত্তন ও পরিপুষ্টি এক জিনিষ নয়। যে সকল বাহ্য উপকরণের দ্বারা সাধারণতঃ শরীর পরিপুষ্ট হয়, অন্তর্হিত শক্তি রূপান্তরিত হইলে সেই উপকরণগুলিই আবার অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যের জন্য বাহ্য উপকরণগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু কেবলমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য স্তূপীকৃত করিলেই তাহারা নিজ হইতে রক্ত-মাংসে পরিণত হইতে পারে না। যে আভ্যন্তরীণ শক্তিটী এই পরিণতির মূল কারণ, সেই শক্তি যত দিন অটুট থাকে, তত দিনই বাহ্যবস্তু মঙ্গলের আকর হয়। কিন্তু যখন অনভ্যস্ত বৈদেশিক বস্তুর চাপে ঐ সমীকরণী শক্তি নষ্ট হয়,—তখন সেই বস্তুই অনিষ্টের মূল হইয়া পড়ে। তেমনই সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টিসাধনের জন্য বহির্জগতের সঙ্গে আদান প্রদানের দ্বার উন্মুক্তই রাখিতে হইবে; কারণ, বদ্ধ মন্দিরে রস-লহরীর বিচিত্র লীলার অবসর হয় না। কিন্তু কেবল বৈচিত্র্য-লালসায় রস-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে সেখানে আর জাতীয় সাহিত্যের প্রাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যকে চণ্ডীদাস বা দাশরথির ছাঁচে ঢালা সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু এ কথা ভুলিলেও চলিবে না যে, বৈদেশিক পদ্ধতির অনুকরণ করিলেই তাহা বঙ্গসাহিত্য হইবে না; বিদেশী সাহিত্যের বাঙ্গলা সংস্করণ ও বিদেশী ভাবে পরিপুষ্ট বঙ্গসাহিত্য এক জিনিষ নয়। যখন আমরা বঙ্গ-দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া সাহিত্যকে বিশ্বক্ষেত্রে টানিয়া লইতে চাই, তখন এ কথাটী মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, বাঙ্গালা বিশ্বের বাহিরে নাই, ব্যষ্টির বিশিষ্টতাকে নষ্ট করিয়া যে বিশ্বের রচনা করা হয় তাহা সঙ্কীর্ণ বিশ্ব অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক।"—[বঙ্গসাহিত্য ১ম বর্ষ ৩য় খণ্ড]

"দুর্গামঙ্গলে"র কবি ভবানীপ্রসাদের পিতার নাম নয়ন কৃষ্ণ রায়। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য, উপাধি কর রায়। আটিয়া পরগণায় কাটালিয়া গ্রামে কবির নিবাস। পিতা মাতা কবির অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হন। এই সকল কথা তিনি গ্রন্থের নানা স্থানে নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

কবি জন্মদুঃখী ছিলেন। তিনি নিজের জীবনের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা কালীনাথ তাঁহাকে আদর-যত্ন করিতেন; কিন্তু কালীনাথের পুত্র দুইটী—বিশেষতঃ কনিষ্ঠ পুত্রটী স্বায় দুশ্চরিত্রতার জন্য জন্মান্ধ পিতৃব্যের প্রতি বড়ই অসদ্ব্যবহার করিত। সে ব্যবহার এতই অসহনীয় হইয়াছিল যে, কবি

গ্রন্থে পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখ করিয়া ইষ্টদেবীর কাছে জানাইয়াছেন,—

"এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিলা সদায়।
তোমার চরণ বিনা না দেখি উপায়॥
দুষ্ট হাত হৈতে কালি কর অব্যাহতি।
তুমি না তুরাইলে মোর হবে অধোগতি॥
মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার।
এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার॥
আমি অঙ্গক্রিয়াহীন না দেখি উপায়।
শরণ লৈয়াছি মাতা তব রাঙ্গা পায়॥"

(২০১—২ পৃঃ)

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" লেখক তাঁহার এই স্বজাতি কবির প্রতি সুবিচার করেন নাই। তাঁহার লেখার ভাবে মনে হয়, তিনি অন্ধ কবির এই আক্ষেপোক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার ধারণা, "কবি স্বীয় পারিবারিক বিদ্বেষ বশতঃ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিবার সুযোগ লইয়া অপরের গ্লানি" করিয়াছেন। "তজ্জন্য তাঁহার প্রতি শ্লেষ প্রয়োগ করিয়া আমাদের কবির প্রেতাত্মাকে রুষ্ট করা সুরুচির পরিচায়ক কিংবা ভূতযোনিতে বিশ্বাস করিলে নিরাপদ হইবে না।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪৪৫ পৃঃ) অর্থাৎ ভূতের ভয় না থাকিলে লেখক অন্ধ কবির প্রতি আরও শ্লেষ-বাক্যের প্রয়োগ করিতেন। তথাপি লেখক, কবিকে একেবারে রেহাই দেন নাই,—তাঁহার পদ্যের মিলের দোষ ধরিয়াছেন। অন্ধ কবি, "কথা" ও "বৈরতা" "রাজন" ও "পরাক্রম" "শ্রীরাম" ও "জাম্বুবান্" "অনুপম ও "প্রজাগণ" ইত্যাদি মিল কবিয়াছেন। কিন্তু এই অধম মিলের জন্য অন্ধ কবিকে দোষ দিতে হইলে প্রাচীন প্রায় সমস্ত কাব্যকেই দুষ্ট বলিতে হয়। "কিন্তু ভবানীপ্রসাদ এই ভাবের যেরূপ ঘন ঘন প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্য কোন কবির রচনায় সেরূপ দেখা যায় নাই।" এ নির্দ্দেশও আমরা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না।

গ্রন্থের প্রথম আবিষ্কারক রসিকচন্দ্র বসু—

"চন্দ্র মুনি * * আর দিক্ নিয়া সাথে।
রচিল পুস্তক রায় প্রকাশ করিতে॥"

গ্রন্থশেষোক্ত এই প্রমাণ অনুসারে ১০৭১ সন বাহির করিয়া কবি ভবানীপ্রসাদকে ১৩০৩ বঙ্গাব্দের প্রবন্ধে দুইশত বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছিলেন। "বঙ্গভাষা সাহিত্যে"র লেখকও সম্ভবতঃ এই প্রমাণ অনুসারে লিখিয়াছেন,—"ভবানীপ্রসাদ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন"; (৪র্থ সংস্করণ) কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "চন্দ্রমুনি—" শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"এই কবিতার প্রথম চরণে দুইটী বর্ণের লোপ হইয়াছে। আদর্শ পুঁথিতে ঐ স্থান গলিত বা পোকায় কাটা থাকায় রসিক বাবুর প্রতিলিপিতে ঐ স্থানে তারা-চিহ্ন দেওয়া আছে।.....রসিকবাবু ১০৭১ সন ধরিয়া কবিকে দুই শত বর্ষের পূর্ব্বের লোক ধরিয়াছেন; কিন্তু সন কি শকাব্দ, তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় তারা-চিহ্ন স্থানে কোন অঙ্কবোধক শব্দ ছিল বলিয়া ধরিয়া লইলে উহাকে শকাব্দের অঙ্ক না বলিয়া পারা যাইবে না।"

—এই ভাবে আলোচনা করিয়া ব্যোমকেশ বাবু কবিকে ১৪৭১ শকাব্দার লোক স্থির করিয়া তাঁহাকে চৈতন্য যুগের প্রথম শতাব্দীর কবি বলিয়াছেন। কিন্তু প্রদর্শিত শ্লোক হইতে ১৪৭১ শকাব্দা কিরূপে বাহির হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তা'রপর "চন্দ্রমুনি"—ইহার পর অঙ্কবোধক শব্দ ছিল স্বীকার করিলে ১০৭১ বা ১৪৭১—এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সময়ই বাহির হইতে পারে না। তবে গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণে 'চৈতন্য-বন্দনা' দেখিয়া তিনি চৈতন্য যুগের পরবর্ত্তী কবি, এইমাত্র জানিতে পারা যায়।

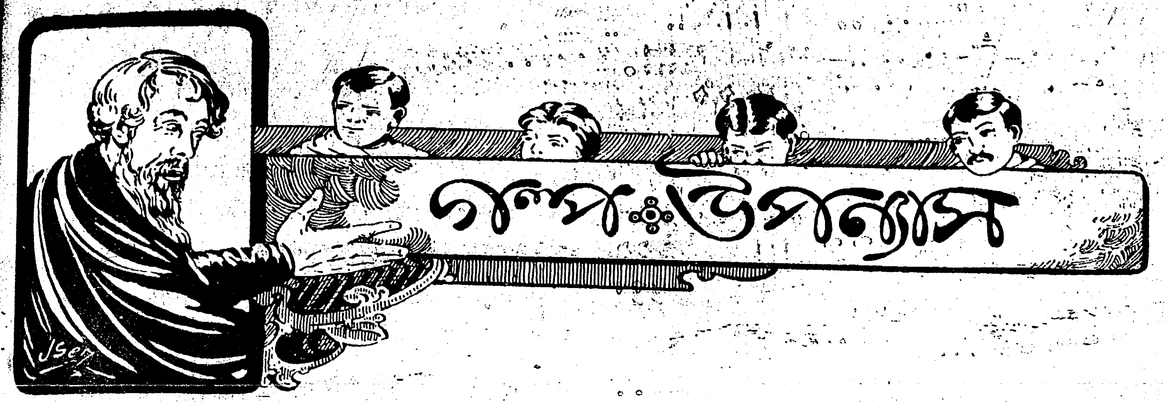

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতীদেবী সরস্বতী

(৩)

পূজা আসিয়া পড়িল। সারা বঙ্গ মায়ের আগমনের সাড়া পাইয়া পুলকে ভরিয়া উঠিল। ধনীর সুরম্য হর্ম্ম্য হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর—সব স্থানেই আনন্দ বিরাজ করিতে লাগিল। আনন্দময়ীর আগমন উপলক্ষে সকলের মরা প্রাণে জীবন-সঞ্চার হইল। রোগী রোগ-যাতনা ভুলিল, শোক-কাতর শোক ভুলিল।

মৃত বাংলার বুকে জীবন-সঞ্চারের সময় এই। তাই এ সময় পথে-ঘাটে প্রফুল্ল-মুখ নর-নারীকে দেখিতে পাওয়া যায়। চিররুগ্ন যে, জীবন বহন করা যাহার পক্ষে একেবারেই দুর্ব্বিষহ, সেও এ সময়ে রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়,—এক বৎসর পরে জগজ্জননী মাতৃমূর্ত্তি দেখিবার আশায় সেও ব্যগ্র হইয়া উঠে।

প্রবাসী এ সময় দেশে ফিরিয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখিয়া বিদেশবাসের সকল কষ্ট বিস্মৃত হয়। তাহার হৃদয়ে এ সময় বিরাজ করে সুবিমল শান্তি, মুখে ফুটিয়া উঠে আনন্দের দীপ্তি।

মা আসিতেছেন, তাই আকাশ আজ সুনীল। মাঝে মাঝে অতীত বর্ষার স্মৃতি সম দুই-এক খণ্ড শ্বেতাকার মেঘ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া আবার ভাসিতে ভাসিতে বহুদূরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিতেই চোখে আসিয়া পড়ে প্রভাতের শান্তস্নিগ্ধ তরুণ তপনের তরুণ আলোর একটু রেখা,—নির্ম্মল বিপুল আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে।

পাখীরা শরৎ-গীতি গাহিয়া সেই নীলাকাশের গা ঘেঁসিয়া দলে দলে উড়িয়া যাইতেছে! গৃহের পার্শ্বে শেফালী ফুলগুলি ফুটিয়া সারারাত মধুর গন্ধ বিকীর্ণ করিয়া এখন প্রভাত-বায়ু-স্পর্শে ঝরিয়া মাটিতে পড়িতেছে,—ঝরাফুলের গন্ধে এখনও চারিদিক প্লাবিত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মহানন্দে ফুল কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। ছোট পুষ্করিণীর ওধারে ঘন বাঁশবন—তাহার মধ্যে অন্য গাছও আছে। পাখীর দল সেই বাঁশবনে নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছে। প্রভাতের তরুণ সূর্য্যের আলো বাঁশঝাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল, পাতাগুলি চিকমিক করিতেছিল। ঘন পাতার ফাঁক দিয়া সে আলো এখনও ভিতরে পড়িতে পারে নাই,—ভিতরটা ছায়াপূর্ণ সুশীতল। একটা সরু বাঁশের আগায় গুটিকত কচি পাতা বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝি বসন্ত-সমাগম-ভ্রমে একটী পাপিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছিল—চোখ গেল, চোখ গেল; বহুদূর হইতে আর একটা পাপিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছিল।

চিরবসন্ত এই স্থানটীতে বিরাজমান। তেমনি শ্যামল লতা-পাতায় জড়াজড়ি, মাতামাতি খেলা; তেমনি পাখীর গান; তেমনি মৃদুমন্দ বহমান বাতাস। পুষ্করিণীর কালো জলে একটীও পানা ছিল না। বাতাসে পুষ্করিণীর স্থির জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছিল। তাহার উপর সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িয়া ঝিকিমিকি করিয়া জ্বলিতেছে। পুষ্করিণীর তীরে অবস্থিত কলাগাছের সারি; তাহার ছায়া জলে পড়িয়া তরঙ্গের আঘাতে কাঁপিতেছে।

সত্য একটা ছিপ লইয়া মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে ছোট ঘাটের উপর বসিয়াছিল। বাগান ও পুষ্করিণী বিক্রয় করিয়া দিয়াও উপেন্দ্রনাথ এ গুলি জমা লইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার খিড়কিতে এই পুষ্করিণীটি থাকায় সকল কাজের সুবিধা ছিল। বাড়ীর ঠিক সম্মুখে পথের ধারে একটী বড় ও পরিষ্কার পুষ্করিণী ছিল। তাহাতে যাইতে গেলে সকল লোকের সম্মুখ দিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কাজেই সে পুষ্করিণীতে সদাসর্ব্বদা যাওয়া দেবীর পক্ষে বড় কষ্টকর ছিল। এই পুষ্করিণীটী খিড়কিতে থাকায় দেবীর সকল দিকেই সুবিধা ছিল, প্রকাশ্যে বাহির হইবার আবশ্যকতা তাহার ছিল না। এই পুষ্করিণীটি পথ হইতে দেখা যায় না।

মাছ যে কতবার টোপ খাইয়া পলাইল, তাহার ঠিক নাই। অন্যমনা সত্য চাহিয়া ছিল সেই চিরবসন্তের লীলা-ভূমি বাঁশবনের দিকে। কত নামজানা পাখী, কত অজ্ঞাত-নামা পাখী সেখানে উড়িতেছে, নাচিতেছে, গান গাহিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দৃশ্য দেখিতে বিভোর হইয়া সে ছিপখানা জলে ফেলিয়াই বসিয়া ছিল, অন্য দিকে তাহার মোটে খেয়ালই ছিল না।

পিছনে ঝন্‌ৎ করিয়া চাবীর শব্দ হইল। সত্য চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, একগোছা বাসন দুই হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেবী। মুখখানা তাহার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, দুই হাত বাসনে যুক্ত থাকায় সে মুখের উপরে অবগুণ্ঠন নামাইয়া দিতে পারে নাই। প্রভাতের তরুণ তপনের কিরণ মুক্ত ভাবেই তাহার সুন্দর মুখখানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। মৃদু বাতাসে তাহার চূর্ণ অলকগুচ্ছ ললাটের উপর অসংযত ভাবে পড়িয়া নাচিতেছিল। অঞ্চলটা যে পিছনে পায়ের তলায় পড়িয়া লুটাইতেছিল, সেদিকে তাহার মোটে খেয়াল ছিল না।

মাথার উপর দিয়া একটা পাপিয়া ডাকিয়া উড়িয়া গেল। তাহার চীৎকারে মোহমুগ্ধ সত্যর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে একটু হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া বলিল, "ঘাটে নামবে, তা নাম। ওই বাসনের গোছা নিয়ে অমন ভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ,—কষ্ট হচ্ছে না?"

একটু হাসির রেখা দেবীর মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে মুখ অবনত করিয়া ঘাটে নামিয়া বাসন নামাইয়া রাখিল।

সত্য বঁড়শিতে টোপ গাঁথিতে গাঁথিতে বলিল, "কিন্তু বড় বেমানান হয়ে গেল দেবী, জীবন্ত কাব্যটা গড়ে তুলতে তুলতে হঠাৎ মাটী হয়ে গেল। পেছন হতে যদি বাসনের গোছা না নিয়ে আসতে, হঠাৎ যদি পুকুরের ওধারকার বনজঙ্গল ফাঁক করে ওই সাদা জায়গাটায় এসে দাঁড়াতে, ওপরের ওই ফুলভরা লতাগুলো ঝুলে যদি তোমার মাথায় বুকে বাহুতে লুটিয়ে পড়ত, তবেই ঠিক হতো,—ঠিক যেন বনদেবী আমার মৌন তপস্যায় বিচলিতা হয়ে উঠে আর থাকতে না পেরে আমার সামনে ভেসে উঠত।"

দেবী নত হইয়া বাঁ হাতটা ধুইয়া মাথার কাপড়টা একটু নামাইয়া ললাট পর্য্যন্ত দিতে দিতে বলিল, "আমারই ভুল হয়ে গেছে, তোমার মনের খবরটা জানতে পারি নি। তুমি যে বনদেবীর মূর্ত্তির কথা ভাবছিলে, তা যদি জানতে পারতুম, তা হলে এদিক দিয়ে না এসে ওদিক দিয়ে এসে ঠিক তোমার নির্দ্দেশিত জায়গাতেই দাঁড়াতুম।"

সত্য বিমুগ্ধনেত্রে তাহার সুন্দর মুখখানার পানে তাকাইয়া বলিল, "ঘোমটা আবার টানছো কেন দেবী? দিনের বেলা খোলা মুখ তো কখনই দেখতে পেলুম না! আজ যদিও বা হঠাৎ একটুখানি দেখতে পেলুম, তাও আবার দেড়হাত ঘোমটা টেনে ঢেকে ফেলছো।"

দেবী একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, "দেড় হাত? মিথ্যে কথা বলো না, এই তো মাত্র চোখ পর্য্যন্ত নামিয়েছি।"

সত্য বলিল, "ও-টুকু এখন না দিলেই বা কি ক্ষতি হতো? কেউ তো এখানে নেই যে দেখতে পাবে?"

দেবী বলিল, "এখনই ঠাকুরঝি আসবে যে। সে বলে দিলে—আমার খানকতক বাসন মাজা হলেই সে নিয়ে যাবে।"

"ওঃ, তবে আর একটু বেশী করে ঘোমটাটা দাও, নইলে ওইটুকু ঘোমটা থাকলে সে তোমায় একেবারে বেহায়া বলে ডাকবে—" বলিয়া সত্য যেন একটু রাগ করিয়াই নিবিষ্টচিত্তে মাছধরার দিকে দৃষ্টি করিল।

কিন্তু ফাতনার দিকে তাহার দৃষ্টি বড় বেশীক্ষণ নিবদ্ধ রহিল না,—একটু পরেই দৃষ্টি ঘুরিয়া দেবীর সুগৌর সুগোল কমনীয় হাতখানার উপর গিয়া পড়িল। হা ভগবান! এমন হাত দুখানি কি শুধু সংসারের কাজ করিবার জন্যই সৃজিত হইয়াছে? সত্যর কি এমন ক্ষমতা হইবে না যে এই হাত দুখানিকে এই সব দাসীযোগ্য কাজ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অত্যন্ত কোমল স্বরে ডাকিল, "দেবী—"

অন্যমনস্কা দেবী এ আহ্বানের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই সে চমকাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিল; দেখিল, স্বামীর করুণ নেত্র দুইটী তাহারই মুখের উপর পতিত। দেবীর চোখ লজ্জাভরে নত হইয়া পড়িল। মুখখানা নত করিয়া সে নিবিষ্টমনে বাসন মাজিতে মাজিতে অন্যমনস্কার মত উত্তর দিল "কি বলছো?"

সত্য করুণ সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাসন মাজতে খুব কষ্ট হয়, না?"

স্বামীর এ প্রশ্নের অর্থ দেবী কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে বাসন মাজা হইতে বিরত হইয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

সত্য গভীর সুরে বলিল, "এমন দিন চিরদিন থাকবে না দেবী, চিরকাল তোমায় এ কষ্ট সইতে হবে না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমি যদি একটা মানুষ হতে পারি, তবে আমাদের সকল কষ্ট ঘুচবে। ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না?"

তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। দেবী শান্ত সুরে বলিল, "চাইবেন না এমন কথা হতে পারে না, চাইবেন বই কি। মনের মধ্যে বিশ্বাস রেখো—তিনি তোমায় মানুষ করে দেবেনই। তোমার যা কাজ তাই তুমি করে যাও, তার ফল অবশ্যই পাবে। আমার কষ্ট ভেবে কাতর হচ্ছো,—এতে আমার কষ্ট এতটুকু নেই। আমি মিথ্যে কথা বলছিনে,—তুমি স্বামী, দেবতা, তোমার সামনে মিথ্যে কথা বললে আমার নরকেও স্থান হবে না জানি। এই কাজ করতে আমি যে কত আনন্দ পাই, তা তুমি জানতে পার না বলেই মনে কর আমার কষ্ট হচ্ছে। কাজ আমায় করতে না দিলে আমি মরে যাব—কাজ ছাড়া আমি একদণ্ড থাকতে পারি নে। দুদিন মাত্র অসুখ হয়েছিল, তার জন্যে ঠাকুরঝি আমায় চার পাঁচ দিন কাজ করতে দেয় নি, রাঁধতে দেয় নি; আমার তখন যা অবস্থা হয়েছিল, তা আর তোমায় কি বলব। শেষে সত্যিই যখন কেঁদে ফেললুম—"

বলিতে বলিতে সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই সরল হাসিমাখা মুখখানা দেখিয়া সত্য সব বেদনা ভুলিয়া গেল, সে তন্ময় হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

দেবী হাসি সামলাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দাও,—আমি বেশ আছি, এতটুকু কষ্টও আমার নেই। তুমি যা করছ কর, আর একটা বছর বই তো নয়। তার পর পাশটা দেওয়া হলেই একটা কাজ নিশ্চয়ই করবে। তখন ইচ্ছে করলে একটা ঝি রাখা যেতে পারবে।"

সত্য মুখ ফিরাইয়া বেদনাভরা কণ্ঠে বলিল, "তা আর কি করে হবে দেবী, আমার পড়া যে একেবারেই বন্ধ হচ্ছে।"

দেবীর মনে চকিতে শ্বশুরের সেই কথাগুলা জাগিয়া উঠিল। সে অন্যমনা হইয়া বলিল, "কেন?"

"বাবা আর খরচ চালাতে পারছেন না।" বলিয়া সত্য আবার নিবিষ্ট মনে বঁড়শিতে টোপ গাঁথিতে লাগিল। দেবীও নীরবে বাসন ধুইতে লাগিল।

সুতা জলে ফেলিয়া সত্য দেবীর পানে চাহিল; বলিল, "আর পড়াশুনা হবে না, এবার চাকরীর চেষ্টায় বেরুতে হবে। বাবা বললেন, চাকরী না করলে আর সংসার চলছে না, তিনি অপারগ হয়ে পড়েছেন। তবে কি করে আর পড়াশুনা চলবে দেবী, কিন্তু—"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসকে সে আর কোনমতে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না, অতর্কিতে দেবীর সম্মুখেই বাহির হইয়া পড়িল। সে বলিল—"মাত্র একটা বছরের জন্যে পড়াটা আমার বৃথা হয়ে গেল। এই পাশটা দিতে পারলে একটা মানুষ হওয়ার আশা থাকত, বড় কাজও পেতে পারতুম; কিন্তু কিছুই হল না দেবী, আমার আশা স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেল। বাবা মাসে বার টাকা করে দিতেন, বাকি টাকা টিউশানী করে যে কষ্টে যোগাড় করতুম, তা কোন দিনই বলি নি দেবী। বড় আশায় আমি কোন কষ্টকে কষ্ট

বলে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নি। যেমন তেমন করে যদি আর একটা বছরও পড়াটা চালাতে পারতুম,—"

সে আর কথাটা শেষ করিল না।

দেবী ধীরে ধীরে বলিল, "একটা কথা বলব, শুনবে?"

সত্য একটু হাসিল, বলিল, "কি রকম কথা, একটা বছর আমার পড়ার খরচ তুমি চালাবে?"

দেবী কথার উপর একটু জোর দিয়া বলিল, "যদিই চালাই সেটা তো নিন্দনীয় কাজ নয়। তোমার এক বছরের পড়ার খরচ যা লাগে, তা আমি দেব, তুমি পড়। এত বড় একটা ক্ষোভ তোমার মনের মধ্যে থেকে যাবে, সেটা আমার বড় অসহ্য।"

সত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি আছে তোমার যা দেবে?"

দেবী অবনত মুখে বাসন ধুইয়া সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "আমার তো কয়েকখানা গয়না আছে।"

"তোমার গয়না?" বিস্ফারিত চোখে সত্য দেবীর পানে চাহিল।

দেবী মুখ তুলিল, যুগল নয়নের স্থিরদৃষ্টি সত্যর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমার গয়না। কি হবে সেগুলো অনর্থক তুলে রেখে—বল তো? আমি সেই বিয়ের সময় ছাড়া সেগুলো আর পরি নি, এখন পরবও না। বাক্স সাজিয়ে মন ঠাণ্ডা করে তুলে রাখবার জন্যে তো গয়নার সৃষ্টি হয় নি, সৃষ্টি হয়েছে আপদে-বিপদে পড়লে রক্ষা করবার জন্যে। সামান্য টাকার জন্য তোমার এতকালের আশা, এত কষ্ট স্বীকার সবই মাটী হবে, আর সে গয়না আমি যক্ষের ধনের মত বাক্স ভরে আগ্‌লে বসে থাকব, এও কি কখনও হতে পারে?"

সত্য অপলকনেত্রে স্ত্রীর সুন্দর সরল পবিত্র মুখখানার পানে চাহিয়া ছিল, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, তা হয় না দেবী।"

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হয় না?"

সত্য উত্তর দিল, "কেন হয় না, এর কারণও তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে? আজ দুই বছর বিয়ে হয়েছে—একটী দিনের জন্যেও তোমায় সুখী করতে পেরেছি কি? তোমার হাতের কাজ একটী দিনের জন্যে তোমার হাত এড়াতে পেরেছে কি? পরণে একখানা ভাল কাপড় দিতে পারিনি, একখানা গয়না এ পর্য্যন্ত তোমায় দিতে পারি নি। তোমার বাপের বাড়ীর দেওয়া যে গয়না কখানা রয়েছে, অবশেষে তাও কেড়ে নেব? ছিঃ, এমন স্বার্থপর আমি এখনও হই নি দেবী, তোমার গায়ের গয়না নেবার প্রবৃত্তি এখনও মনে আসে নি।"

দেবী একটু হাসিল, বলিল, "স্বার্থপরের কথাই বটে! কি যে বল তার ঠিক নেই। গয়না আমার না তোমার? আমার বাবা গয়না আমায় দিয়েছেন না তোমায় দিয়েছেন? এ কি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? না হয় মনে কর—তোমার দরকার পড়েছে তাই গয়না কখানা আমার কাছ হতে ধার নিচ্ছ। যখন তোমার সুসময় হবে, তখন আমার জিনিস আমাকেই ফেরত দেবে। বরং না হয় কিছু সুদ হিসাব করে দিয়ো।"

সত্য চিন্তাবিষ্টের মতন খানিক বসিয়া রহিল। দেবী বলিল, "এতে এত ভাবনার যে কি দরকার, তা আমি বুঝতে পারছি নে। আমার কথা শোনো, সংসার এখন যেমন চলছে এমনি চলুক। তুমি আর একটা বছরে পাশ করে বার হও। তার পর এমন দিন যে থাকবে না সে জানা কথা। সংসারের জন্যে তোমার এখন একটুও ভাবতে হবে না।"

সত্য একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "আর উপায় যখন নেই, অথচ পড়াটা এখন ছাড়তেও যখন আমার মন সরছে না, তখন বাধ্য হয়েই তোমার টাকা আমায় নিতে হল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তোমায় এর ডবল গয়না দিতে পারি।"

ছার গহনা,—দেবীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার হাতের শাঁখা লোহা ও সিঁথার সিঁদুর বজায় থাক। শাঁখা যত গৌরব দিতে পারে সোণার চুড়ি তত দিতে পারে না। সোণা যে-সে পরিতে পারে; কিন্তু শাঁখা আয়ুষ্মতী ব্যতীত আর কেহই পরিতে পারে না।

তথাপি স্বামীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সে বলিল, "সে কি আর একবার করে প্রার্থনা করব? দামোদরের কাছে আমি প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করি—তিনি যেন তোমার ভালই করেন।"

সত্য উৎসুক ভাবে বলিল, "আর তোমার?"

দেবী হাসিল, "তোমার হলেই আমার হবে। তুমি যদি বড় কাজ পাও, আমায় তার ভাগ তো দিতেই হবে।"

সত্যর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, "তাই বটে, তুমি যে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, আমার সহধর্ম্মিণী।"

দেবী বাসন তুলিতে তুলিতে বলিল, "আর যদি মরে যাই তা হলে—"

"আবার ওই কথা দেবী!" সত্য রাগ করিল।

ত্রস্তভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া দেবী বলিল, "চুপ কর, ঠাকুরঝি আসছে।"

সত্য বিরক্তভাবে বলিল, "আঃ, তাকে আবার লজ্জা? ভবানী আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, তাকে আবার আমি লজ্জা করতে যাব?"

শান্তমূর্ত্তি ভবানী পিছন হইতে ছোড়দার উক্তি শুনিল, একটু হাসিয়া বলিল, "কিসের লজ্জা ছোড়দা?"

সত্য বলিল, "দেখ্ না, তোর বউদি আমায় শিখিয়ে দিচ্ছে,—ঠাকুরঝি আসছে, একটু লজ্জা অনুভব করতে শেখ।"

"আচ্ছা, এর জন্যে বউদিকে শাস্তি দেওয়া যাবে। অতগুলো বাসন নিয়ে যেতে পারবে না বউ, আমার হাতে কতকগুলো দাও। সব তাতেই তোমার জোরের কাজ ভাই! বললুম আমি বাবাকে তাঁর বই খাতা দিয়ে আসছি, তুমি কথা না শুনেই চলে এলে।"

কতকগুলা বাসন লইয়া ভবানী ভ্রাতৃবধূকে লইয়া চলিয়া গেল।

(৪)

পূজার পরে সত্যর কলেজ খুলিবার সময় হইয়া আসিল।

উপেন্দ্রনাথ সেদিন পুত্রকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন, "দেখ, আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলুম, আর এই একটা বছরের জন্যে তোমার পড়াটা বন্ধ করে দিয়ে, তোমায় যে-কোন একটা চাকরীতে ঢুকানো আমার পক্ষে অন্যায় কাজ হয়। বাপের কর্ত্তব্য ছেলেকে লেখাপড়া শিখানো। ভগবান জানেন, আমি কোন দিন আমার কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করি নি। তবে যে এখন শেষ এই একটা বছর তোমায় পড়াতে পারলুম না, তার কারণ সবই তো জানতে পারছ। ঘরে খাওয়া তবু একরকমে চলে যায়, কিন্তু মাস গেলে এই যে সামান্য বারটা টাকা কোথায় পাব, কি করে পাঠাব, তাই ভেবে আমি পাগল হয়ে যাই।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমি অনেক ভেবে দেখলুম, "এই একটা বছর যেমন করেই হোক তোমার এই বারটা করে টাকা আমায় যোগাড় করতেই হবে,—তোমার খরচটা কোনক্রমে আমায় চালাতেই হবে। কিন্তু জানো বোধ হয়—আমার হাতে একটী পয়সা নেই, এই—"

বাধা দিয়া সত্য বলিল, "আপনি অত ভাববেন না বাবা। আমি এই একটা বছর পড়ার মত খরচ যোগাড় করেছি।"

উপেন্দ্রনাথের শুষ্ক মলিন মুখখানাতে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল, "যোগাড় করেছ—! কোথায় পেলে?"

সত্য মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া উত্তর দিল, "আপনার ছোট বউ তার গয়নাগুলো সব দিচ্ছে,—তা থেকে আমার আর একটা বছর পড়া, একজামিনের ফি দেওয়া, সব হয়ে যাবে।"

বিস্ময়ে নির্ব্বাক উপেন্দ্রনাথ পুত্রের মুখপানে শুধু চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণভাবে বলিলেন, "তুমি বলছ কি!"

সত্য স্পষ্ট সামনাসামনি মুখ ফিরাইতে পারিল না, আস্তে আস্তে উত্তর দিল, "সে দিতে চেয়েছে।"

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া পিতা বলিলেন, "সে বলেছে বলেই তুমি নেবে?"

সত্য তেমনি নরমে অথচ সংযতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু না নিলেও যে উপায় নেই বাবা।"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "উপায় নেই বলে স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে সেই টাকায় তুমি পড়বে! ধিক অমন পড়ায়! অমন লেখাপড়া না শেখাই ভাল বলে আমি মনে করি। তুমি পুরুষ, ইচ্ছানুসারে তুমি উপার্জ্জন করতে পারবে, কারও উপর ভর দিয়ে তোমায় দাঁড়াতে হবে না। সে নারী, তোমার উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে—কে জানে অদূর-ভবিষ্যতে সে তোমার কাছ হতে কতখানি পেতে পারবে, তুমিই বা তাকে কতখানি দিতে পারবে! তারই আশা দিয়ে তার কাছ হতে গয়নাগুলো নেওয়া পুরুষের উচিত কাজ নয়। হয় তো এর পরে তার এমন দিনও আসতে পারে, যে দিন একটা পয়সার দরকারও তাকে পীড়ন করবে।"

সত্যর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি এ গয়না

কিছুতেই নিতে চাইনি বাবা, সে জোর করে আমায় নিতে বাধ্য করেছে। আপনারই ছেলে আমি,—এমন নীচ হৃদয় আমার নয়, এমন নীচ শিক্ষা আমি পাই নি যে, কারও কিছু জোর করে বা ছলনা করে নেব।"

উপেন্দ্রনাথের উগ্র কণ্ঠ নিমেষে কোমল হইয়া গেল। তিনি পুত্রের মাথায় হাতখানা রাখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তা জানি সত্য,—আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মন এমনই সত্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। ছোট বউমা স্বেচ্ছায় দিতে পারেন—কারণ, মায়ের অন্তর যে কত উচ্চ, কত উদার, তার পরিচয় আমি নিয়ত পাচ্ছি। এক এক সময় মাকে আমার ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দিতে চাই, এক এক সময় মায়ের অসীম জ্ঞানপূর্ণ কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই। বড় পুণ্য আমার ছিল, তাই আমি যথার্থ লক্ষ্মীকে বরণ করে ঘরে আনতে পেরেছি। মায়ের জিনিস আমি কিছুতেই নিতে দিতুম না তোমায়, কিন্তু—"

তাঁহার বেদনাভরা কণ্ঠ অকস্মাৎ নীরব হইয়া গেল। খানিক পরে তিনি আবার কথা বলার শক্তি লাভ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে কলকাতায় যাচ্ছো?"

গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সত্য উত্তর দিল, "পরশু সকালে যাব।"

"পরশু?" বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন। একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভবানীর একটা উপায় করে গেলে না? সুরেশের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে ভাল হতো না?"

সত্য বলিল, "গেল বারে বাড়ী এসে তো দেখা করতে গিয়েছিলুম বাবা,—জানেন তো, আমার সঙ্গে সে মোটে দেখাই করলে না,—বাড়ীর মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে তার মাকে বলে দিলে—বলে দাও আমি বাড়ী নেই। আবার তার বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা করতে কোন্ মুখ নিয়ে যাব বাবা? আপনার আদেশ হলে অবশ্যই আমায় যেতে হবে। কিন্তু শুধু মেয়ের দিকে তাকিয়েই কথা বলবেন না বাবা, আমাদের মান-অপমানের দিকে তাকিয়ে আদেশ করুন।"

উপেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "সবই বুঝেছি সত্য, মেয়েটার দিকে চাইতে যে বড় কষ্ট হয়," মনে ভাবি,—এমন করেও তাকে জলে ফেলে দিলুম?"

সত্য শান্ত কণ্ঠে বলিল, "সে কথা যথার্থ বাবা! আবার নিজেদের মানসম্ভ্রমের পানেও একটু চাইতে হয়। আপনার অর্থ নেই, আপনি বড়লোকই নন; কিন্তু পাণ্ডিত্যে এদিকের মধ্যে আপনার মত মান তো আর কারও নেই। আপনার মান রেখে তারা কি কথা বলতে পেরেছে? আপনাকে তারা যা না তাই বলেছে। আমরা সব সহ্য করেছি; কেন না, আমাদের মেয়ে বলে আমাদের না কি সব সয়ে যেতেই হবে। এত অপমান সয়ে—অত কষ্ট সহ্য করতে আপনি যে এখনও ভবানীকে আবার শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে চান, এই আশ্চর্য্যের কথা। এখানে থাকলে কি ক্ষতি হবে? আপনি মনে ভাবেন—ঝাঁটা খাক, লাথি খাক, হাজার কথা নিত্য শুনুক, তবু মেয়েদের সেই শ্বশুর-বাড়ী পড়ে থাকতে হবে।"

সত্য ভারি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমটায় সে শান্ত সুরে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেও, শেষটায় উগ্র সুরে তাহার কণ্ঠ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। দেশের মেয়েদের কষ্ট, বিশেষ তাহার ভগিনীর এই কষ্টের কথা ভাবিয়া সে ভারি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মেয়েদের সকল অবস্থাতেই শ্বশুর-বাড়ী পড়ে না থাকা ভিন্ন আর উপায় কি?"

সত্য বলিল, "উপায় ঢের আছে। ধরুন, ওরা যদি ভবানীকে নাই নেয়, এখানে যদি ভাই-বউদের সঙ্গে মিলে মিশে না থাকতে পারে, তখন ওর উপায় কি হবে?"

ক্লিষ্ট কণ্ঠে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দাসীর মত থাকলে সকলেই দয়ার চোখে দেখবে।"

সত্য উষ্ণকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, এই ধারণাটা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে বলেই বরাবর এইটেই ঘটে আসছে। অর্থাৎ যারা স্বামিত্যক্তা অথবা বিধবা, তারা পরের সংসারে মুখ বুজে দাসীর মতই কাজ করে যায়,—তবু যদি তারা তাদের অনর্থক একটা গলগ্রহ না ভাবত। এরা শ্বশুর-বাড়ীর আদর হতে বঞ্চিত। বাপ মা মরে গেলে বাপের বাড়ীর সঙ্গে যাদের সব সম্পর্কই ফুরিয়ে যায়, তাদের শেষ উপায় আত্মীয়ের সংসারে দাসীর চেয়েও অধম হয়ে পড়ে থাকা। হ্যাঁ, দাসীর চেয়ে অধম বই কি—কেন না দাসীর যেটুকু কথা বলবার ক্ষমতা আছে, এদের তাও নেই। এক বাড়ীতে না বনলে দাসী অন্য বাড়ীতে কাজ করতে যায়,—এদের সে ক্ষমতা নেই; কারণ এদের অপমান-বোধ নেই। আত্মীয়ের বাড়ীর শত লাঞ্ছনাও এদের সয়ে থাকতে হয়

গোপনে চোখ মুছে ফেলে,—সামনে চোখের জল ফেলাও মহা অপরাধ বলে গণ্য হয়। আপনি রাগ করবেন না বাবা, মনে করে দেখুন, আমি ঠিক কথাই বলছি কি না।"

উপেন্দ্রনাথ অধৈর্য্য ভাবে বলিলেন, "তবে কি করতে বল তুমি? যে সব মেয়েদের শ্বশুর-বাড়ী নেই, বাপের বাড়ীও নেই, তারা তবে যাবে কোথায়? আমার বিবেচনায়—তবে এ সকলের হাত এড়াতে এদের—বিশেষ করে ভবানীর, মরণই ভাল।"

সত্য একটু হাসিল, বলিল, "না বাবা, এ কথাটা বলা ঠিক হলো না। মরণ যার হলো সে তো বেঁচে গেল বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ জগতের কোনও ধাক্কা তাকে সইতে হল না। মরে না তো সকলেই—কারণ মরার কথাটা যেমন চট করে বলতে পারা যায়, মরতে সাহস ততদূর হয় না। ভবানীকে আমায় দিন না কেন, ওকে আমি ভাল করে লেখাপড়া শিখানোর ভার নেব—যাতে সে নিজের পায়ে নিজে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে।"

উপেন্দ্রনাথ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সত্য ভারি লজ্জিত হইয়া পড়িল। পিতা যে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার বিরোধী তাহা সে জানিত, সেই জন্য সে তাঁহার মুখের দিকে আর তাকাইতে পারিল না।

গম্ভীর মুখে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি কি এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে পড়াতে চাও?"

সত্য উত্তর দিতে যাইতেছিল,—উপেন্দ্রনাথ দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমার কথা শোনো সত্য, আমি এতে কখনই সম্মতি দিতে পারব না। সুরেশ তাকে নিক বা না নিক, সে সুরেশের ধর্ম্মপত্নী,—তার ওপরে তোমার বা আমার কোন অধিকার এখন নেই। হিন্দুশাস্ত্র স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, সম্প্রদান হয়ে গেলে সে তখন স্বামীরই স্ত্রী, স্বামী তার ওপর যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। তুমি জানো আমি ব্রাহ্মণ, পুরোহিত,—আমার কাছ হতে অনেক লোকে ব্যবস্থা নিয়ে যায়। তাদের শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা দেব, আর আমার মেয়ের বেলাতেই যে আমি অশাস্ত্রীয় নীতির মর্য্যাদা রাখব, তা কখনও হতে পারে না। আমার কাজ শাস্ত্র দেখা, আমার শিক্ষা সেকালের। তোমাদের আধুনিক প্রাচ্য পাশ্চাত্যে মিলিয়ে শিক্ষা আমার হয় নি। সেই জন্যেই—আমি নিজে গিয়ে সুরেশের মার হাতে ধরে ভবানীকে সেখানে রেখে আসব। এতে মান অপমান আমার কিছু নেই সত্য, কারণ, মেয়ের বাপ যাই হোক না, সে সেই মেয়ের বাপই থাকে, তার ক্রটী জামায়ের বাড়ী পদে পদে। মেয়ের বাপ যতই দিক তবু পাণ হতে চুণ খসলেই তাকে অপমান সইতে হবে—এই চিরন্তন নিয়ম।"

সত্য খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পিতার কথার উপর কথা কহিবার ক্ষমতা তাহার আর ছিল না। পিতা অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে চাহিতেই, সে আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল এবং বাড়ী মধ্যে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তাহার বিবর্ণ মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া ভবানী সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, "কি হয়েছে দাদা? বাবা কিছু বলেছেন না কি?"

সত্য একটু হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিল, "না, কিছু বলেন নি, এমনিই সব কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।"

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তোমার মুখখানা ওরকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন?"

সত্য অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "শুকনো আবার কোথায় দেখলি? বাবা সংসারের সব সুখ-দুঃখের কথা বলছিলেন, তাই শুনছিলুম।"

সে একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বারাণ্ডার একধারে বসিয়া পড়িল। ভবানী তরকারী কুটিতেছিল, দেবী রান্না-ঘরের মধ্যে রন্ধন চড়াইয়া দিয়াছিল। এতক্ষণ ননদিনী ও ভ্রাতৃবধূতে বেশ গল্প চলিতেছিল,—স্বামীর আগমনে দেবীকে সরিয়া পড়িতে হইয়াছিল।

ভবানী একটা বৃহৎ কুমড়া দুইখানা করিয়া ফেলিবার জন্য খানিকক্ষণ হইল চেষ্টা করিতেছিল। তাহার ব্যর্থতা দেখিয়া দেবী ঘরের মধ্যে ছটফট করিতেছিল। সত্য না আসিয়া পড়িলে, সে এতক্ষণ কায়দায় ফেলিয়া কুমড়াটাকে চার খণ্ড করিয়া দিতে পারিত।

সত্য তাহার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিতেছিল; বলিল, "সর, আর যোগ্যতা দেখাতে হবে না, আমি দুখানা করে কেটে দিচ্ছি।"

ভবানী একটু হাসিয়া বঁটি ছাড়িয়া দিল। সত্য কুমড়াটি দুইখানা করিয়া কাটিয়া দিল। ভবানী তাহাকে সরাইয়া

দিয়া নিজে কুমড়া কুটিতে কুটিতে বলিল, "আচ্ছা ছোড়দা, একটা কথা বলব ?"

সত্য বলিল, "কি কথা ?"

ভবানী বলিল, "রাগ করবে না ?"

সত্য বলিল, "রাগ করবার কথা না হলে রাগ করব কেন ?"

ভবানী একটু থামিয়া বলিল, "আমি অনেক দিন হতেই এ কথাটা জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলুম, কিন্তু—তুমি কি বলবে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি নি। কথাটা বিশেষ কিছুই নয়, বড়দার সঙ্গে তোমার দেখা হয় কি না তাই—"

বলিতে বলিতে সে মুখ তুলিয়া সত্যর পানে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল।

হাসি আসিতেছিল, তাহা চাপিয়া ফেলিয়া সত্য বলিল, "এতকাল পরে হঠাৎ বড়দার কথাটা জিজ্ঞাসা করলি যে ? এতকাল বুঝি বড়দার কথা মনে পড়ে নি ?"

ভবানী উৎসাহিতা হইয়া বলিল, "মনে পড়ে রোজই, সে কথা কি ভোলা যায় ছোড়দা ? ওই যে বলছি—ভয়ে তোমায় জিজ্ঞাসা করতে পারি নি।"

"কিন্তু ওইটুকু ভয় না করে যদি আগে হতেই তাদের কথা জানতে চাইতিস, তা হলে আমি সত্যি ভারি খুসী হতুম ভবানী। তোর কথার উত্তর দিই—দেখা হয় বই কি। তবে ভাই বলে পরিচয় দিতে আমার যতটা আনন্দ হয়—যতটা গৌরব বাড়ে, ততটা তাঁর যে হয় না, সে জানা কথাই। তিনি এখন ধনী, নামজাদা লোক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। আর আমি কোথাকার কে—তাঁর সঙ্গে আমার পার্থক্য কতদূর, সেটা ভেবে দেখ। তাদের বাড়ীর মধ্যে বিথী ছাড়া আর কেউ তেমন আন্তরিকতা দেখায় না!"

ভবানী উৎসুক হইয়া বলিল, "সে কত বড় হয়েছে দাদা ?"

সত্য বলিল, "তা বেশ বড় হয়েছে বই কি,—বছর পনের ষোল তার বয়েস হল।"

ভবানী সবিস্ময়ে বলিল, "এখনও বিয়ে হয় নি ?"

সত্য একটু হাসিল, "এখনি কি বিয়ে হবে ? এই তো সবে সে ম্যাট্রিক দেবে। দাদা তাকে শেষ পর্য্যন্ত পড়াতে চান। তার পর শুনেছি তাকে শিক্ষার জন্যে—অর্থাৎ বেশী রকম জ্ঞান অর্জ্জন করবার জন্যে বিলেতে পাঠাবেন।"

ভবানী গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক্ করলে বাবা! তা হলে সে মেয়ের বিয়েই দেবে না বলে জানা যাচ্ছে। ছিঃ ওরা সব কি—মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না, খালি পড়াতেই চায়। পড়িয়ে যে কি হবে তা তো বুঝতে পারি নে।"

সত্য একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোরাই মানুষ—তাই সার চিনেছিস বিয়ে, আর কিছু নয়। বিয়ে করলে মানুষ কি রকম জড়িয়ে পড়ে তা তো জানিস নে। তাই মনে ভাবিস, বিয়ে করলে চতুর্ব্বর্গ ফল পাওয়া গেল। এই তো তুইও বিয়ে করেছিস,—কি চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করতে পেরেছিস শুনি ?"

তাহার নিজের কথায় ভবানী একেবারে নিভিয়া গেল, কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আমার কথা কেন ছোড়দা, আমার কথা ছেড়ে দাও।"

সত্য বলিল, "কেন ছাড়ব ? আগে তোর কথাটাই ধরব, তারপরে অন্য সকলের কথা বলব। এই যে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল,—এ বিয়েটা না দিলে কি হতো না ? বিয়ে দিয়ে মস্ত বড় লাভ হয়েছে,—সামান্য সামান্য খুঁত ধরে তোকে বিদায় করে দেছে,—আমাদের পর্য্যন্ত নাম এতটুকু রইল না,—তাদের যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছে। এর চেয়ে বিয়ে যদি না হতো, তা হলে কেমন থাকতিস বল্ দেখি ? কারও ভাল-মন্দের সঙ্গে তোর অদৃষ্ট মিলানো থাকত না,—বেশ লেখাপড়া শিখতে পারতিস,—একটা মানুষ হয়ে যেতিস।"

ব্যগ্র ভাবে ভবানী বলিল, "এখন কি আর লেখাপড়া শেখা যায় না ছোড়দা ?"

ছোড়দা গভীর অবজ্ঞার সুরে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, তোদের আবার লেখাপড়া শিখানো ? বই নিয়ে বসলেই তোদের চোখে ঘুম নেমে আসে। জাগলে পরে হঠাৎ মনে পড়ে যায়—রান্নাঘরে কি আলগা পড়ে আছে, কোথায় কে কি বলছে, কোথায় কি শব্দ হল। অশিক্ষিতা পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের দোষ পদে-পদে। তাদের টেনে তুলতে পারা যায় পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে—আর সেটা উভয় পক্ষেরই থাকা চাই; নইলে এক পক্ষের চেষ্টা সবই ব্যর্থ হয়ে যায়।"

দারুণ অবজ্ঞাভরে একবার ভবানীর পানে, আর একবার রান্নাঘরের পানে তাকাইয়া সত্য বাহির হইয়া গেল। তাহাকে শুনাইবার জন্যই ভবানী অনুচ্চস্বরে বলিল, "দাদা ভারি বোকা,—জানে না যে অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে বলেই আজ গায়ের গয়নাগুলো খুলে দিতে পেরেছে। শিক্ষিতা মেয়েদের চোখে না দেখলেও তাদের গুণপণা শুনেছি তো,—কেঁদে লুটিয়ে পড়লেও একটি কিছু বার করে দিত না।"

দেবী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু ছোড়দার কানে কথাগুলো পৌঁছাইবার আগেই সে বাহির হইয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

বাজে কথা

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

সামান্য একটু ছাপার ভুলে 'কাজের কথা' 'বাজে কথা'য় দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে তাহা হয় নাই, ইহা নাতিদীর্ঘ একটা ভূমিকায় বলিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। কারণ আজ কাল 'কাজের কথা' যথা তথা। এমন কি খুব আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপনেও বিশেষ করিয়া বলা হইয়া থাকে, 'বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিবেন না।' একথা পড়িয়া আমাদের হাসি পায় বই কি ? কিন্তু হাসি, আর যাই করি, বিজ্ঞাপনের বহর বাড়িয়াই চলে। আমরা হাসিতে হাসিতে জিনিষ কিনি। আবার ঠকিয়া ঠকিয়া হাসিয়া সারা হই। বিজ্ঞাপনের বাজার পূর্ব্বমতই বজায় থাকে।

'কাজের কথা'ও সেই রকম। কাজের কথা না হইলে কেহ শোনে না। বাজে কথা শুনিবার অবসর আছে কাহার ? কাজের সময় বাজে কথা কহিতে নাই। কথায় কথায় বেলা বাড়িয়া যায়, আজে বাজে বকিয়া কি লাভ আছে বলিতে পার ? তবুও বাজে কথা কমে না। বাজে কথা নহিলে আসর জমে না। অন্ততঃ কাজের কথার পূর্ব্বে দুটো বাজে কথা কহিয়া ভূমিকা করিতে হয়।

কাজের কথা কহে ব্যবসাদার। তাহারা সময় বাজে নষ্ট হইতে দেয় না। তাহাদের ঘড়ির কাঁটা টাকা সিকি আধুলির ঝুম্‌ঝুমি বাজাইয়া চলে। ট্রামগাড়ীতে, কালীঘাটে, রেস খেলার মাঠে 'কাজের কথা'র তুবড়ি ছোটে, আর নোট, প্রো-নোট, হুণ্ডির 'তারা' কাটিয়া পড়ে। ইহাঁদের হিসাবে যত কাব্য নাটক, নভেল উপন্যাস, প্রবন্ধ নিবন্ধ সব বাজে কথা। কেবল কথার ঝুড়ি। তা' লেখক যিনিই হউন না। রবিই হউন, আর বঙ্কিমই হউন, শরৎই হউন আর বর্ষাই হউন! এ সব বাজে কথা পড়েন, যাঁদের বাজে নষ্ট করিবার মত সময় আছে। স্কুল কলেজের ছেলের দল, ভবঘুরে উমেদারের দল, আর যে সব কুললক্ষ্মীরা মেজেয় পা দেন না, আল্‌তা মুছিয়া যাইবার ভয়ে, তাঁরাই পড়েন এই সব বাজে কথা। কিন্তু উপায় কি ? বাজে কথা না হইলে যে কাব্য হয় না। সেই কোন্ দিন রামগিরির আশ্রমে ১লা আষাঢ়ের নবাম্বুদের বপ্রক্রীড়া দেখিয়া বিরহী যক্ষের মনে যে প্রিয়াবিরহের শোক উথলিয়া উঠিয়াছিল, সেই কথা—সেই আষাঢ়ে গল্প ঘুণের মত আমাদের অস্থি-পঞ্জরে প্রবেশ করিয়া একেবারে প্রাণের গোড়ায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। এমনই কাঁচা কাঠে আমাদের ধাতু। কবে কোন্ দিন বনভূমি মেঘ-মেদুর আকাশের কালো ছায়ায় আর ঘননিবদ্ধ তমাল পল্লবের অন্ধকারে শ্যামায়মান হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সব নিতান্ত অ-কেজো কথায় আমাদের কাব্য ভরা। সুতরাং আশা নাই। কিন্তু আমাদের কবিবর কিঞ্চিৎ চতুর আছেন। তিনি কাব্যের বাজে কথার মধ্যে বোধ হয় একটু কাজের কথার 'পূর' দিয়া দিয়াছিলেন, তাই নোবেল প্রাইজের লাখ টাকা পাইয়া গেলেন! কাজের কথার মহাজন ঘেসে-রাম সদ্দার, রূপচাঁদ বিড়াল প্রভৃতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দুঃখ হইল, এত দিন পাটের দালালী না করিয়া দুটো কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিলে মন্দ হইত না!

রাজ্যের বাজে কথা না হইলে কাব্য হইবে কেমন করিয়া ? নববধূ যখন দুরু দুরু হিয়া নিয়া আসে তাহার অচেনা, অজানা বরের কাছে, তখন শুধু থাকে মনের গোপন কোণে আধ ভয়, আধ বিস্ময়, আধ কৌতূহল, আধ আনন্দের পরিমল; তখন তাহাদের মধ্যে হয় বাজে কথা। বাজে কথার মৃদুল বায়ে প্রেমের আধ ফুটন্ত ফুল ফোটো ফোটো হইয়া উঠে। বাজে কথার জোর হাওয়া যত দিন বয়, তত দিনই প্রেমের তুফান ছুটে। তার পর একদিন নববধূ যখন গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন আর বাজে কথায় সময় নষ্ট করিবার উপায় থাকে না! প্রেমের ঠাকুরটি তখন তাঁহার পক্ষ দু'টি মেলিয়া প্রজাপতির মতো শূন্যে উড়িয়া যান, আর

স্বামী নামক পদার্থটি তখন উধাও হইয়া পড়েন। কালে ভদ্রে যখন তাঁহার দর্শন ঘটে, তখন 'কাজের কথা' ভিন্ন বাজে কথার অবসর থাকে না।

"ওগো মেয়েটি যে বড় হয়ে উঠ্‌ছে, চোখের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছ না—"

"পটলা যে দুদিন না খেয়ে না দেয়ে পড়ে রয়েছে, তাকে এবার পূজোয় একখানা সাইকেল কিনে না দিলে সে যে জলগ্রহণ করবে না, বল্‌ছে; একবার ছেলেটার মুখের দিকে তাকাও—"

"মেজ যায়ের বাপের বাড়ী থেকে তার ভাইপোর অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন করে গেল; কিন্তু যাব কি, যে সব পোড়া ছাঁচের গয়না, তা পরে কি আর ভদ্দর লোকের বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে?—"

স্বামী বেচারী এই সব শুনিয়া ভাবে, হায় রে বাজে কথা। সে এক দিন ছিল। কোথায় সেই মধুময় যৌবন, কোথায় সেই প্রেম, কোথায় সেই কারণে অকারণে মান, আর কোথায় সেই বাজে কথায় নিশি ভোর! তবু পোড়া মন বুঝে না, বাজে কথায় মন দিবার সময় নাই।

বন্ধু মহলেও দেখি ঐ বাজে কথারই পশার। সেখানে 'কাজের কথা'র প্রবেশ নিষেধ! 'Talking shop' বড়ই বে-আদবী। যতই জরুরী কাজ থাক্ না, বন্ধুর বৈঠকে সে সব ভুলিতে না পারিলে সবই বৃথা, সবই বাজে। ঐ যে দুদণ্ডের বিস্মরণ, দুদণ্ডের সময় হরণ, ও-যেন বাদল রাতে চাঁদের কিরণ। দুঃখ শোক ভুলাইয়া দেয় ঐ বাজে ক'টা কথায়। বাঁচিয়া থাকা যে নেহাৎ মন্দ নয়, তা বুঝি যখন কথায় কথায় হাসির তরঙ্গ ছোটে, কথায় কথায় রসের স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু হায়, এত বাজে কথাও কহিতে আছে!

"ইনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।"—

"ওঃ বেশ! বেশ! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। বসুন। মশায় একটু তামাক ইচ্ছে করেন?—"

ইহাই হইল আলাপের সনাতনী প্রথা। আজকালকার ইংরেজি ফ্যাসনে:—

"অত্যন্ত সুখী হ'লাম আপনাকে দেখে। আজ দিনটা বড় চমৎকার! নয়?—"

এর বদলে যদি 'কাজের কথা' সুরু করা যায়, তা হলে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে।

"কি কাম করেন? বেতন কত পান? পড়া শুনা কতদূর?" ইত্যাদি যেখানে আলাপের আলম্বন, সেখানে 'নটের বেগে প্রস্থান'ই প্রশস্ত। কাজের কথায় যখন প্রাণ আই ঢাই করিয়া উঠে, তখন মন ছুটিয়া যায় একটু সৎসঙ্গের জন্য; একটু কাব্যরসের জন্য।

সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদঃ আলাপঃ সজ্জনৈঃ সহ।

বঙ্কিমবাবু এই কথাটি ভুল বুঝিলেন; তিনি বিষবৃক্ষের ফল করিলেন দুইটি:—সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী। সে ফলের একটি গেল স্বর্গে; আর একটি জ্বালাইবার জন্য রহিয়া গেল মর্ত্ত্যে। কুন্দনন্দিনী জ্বলিল, অহিফেনের গরলে; আমরা জ্বলিতেছি কেরোসিনের অনলে।

সজ্জনের সঙ্গে আলাপ করিবার সৌভাগ্য সকলের ঘটে না। কাজের কথায় কালক্ষেপ করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের পক্ষে সজ্জনের সঙ্গ লাভ করিবার সম্ভাবনা কোথায়?—যে সজ্জন-সঙ্গতি ক্ষণমাত্র হইলে নাকি পৃথিবী রূপ solid অর্ণব চট্ করিয়া পাড়ি দেওয়া যায়!

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।

এই মহাজন বাক্যে আমার অশ্রদ্ধা কিছুমাত্র নাই। তবে ঐ সকল মহাজনের তিরোভাবের পর অনেক জল হাওড়া পোলের নীচে দিয়া চলিয়া গিয়াছে—অর্থাৎ কিনা বহুকাল অতীত হইয়াছে। এখন বড় বড় three decker জাহাজ না হইলে কোনও অর্ণব পাড়ি দিবার কল্পনাই করা যাইতে পারে না। নৌকায় করিয়া পাড়ি দিবার চেষ্টা করিলে ডুবিয়া মরা অনিবার্য্য—বিশেষতঃ আমাদের luggage অর্থাৎ পাপের বোঝা যে বেজায় ভারি! সেকালের লোকের আর কিছু থাক না থাক, ওজন ছিল কম; অনেক সময় পাতায় বা ভেলায় ভাসিয়া সাগর পার হওয়া অসম্ভব ছিল না। তাই বিদ্যাপতি বলিতেছেন:—

হে মাধব,
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।

'পল্লব' যদি তেমন নিরাপদ মনে না হয়, তবে পাঠান্তর করিয়া 'পলব' (অর্থাৎ প্লব=ভেলা) করিয়াও লইতে পারেন, কিন্তু সাহসে কুলাইবে কি?

আমাদের কাজ এত বেশী এবং সময় এত কম যে সাধু সঙ্গের প্রসঙ্গই বাজে বলিয়া মনে হয়। কাজও কি এক রকম? এত রঙ বিরঙের কাজ অছে যে আমাদের অ-কাজ যে কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কোনও একখানি সংবাদপত্রে মোটা মোটা অক্ষরে দেখিলাম 'কাজের কথা'। ভাবিলাম এতদিন পরে দুটো কাজের কথা শোনা যাইবে। বাজে কথায়ই ত সময় বহিয়া যায়। পড়িয়া দেখিলাম তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা সম্বন্ধেই মন্তব্য বেশীর ভাগ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হিন্দু মুসলমানের বিরোধ কি একটা কাজের কথা? মন্দির মস্‌জিদ্ ভাঙ্গা কি কোনও কাজের কথা? যঃ শৃণোতি সোঽপি পাপভাক্—এ সব কথা শুনিলেও পাপ হয়। মাথা ফাটাফাটি রক্তারক্তি যদি কাজের কথা হয়, তাহা হইলে সেটা যত কম হয়, ততই ভাল নহে কি? এমন কাজের কথার চেয়ে বাজে কথা ঢের ভাল।

অন্যের বাজে কথায় আমরা যত অসহিষ্ণু হই, নিজেদের বেলায় কিন্তু সেরূপ নহি। আমার মনে হয়, ইহাতে বিনয়ের বড় অভাব রহিয়া যায়। ঐতিহাসিক যখন বলেন, যে সতের জন ঘোড়সওয়ার লইয়া মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপে আসিয়া রাজ্যটা ধাঁ করিয়া জয় করিয়া ফেলিলেন, তখন অন্য লোকে যে সেটা বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, এ বিনয়টুকু থাকিলে ভাল হয়।

দার্শনিক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ। অগ্রিম এক সৎ আসিয়া জুটিলেন। কিন্তু কোথা হইতে যে আসিলেন তাহার ঠিকানা নাই। কারণ অসৎ থেকে সৎ হয় না, বালুকা হইতে কি তৈল পাওয়া যায়? আকাশ থেকে কুসুম পড়ে?—যদিও মাঝে মাঝে পুষ্পবৃষ্টি না হইলেই বা চলে কৈ? যাহা হউক, সৎ যে আগে ছিলেন, সে সম্বন্ধে একরূপ স্থির হইয়া গেল। কিন্তু অসতের অপরাধ কি? অসৎ নাই অথচ সৎ ছিল, এ কি কোনও কাজের কথা? কালোর কোলে আলো নইলে কি মানায়?

নিশীথের বুকের মাঝে ঐ যে অমল
উঠ্‌লো ফুটে স্বর্ণ কমল—

বলিলেন কে?—না, কবি। বৈজ্ঞানিক একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—ও সব বাজে। আমার কাছে এস, খাঁটি নির্যাসটুকু পাইবে। এই দেখ মারিলাম টোকা এখানে, আর ঐ বে-তারে বাহিত হয়ে চলে গেল খবর কাঁহা কাঁহা মুল্লুক! একবার যন্ত্রটি কানে পরো, শুনবে ছয় রাগ চৌষট্টি রাগিণী জলের পানার মত বাতাসে (কি ঈথরে) ভেসে ভেসে আস্‌ছে। কিন্তু সাধারণ লোকে বলিল,—বাজে, ও-সব বাজে! বে-তারে সুর আসে, সঙ্গীত আসে, সঙ্কেত আসে, তা'তে কিছু আসিয়া যায় না। অন্ন-সমস্যা ত মিটে না। বে-তারে খবোর আসিবে কবে? এই হইল কাজের কথা। টেলিফোণে লোকের কথা আসিতেছে, গান আসিতেছে, হাসি আসিতেছে, এবারে আবার ছবি আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। যে লোক অপর প্রান্তে কথা কহিতেছে, এ প্রান্তে তার ছবি দেখা যাইবে। তা' ত হইল, মনের ভিতরকার 'ছাপ' কোনও গতিকে আসে না? কথায় মানুষ ধরা যায় না, চেহারাও অনেক সময় ঠকায়। অন্তরের কথাটি ধরিতে পারা যায় না, কোন কৌশলে? নইলে, সব বাজে।

কাজের কথা যে কি, তাহা বুঝিয়া উঠাও কি কম শক্ত? মনের ঠিক আসল কথাটি ত ধরিবার উপায় নাই। চাণক্য বলেন কাজের কথা কিছু কহিও না;

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা না প্রকাশয়েৎ।

কাজের কথা মনে মনে চিন্তা করবে। মুখে কাউকে বলো না। বল্‌লে সব ফেঁসে যাবে, সব বাজে হবে।

ভাবুক একটু হাসিলেন। বলিলেন, মুখে বলিলেই বা কি? বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। তুমি বল তোমার মতো, যাকে বলো সে বুঝে তার নিজের মতো। তুমি বলিলে 'বেলা যে গেল।' আমি বুঝিলাম আজকার মতো কাজ হলো শেষ। প্রণয়ী বুঝিলেন, 'অভিসারে'র সময় হয়ে এলো। লালাবাবু বুঝিলেন, সংসারে মজে' আছি, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! বেলা যে গেল, সব ছেড়ে যেতে হবে আজই—চলো, ওগো চলো। সুতরাং তোমার বলিতে কিছু বাধা নাই। রাম উল্‌টা বুঝিবে নিশ্চয়। সুতরাং সব সে ভালা চুপ; কবীর ঠিকই বলিয়াছেন। গর্গিয়াস্‌ও অনেক তর্কের দ্বারা এই কথাটিই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন: কথা না বলাই ভাল, কেন না বলিলে কেহ বুঝে না।

এক রকম কথা আছে, যাহা কাজেরও নয়, বাজেও নয়। শুধু কথা। সে কথা শুনিতে অনেকের ভাল

লাগে। অনেকবার এই 'কথা' শুনিতে গিয়া আমাকে বাড়ীতে কত যে কথা শুনিতে হইয়াছে, তা'র ঠিকানা নাই। যে কথা প্রাণে বাজে, সে কথা কাজের নয় বলিয়া নিতান্ত উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। তাহা হইলেও মনে হয়, কথা না শুনিলে যেন প্রাণ বাঁচে না। বড় মধুর লাগে সে কথা; সংসার বিরাগী শুকদেব পর্য্যন্ত বলেন "স্বাদু স্বাদু পদে পদে" যে কথায় কৃষ্ণ কথা নাই, সে কথা কথাই নয়, এই কথা বলেন গোস্বামি-পাদেরা। সে যাহাই হউক, অমন মিষ্ট আর কিছুই হয় না।

যা শ্রীকৃষ্ণ গুণানুবাদনকরী মনোহারী সা মাধুরী মাধুরী। শুধু সুন্দরী হইলে হয় না, পতিব্রতা হইলেই তাহাকে বলে কামিনী। মেঘ পরিশূন্য পূর্ণচন্দ্র-শোভিত হইলেই তাহাকে বলে যামিনী, নইলে ত শুধুই রাতি। আর যে কথায় শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন আছে, সেই কথাই মধুর কথা। তা কাজের কথাই হউক, আর বাজে কথাই হউক।

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] অর্ঘ্য

ব্যথার দান

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৯

"ও নারাণী, মন্দিরে যাবি?"

"যাব পিসীমা, একটু দাঁড়াও না" একটী তেরো বছরের ফুটফুটে মেয়ে এক গোছা কালো চুল পিঠে দুলাইয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া দয়া দেবীর নিকট আসিল।

যদুবাবু এই বাড়ীর মালিক। মেয়েটী যদু মুখুজ্যের কন্যা। ইহাদের বাড়ীর একখানা ঘর দয়াদেবী ২৲ টাকায় ভাড়া করিয়া কাশীবাস করিতেছেন! যদুবাবুর সংসারের মধ্যে এই একমাত্র কন্যা নারায়ণী! যদুবাবুর বয়স ৬০ এর কাছাকাছি। ৩০ টাকা পেন্‌সন পান, তাহাতেই সংসার চলিয়া যায়।

নারাণী গামছায় বাঁধা দয়াদেবীর কাপড় ও কমণ্ডলু এক হাতে লইয়া অপর হাতে দয়াদেবীর হাত ধরিয়া পথে বাহির হইল। দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইয়া দয়াদেবী স্নানে নামিলেন।

ঘাটে আরও কতকগুলি যুবতী ও প্রৌঢ়া স্নান করিতেছিলেন। পুরুষদের ঘাটে কতকগুলি হিন্দুস্থানী বালক জলে সাঁতার কাটিতেছিল এবং একজন ৭৮ বৎসর বয়স্ক লোক একমুখ দাড়ী ও মাথায় জটা লইয়া গামছা দিয়া গা রগড়াইতেছিল এবং মেয়েদের ঘাটের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আপনমনে উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছিল, "ওঁ কালভৈরব ডেকে নিলে না বাবা! এমন করে আর যে চলে না।" তাহার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া দুই একটী যুবতী হাসিল দেখিয়া লোকটা তাহাদের দিকে একটা কটাক্ষ করিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিল "তোর দয়া কি হয় না রে।"

স্নান সমাপনান্তে দয়াদেবী নারাণীর হাত ধরিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে চলিলেন। বিশ্বনাথের ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে পূজা সারিয়া উভয়ে গৃহে ফিরিলেন।

চৌকাঠের কাছে একখানা খাম পড়িয়া ছিল। নারাণী চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তোমার চিঠি পিসীমা।"

দয়াদেবী প্রফুল্লমুখে চিঠিখানা লইয়া ঘরে আসিয়া কহিলেন, "চিঠিখানা পড়ে শোনা ত মা!" পত্র ধীরুর নিকট হইতে আসিয়াছে। ধীরু লিখিয়াছে সে ভাল আছে, বেশ কাজ করিতেছে। মনি অর্ডারে ২৫ টাকা অদ্য প্রেরণ করিল। পিসীমা যেন তাহার জন্য না ভাবেন।

পত্রপড়া শেষ হইলে পিসীমা অঞ্চলে চক্ষ মুছিলেন। নারাণী মুখে চোখে বিস্ময় আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাঁদছ কেন পিসী, চিঠিতে ত ভাল খবরই আছে।"

"না মা সেজন্য কাঁদিনি। আজ আমার কত আনন্দ! সেই ধীরু আমায় রোজগার করে টাকা পাঠিয়েছে। বাছা আমার কি ঘেন্নায় যে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে তা আর কি বলব মা! বিদেশে আছে; কেই বা তাকে যত্ন-আত্তি করছে! সে এমন আপন-ভোলা, তাকে ডেকে খাওয়াতে হ'ত মা! পরের জন্যেই ছিল তার যত মাথা-ব্যথা! কার মড়া পোড়াতে হ'বে, কার ডাক্তার ডাকতে হবে, কে খেতে পায় না, এই সব খুঁজে বেড়ান ছিল তার কাজ। রাত নেই দিন নেই, দুর্যোগ নেই, এমনি করে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। এই জন্যই ত ওর দাদারা ওকে দেখতে পারত না।"

"কেন পিসী, এতে তাঁরা ওঁর উপর রাগ করতেন?"

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দয়াদেবী কহিলেন, "কেন যে রাগ করত, সেকথা আর কি করে বোঝাব মা। সংসারে ত সবাই এক রকমের হয় না; যে যার স্বার্থ নিয়ে চলে।"

নারাণী উদাসভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া দয়াদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"ও নারাণী" যদুবাবু গামছায়-বাঁধা বাজার লইয়া আসিয়া কহিলেন, "বাজারে জিনিস সব দিনকার-দিন যা দুর্মূল্য হয়ে উঠছে, আর কিছু কেনা যাবে না। যত সব কলকাতার বাবু ভায়ারা এখানে বেড়াতে এসে জিনিসের দর বাড়িয়ে দিলে। একটা বেশ বড় কচি বেগুনের দাম করছি এক

পয়সা, পাশ থেকে টেড়ী-কাটা এক ছোঁড়া বলে উঠল 'এই তিন পয়সা দিচ্ছি দে।' বগুনটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেলরে!"

নারাণী হাসিয়া কহিল, "তা যাকগে, কালকের বেগুন আধখানা আছে বাবা! তাইতেই আজ হবে।"

"আরে তা যেন হ'ল। বেগুন ত নিল। ছোঁড়াটার আক্কেলের কথা বলছি।"

বাইরে কড়া নাড়িয়া পিয়ন হাঁকিল, "মনি-অর্ডার হ্যায়"; যদুবাবু বিস্ময়ে কহিলেন "মনি-অর্ডার কার এল।" নারাণী হাসিয়া কহিল "পিসীমার।" "ওঃ" বলিয়া যদুবাবু বাহিরে যাইয়া মনি-অর্ডারের কাগজ আনিয়া দিলে, দয়াদেবী বলিলেন "সই দিয়ে নাও দাদা।"

যদুবাবু দয়াদেবীর নাম স্বাক্ষর করিয়া ২৫ টাকা তাঁহার হাতে দিয়া কহিলেন "এই ত দিদি, তুমি ভেবে সারা হচ্ছিলে। দেখ, তোমার ধীরু খবর দিয়েছে, আবার টাকা পাঠিয়েছে।"

দয়াদেবী নারাণীর হাতে টাকা দিয়া কহিলেন "তুলে রাখ ত মা, তোর বাক্সয়।"

নারাণী হাসিয়া কহিল, "বাঃ গো, আমি কি সবাইকার তবিল নাকি। বাবা পেন্‌সনের টাকা এনে বলবেন 'নারাণী, টাকাগুলো রাখত মা।' তুমিও তাই বলছ। বেশ ত?"

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন "টাকা ত তোরই পাগলি, কেবল আমি আর দিদি যে কটা দিন বাঁচব তুই আমাদের চারটী চারটী খেতে দিস্।"

"তা বৈকি! আর লেখবার ভুলে যখন একটী টাকার গরমিল হয় তখন কে বলে, আমার টাকা করলি কি? দে বেটী হিসেব দে।"

দয়াদেবী হাস্যমুখে বলিলেন, "আমি কিন্তু তোর কাছে হিসেব চাইব না।"

"সে তুমি না চাও, হিসেব আমি ঠিক রেখে যাব। যিনি টাকা পাঠিয়েছেন তিনি এলে তাঁকে আমি হিসেব বুঝিয়ে দেব। তুমি ত আর হিসেব বুঝবে না বাপু।"

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "দিদি—হিসেব বোঝেন না!"

নারাণী হাসিয়া কহিল "সেদিন চান করে আসবার সময় একসের আলোচাল কিনে পিসীমা দোকানীকে একটা টাকা দিলেন। সে পনের পয়সা দাম কেটে নিয়ে এগার আনা এক পয়সা দিল। উনি ত চলে আসছিলেন। শেষে আমি পয়সা গুণে বল্লুম, এক আনা কম দিয়া কাহে। তখন সে পয়সা দিয়ে বলে গল্‌তি হুয়া থা।"

দয়াদেবী হাসিয়া কহিলেন, "বিশ্বনাথের জায়গায় কেউ কি ঠকাতে পারে দাদা? ও হয় ত তার ভুল হয়ে থাকবে। নে তরকারীগুলো কুটে ফেল নারাণী, আমি বোকনো চড়িয়ে দিই।"

নারাণী বঁটি লইয়া কুটনা কুটিতে বসিল, দয়াদেবী চাল ধুইয়া হাঁড়িতে দিলেন। যদুবাবু তেল মাখিতে লাগিলেন। এমন সময় একটী বৃদ্ধলোক বাহির হইতে ডাকিলেন "মুখুজ্যে মশায় বাড়ী আছেন না কি।"

"হ্যাঁ, এস।"

দরজা খুলিয়া দিলে লোকটী ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "তারা বিকেলে মালক্ষ্মীকে দেখতে আসবে বলেছে। আপনি বিকেলে বেরুবেন না, বাড়ীতে থাকবেন।"

যদুবাবু হাসিয়া কহিলেন, "তা না হয় থাকলুম। কিন্তু তাদের যে বেজায় খাঁই শুনেছি হে! পেরে উঠব কি?"

লোকটা কাসিয়া কহিল "সে কথাও ছেলের মার সঙ্গে হয়েছে; দু'হাজারের ভেতরই হয়ে যাবে।"

বিস্মিতকণ্ঠে যদুবাবু কহিলেন, "বল কি? দু হাজার! তবেই হয়েছে! আমার সম্বলের মধ্যে এই বাড়ীখানি আর ৩০টি টাকা পেন্‌সন। তা'হলে মেয়ের বিয়েতে আমার ভিটে বেচতে হয়।"

লোকটী দয়াদেবীর পানে চাহিয়া কহিল, "আপনিই বলুন ত দিদি, মেয়ের বিয়ে কি বিনা-খরচায় হয়?"

দয়াদেবী হাসিয়া কহিলেন, "তা ত হয় না, কিন্তু যাদের অবস্থায় কুলায় না এত দিতে, তারাই বা কি করে বলুন?"

"তাও বটে! আচ্ছা, আগে তারা মেয়ে দেখে যাক্ ত, তার পরে তাদের সঙ্গে কষাকষি করা যাবে।"

দয়াদেবী নারাণীর অবনত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, লজ্জায় তাহার গাল দুটী রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কহিলেন, "মেয়ে দেখে তারা অপছন্দ করতে পারবে না, এমন প্রতিমার মত মেয়ে কটা মেলে? এমন সোনারচাঁদ যাদের দোব তাদের কি আবার টাকা দিতে হবে নাকি। পোড়া কপাল।"

যদুবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ঠিক বলেছ দিদি, অত টাকা

আমার নেইও, আর আমি তা দোবও না। পছন্দ করে কেউ অমনি বিয়ে করে, তবেই মেয়ের বিয়ে দেব, না হলে মেয়ে আমার চিরকাল কুমারী থাকবে, যেমন সব সেকালে থাকত।"

দয়াদেবী কহিলেন, "ওমা! তাই বা কেন?"

"যাই হোক, বিকেলে থাকবেন। আমি তা হলে এখন আসি; একটু দরকারী কাজ আছে।"

"আচ্ছা।"

লোকটী চলিয়া গেল। ভিতরে আসিয়া যদুবাবু নারাণীকে বলিলেন, "গামছা কাপড় দে মা, আমি নেয়ে আসি।"

"এত বেলায় আবার গঙ্গায় নাইতে যাবে বাবা? আজ বাড়ীতেই নেয়ে ফেল।"

যদুবাবু হাসিয়া কহিলেন "না রে, কাছে মা-গঙ্গা থাকতে আর বাড়ীতে নাব না! তুই দেখ্ না, আমি এই চট করে এলুম বলে।"

নারাণী গামছা কাপড় দিয়া কহিল "মন্দিরে যেও না কিন্তু, তা হলে ফিরতে বেলা তিনটা বেজে যাবে। আর তোমার পিত্তি পড়বে।"

যদুবাবু হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা আমি এখনই আসছি।"

নারাণী দয়াদেবীকে বলিল "তোমার ভাত হল পিসীমা?"

দয়াদেবী বলিলেন, "কেন? উনুনটা নিবি?"

নারাণী সহাস্যে কহিল, "হ্যাঁ, এই উনুনে ডাল চাপিয়ে ও-উনুনে তরকারী চাপাব। বড্ড বেলা হয়েছে, না হলে বাবার খেতে দেরী হয়ে যাবে।"

"তোর ভাত হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, ভাত সকালেই হয়ে গেছে।"

"নে, তবে উনুনটা; কিন্তু রান্না হয়ে গেলে উনুনটায় একটু গোবর বুলিয়ে দিস মা।"

"সে বলতে হবে না পিসীমা, আমি জানি।"

"জানবে বই কি মা! হিঁদুর ঘরের মেয়ে আচার বিচার মানবে, ঠাকুর দেবতায় ভক্তি করবে, তবেই না লক্ষ্মীশ্রী হয়। তবেই না শ্বশুর বাড়ীতে সকলে ভালবাসে।"

নারাণী উনানে ডাল চাপাইয়া দয়াদেবীর নিকটে বসিলে দয়াদেবী বলিলেন, "খেয়ে-দেয়ে ধীরুকে একটা চিঠি আমার জবানীতে লিখে দিস্ ত মা! লিখবি যে, টাকা পেয়েছি, আমি ভাল আছি। সে যেন তার শরীরের যত্ন করে, আর যেন একবার ছুটী নিয়ে পূজোর সময় আমার কাছে আসে। বাছার চাঁদমুখখানি আজ কতকাল দেখিনি।" দয়াদেবীর স্বর রুদ্ধ হইল, তিনি বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। কি জানি কেন নারাণীর বড় বড় কাল চোখদুটিও অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। সে নতমুখে হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল। দয়াদেবী নারাণীর ম্লান মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। অন্ধকারের বুকে বিদ্যুতের মতন একটা কথা তাঁর মনে আসিতেই তিনি নারাণীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "আমার ধীরুর বৌ হবি মা, দুজনে আমার বুক জুড়ে থাকবি।"

নারাণীর বুকখানা কি এক অজানা আনন্দের তালে দুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। মাতৃহারা বালিকা সে; বুঝিতে পারিল না কিসের এ আনন্দ, এতদিন কোথায় লুকাইয়া ছিল, আজ হঠাৎ স্নেহময়ী মায়ের মতন তাহাকে বুকে তুলিয়া নিল। দয়াদেবীর স্নেহের বন্যায় ভাসিয়া কতদূর চলিতেছিল তাহার খেয়াল ছিল না। আর দয়াদেবী তাঁহার অন্তরের শূন্য স্থানটা পূর্ণ করিয়া লইতেছিলেন।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল কাহারও খেয়াল নাই। যদুবাবু দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দেখিলেন নারায়ণী দয়াদেবীর বুকে মাথা রাখিয়া আছে, দয়াদেবী তাহাকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া আছেন; দুজনেরই মুখে হাসি, দুজনেরই চক্ষে জল। তিনি হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১০

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু কল্যাণী কিছুতেই স্বামীর সংসারে মন বসাইতে পারিল না। "ভবিতব্য" "অদৃষ্ট" "বিধিলিপি" ইত্যাদি যুক্তিতর্ক-বিরহিত শাস্ত্রীয় প্রবোধ-বচনগুলি কিছুতেই তাহাকে সান্ত্বনা দিল না। একটা অতিবড় দুঃখের আক্রমণে তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অভাব-অভিযোগশূন্য সচ্ছল সংসার, এত বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি, অলঙ্কার প্রভৃতি কিছুই কল্যাণীর মনকে আকৃষ্ট করিল না। জগদীশবাবুর আন্তরিক চেষ্টা ও ভালবাসিবার আগ্রহ, বিধবা ননদিনী কাদম্বিনীর যত্ন ও স্নেহ সমস্তই তাহার নিকট ফাঁকা-ফাঁকা, অন্তঃসারহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল;—এ যেন ভান, সত্যের বাহিরে। কল্যাণী বুঝিল

না, বুঝিতে চাহিল না, নারী-জীবনের সার্থকতা কোথায়; কতখানি আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া তাহা ফুটিয়া উঠে।

আজ বৈকালে শূন্য ঘরের খোলা জানালার পাশে বসিয়া এই কথাটাই কল্যাণী মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছিল, জগদীশবাবু তাহাকে বিবাহ করিল কেন? কেন সে তাহার জীবনটা এমন করিয়া অন্ধকারে ডুবাইয়া দিল? এই অলঙ্কার, এই ঐশ্বর্য্য, ইহার বিনিময়েই কি তাহার নারী-জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা? এই বৃদ্ধ স্বামী, কি চায় সে? প্রেম, ভালবাসা? কল্যাণী এত দুঃখেও হাসিল। হায়, সে যদি তাহার বুকখানাকে চিরিয়া দেখাইতে পারিত, তাহার অন্তর জুড়িয়া একটা কত বড় সাহারা পড়িয়া রহিয়াছে; সেখানে একবিন্দু জল নাই, শুষ্ক তপ্ত মরুভূমি, একটা সীমাহীন শূন্যতা, আর ইহারই পশ্চাতে ছুটিয়াছে স্বামী তৃষাতুরের তীব্র পিপাসা লইয়া। তাহা হইলে কি তাহাকে ইহারা মুক্তি দিবে না? না, ইহজীবনে আর তাহার মুক্তি নাই! তাহাকে বাঁধা হইয়াছে শাস্ত্রের শৃঙ্খল দিয়া, শুধু দেহের ক্ষুধা মিটাইয়া লইবার জন্য,—তার বেশী নয়। ছিঃ ছিঃ! লজ্জায় ঘৃণায় কল্যাণীর অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। পশ্চাতে একটা চাপা হাসির শব্দে মুখ ফিরাইতেই দেখে জগদীশবাবু হাসিমুখে তাঁহার প্রকাণ্ড ভুঁড়িটার উপর হাত বুলাইতেছেন। কল্যাণী মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইল। জগদীশবাবু কহিলেন, "চুপ করে একলাটি এখানে বসে যে?" কল্যাণী কোন জবাব না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কি আমি আসতেই অমনি বুঝি পালানো হচ্ছে? আচ্ছা, বল ত নতুন বৌ, আমি বাঘ না ভাল্লুক, যে আমাকে দেখলেই পালাতে চেষ্টা কর!"

কল্যাণী মাটির দিকে চাহিয়া আঙ্গুলে আঁচলের প্রান্ত জড়াইতে জড়াইতে কহিল "আমি ত তা বলিনি!"

"মুখে বল না বটে কিন্তু—" জগদীশবাবু কল্যাণীর পিঠের উপর হাত রাখিয়া মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিলেন "কিন্তু সত্য করে বলত নতুন বৌ, আমাকে তোমার—"

কল্যাণীর চোখ মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে জগদীশবাবুর হাতখানা সরাইয়া দিয়া কহিল "আমি যাই, কাজ আছে" কল্যাণী ত্রস্তপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। জগদীশবাবু মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন "ওরে নেতা, নেতা!"

চাকর নেত্যধন ছুটিয়া আসিতে জগদীশবাবু কহিলেন "দেখছিস না বেটা, সন্ধ্যে হয়ে এল, যা আমার আফিমের কৌটাটা নিয়ে আয়..."

"যে আজ্ঞে" বলিয়া নেতা চলিয়া গেল!

জগদীশবাবু উদাস দৃষ্টিতে জানালার ভিতর দিয়া দূরে গোধূলির ম্লানিমাপূর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে যাইয়া বসিলেন এবং মনের সঙ্গে নানা তর্ক জুড়িয়া দিলেন! এ কি অভিমান, বিরক্তি, লজ্জা, না ঘৃণা? না, ও বোধ হয় কিছুই নয়, আর কিছুদিন গেলে এই সঙ্কোচের ভাবটা নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে! কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া বলি? এই ত আজ আট মাসের উপর কাটিয়া গেল, কল্যাণী ত এক দিনের তরেও তাহার সঙ্গে কক্ষণও যাচিয়া কথা বলে নাই? যদি "হাঁ" ও "না" এই দুটো কথায় মিটিয়া যায় তাহা হইলে সে অধিক কথা পর্য্যন্ত কহে না। তবে কি আমার বয়স বেশী বলিয়া সে আমায় আন্তরিক ঘৃণা করে? কই তাহারও ত কোন লক্ষণ দেখি না! প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে সে আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হয়! ইহা ত আমি নিদ্রার ভাণ করিয়া কতদিন দেখিয়াছি! আর আমার বয়স এমনই বা কি বেশী? আমার চেয়ে বেশী বয়সেও সেবার হরি মুখুজ্যে তৃতীয়বার বিবাহ করিল! একটি ছেলেও তাহার হইয়াছে; দেখিলে মনে হয় বেশ শান্তিতেই আছে! তবে আমার অদৃষ্টে পরিপূর্ণ সুখ নাই কেন? হায়, আজ যদি সে বেঁচে থাকৃত! অতীত-স্মৃতি প্রাণের উপর কশাঘাত করিল, তিনি শূন্য দৃষ্টিতে ব্যথিত অন্তঃকরণে আকাশের দিকে চাহিলেন। বিরাট অন্ধকারের কালো পরদা তখন পৃথিবীর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, আর তুষার-ধবলমণ্ডিত মেঘের আড়াল হইতে গুটিকয়েক তারা বহুদূরে বসিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া হাসিতেছিল!

জগদীশবাবুর বিধবা ভগ্নী কাদম্বিনী পশ্চাত হইতে ডাকিল "দাদা, দুধ এনেছি।"

"ও কাহু, দুধ এনেছিস্? আচ্ছা ঘরে আয়।" জগদীশবাবু উঠিয়া ঘরে গেলেন! এক ডেলা আফিম মুখে ফেলিয়া, এক ঢোঁক জল খাইয়া, দুধ পান করিয়া মুখ মুছিলেন!

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গাঁয়ের গেজেট্

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

কাদম্বিনী মৃদুকণ্ঠে কহিল "দাদা, রাঙ্গা-ঠানদি, পূজার
র কাশী যাচ্ছে; তাই আমিও মনে করছি এইবার ঘুরে
সি! এখানে মামী রইল, আর বৌ রইল, সে ত সব
দিনে জেনেশুনে নিয়েছে!"

জগদীশবাবু ম্লান হাস্যে কহিলেন, "তবেই হয়েছে রে? তোদের বৌ এই এত বড় সংসার চালাবে? আর মামীর তে সংসারের ভার পড়লে চাকর বামুন যে যেখানে আছে রাই পালাবে, আর আমাকে উপোষ করে মরতে হবে! আমাকে দেখবার কেউ থাকবে না!"

কাদম্বিনী হাসিয়া কহিল "তোমার কেমন এক কথা দাদা! বৌ রইল কি করতে? তোমাকে দেখবে না?"

"এই ত এতদিন হল তোদের বৌএর সঙ্গে ঘর করছিস, এ সংসারের ওপর ওর কত মায়া মমতা দেখিস নি?" বলিয়া জগদীশবাবু হাসিতে লাগিলেন!

"কি যে বল দাদা, তার ঠিক নেই! সংসারের কত কাজ বউ করে তা জান? তা ছাড়া, এই পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ওর কাছে দুপুরবেলা পড়তে আসে, ও-বাড়ীর ছোঠাইমা আসেন; তাঁকে রামায়ণ পড়ে শোনাতে হয়, ঠানদি তার নাতির জন্যে বৌদিকে দিয়ে গলাবন্ধ তৈরী করাচ্ছে। কেমন মিশুক, আমুদে; সকলেই বৌদির সুখ্যাতি করে, আর তুমি কেবল নিন্দে—"

জগদীশবাবু হাসিয়া কহিলেন "আমার নিন্দে করা স্বভাব! যাক্‌গে; তোদের বৌ, তোদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেই হল, আমার আর কদিন—গঙ্গামুখো পা হয়েছে—নেহাৎ মামী কান্নাকাটি করলে, তুই ধরে বসলি, বল্লি, বাপের বংশ লোপ হবে; তাই এ বয়সেও আবার ভালই হক, আর মন্দই হক, একটা কাজ করে ফেলা গেল! না হলে আমার সুখ শান্তি তার সঙ্গে চলে গেছে রে! তোদের নতুন বৌএর কাছে আমি কিছুরই প্রত্যাশা রাখি না।"

কাদম্বিনী জগদীশবাবুর দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া দেখিল কল্যাণী বারান্দার রেলিংটা ধরিয়া অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে! কাদম্বিনী কহিল "অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন বৌ, আমায় কিছু দরকার আছে?"

কল্যাণী মৃদুকণ্ঠে কহিল "পুরুত মশাই এসেছেন, ঠাকুরের বৈকালীর সব যোগাড় হয়েছে—"

"তা তুমিই দাও না, আমি দাদার সঙ্গে কথা কয়ে যাচ্ছি!" কল্যাণী চলিয়া গেল।

জগদীশবাবু কহিলেন "চল্, তা হলে তোদের সঙ্গে আমিও না-হয় দিনকতক ঘুরে আসি! বৌকে ওর মামার বাড়ী পাঠিয়ে দে, বাড়ীতে মামী থাকলেই হবে! আর খাজনাপত্তর ত সব আদায় করা হয়ে গেছে, নায়েব মশাই থাকবে, সব দেখবে শুনবে!"

"তুমি যাবে দাদা? তাহলে বেশ হবে! চল এইবার যাবার পথে গয়ায় বাবার কাজ সেরে যাবে! তারপর কাশীতে যাওয়া যাবে! সেখানে তোমার গুরুদেব আছেন, তাঁর সঙ্গে ত তোমার কতদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই!"

জগদীশবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সেই ভাল, চল্ বেরিয়ে পড়া যাক্। আর বয়স ত হল, কবে আছি কবে নেই, বাবার কাজটা সেরে আসি। গুরুদেবকেও একবার দেখে আসি!"

"তোমার গুরুদেব আমায় লিখেছেন যে 'তোমাদের খুব সুলক্ষণা লক্ষ্মী বউ এসেছে, ওর পুণ্যে তোমার দাদার শ্রীবৃদ্ধি হবে, তোমার বাপের বংশ রক্ষা হবে!' গুরুবাক্য কখনও মিথ্যে হয় না দাদা! তাহলে আমি মামীকে বলে যাবার সব যোগাড় করছি!" বলিয়া কাদম্বিনী চলিয়া গেল।

জগদীশবাবু ধীরে ধীরে বাহিরের বৈঠকখানার দিকে চলিলেন; তাঁহার কাণের কাছে কাদম্বিনীর শেষ কথাটা তখনও ধ্বনিত হইতেছিল। "গুরুবাক্য কখনও মিথ্যা হয় না দাদা!" জগদীশবাবু উদ্দেশে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। (ক্রমশঃ)

শুভ-বিবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সেদিন রাত্রে যখন নীলাম্বর
প্রিয়-পত্নী মনোরমার শ্রীহস্তের সুপাচিত আহারাদির পর
ছড়িয়ে দিয়ে হাত-পাগুলো, লম্বা হ'য়ে কোমল শয্যা-তলে
চক্ষু মুদে গুড়গুড়িটে আপনমনে টান্‌ছে কুতূহলে,
সুবাসিত তামাকটি তার তপ্ত তাওয়ায় জ'মে
শ্রান্তি-হরা, তৃপ্তি-ভরা ঘন সুনীল ধোঁয়া পরিবেষণ করছে তাকে ক্রমে,
এমন সময় মনোরমা ঘরের ভিতর এসে,
নীলাম্বরের ধূম্র পানের রকমখানা দেখে—উঠল ভারি হেসে!
তারপরে সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে ব'সল স্বামীর কাছে
মিষ্টি গলায় বললে "হ্যাঁগা, খবর ওদের আর, নোতুন কিছু আছে?"
মিহি জরীর কাজ-করা সেই রেশমী-চিকণ লক্ষ্ণৌয়ী নল
আব্‌লুশি তা'র অধর স্পর্শে নীলু তখন হর্ষে বিহ্বল,
স্বপ্নলোকের অজানা কোন্ অচিন্-পুরে যাচ্ছে ভেসে
কুণ্ডুলীময় ধোঁয়ার রাজ্যে—আবছায়া এক মায়ার দেশে,
মিলিয়ে গেছে মন থেকে তার দুর্ভাবনার দুঃখ যত
জুড়িয়ে গেছে সংসার-তাপ বাদল বায়ে রোদের মত
ঘুম নেমেছে আঁখির পাতায় আল্‌বোলাটির খেয়াল গানে,
পৌঁছল না মনোরমার কথাটা তাই মোটেই কানে!
"শুনছো ওগো!" ডাকলে আবার গা ঠেলে তার মনোরমা
"এর মধ্যেই' ঘুমিয়ে কাদা?—অবাক ক'রলে তুমি ওমা!
খেয়ে উঠেই প'ড়লে শুয়ে? শুন্‌ছো ওগো, ধোঁয়ার নবাব,
বলি, আমার কথার একটা যা-হোক কিছু দাও না জবাব।
বাদশাহী ওই তামাক টানা একটু এবার যদি, ভালয় ভালয় না দাও তুমি ছেড়ে
মুখ থেকে ওই নলটা আমায় নেহাৎ দেখ্‌ছি তবে, নিতেই হবে কেড়ে!"
নীলু তখন আকাশ ছোঁয়া প্রচুর ধোঁয়ায় উড়িয়ে ফুঁ
তেমনি ভাবে চক্ষু মুদেই ব'ল্‌লে শুধু ছোট্ট "হুঁ!"
অধীর হ'য়ে মনোরমা, ছিনিয়ে নিলে উঠে, নীলুর মুখের নল,
ব'ললে "দাঁড়াও, ক'লকেটাতে দিচ্ছি ঢেলে খানিক্ ঠাণ্ডা কুঁজোর জল—!"
শশব্যস্তে নীলাম্বর দেখলে এবার চোখ দুটি তার মেলে,
তাই ত, এ কি! পত্নী যে তার সত্য করেই সমুদ্যত জল দিতে আজ ঢেলে

একটি গেলাস ভ'রতি ক'রে গড়িয়েছে সে জল,
নয়ত' এটা প্রিয়ার মুখের—মিথ্যা কেবল তবে ভয় দেখানোর ছল!
'হাঁ হাঁ' করে নীলাম্বর একেবারে বসল' তখন উঠে,
ব্যাপার দেখে ফুট্‌লো এবার, ফুলের মতো হাসি—মনোরমার মধুর অধর-পুটে!
নামিয়ে রেখে গেলাসটাকে, ব'ললে অধর টিপে "আচ্ছা এবার করছি তোমায় মাপ,
কিন্তু দেখো আর যেন ফের্ ঘটিয়োনাকো মোর অকারণে এমন মনস্তাপ!
—কর্ম্মনাশা নলটা যদি আবার দেখি তুমি মুখে নিয়েছো তুলে,
তাহ'লে ওই তামাক-টিকে আজ থেকে রোজ দেখো রাখবো জলে গুলে!"
"ব্যাপারটা কি? কী হয়েছে?" হাসতে হাসতে ব'ল্‌লে নীলাম্বর,
"তামাক ত নয় সতীন তোমার, তবে এমন রাগ হঠাৎ কেন প'ড়ল এটার' পর?"
মাথাটি' তার হেলিয়ে লীলায় দু'চার বার ডাইনে থেকে বাঁয়ে
মনোরমা জোড় ক'রে হাত বললে "তোমার পড়ছি দু'টি পা'য়ে,
বন্ধ করো বাজে কথা মাথার দিব্যি ওগো, কাজের কথা দু'একটা আজ কও,
'অনু'র বিয়ের জন্য হেথা—একটি দিনের তরে চিন্তিত কেউ দেখ্‌ছি মোটেই নও।
কি বল্‌লেন, সেদিন যাঁরা এসেছিলেন দেখ্‌তে আমার মেয়ে?
তাঁরাও বুঝি সুন্দরী চান আরও একটু জবর অনুরূপার চেয়ে?"
নীলু ব'ল্‌লে "ক্ষেপ্‌লে মনু, অনুর চেয়ে সুন্দরী আর
বাঙ্‌লা দেশের মেয়ের হাটে হাজারে এক পাওয়াই ভার।
আমাদের এই দুঃখী জাতের সব মেয়েরই রূপের অভাব,
কিন্তু জেনো তোমাদের এই মিষ্ট মধুর শান্ত স্বভাব
তুচ্ছ করে দিয়েছে আজ—রূপের গর্ব্ব যেন—বিশ্বমাঝে ধূলার চেয়েও হীন,
বাঙ্‌লা দেশের শ্যামলা মেয়ের হৃদয় মণির আলোয় সুন্দরীদের রূপের
জ্যোতি দীন!
করুণ হেসে মনোরমা বললে তখন "থামো, তোমাদের এই মিথ্যে কথার জালে
রেখোনা আর এমন করে ভুলিয়ে আমাদের; চুণকালি যে দিচ্ছে লোকে গালে!
রূপের চেয়ে গুণের শোভা সত্যি যদি লাগতো চ'খে ভালো,
বাছতে না' আর এমন ক'রে ছেলের বিয়ের বেলা পাত্রী কেমন? সুন্দরী না কালো?
লজ্জা ক'রে আমার, যখন নির্ল্লজ্জ পুরুষগুলো এসে—জিনিস কেনার মতো—
মেয়েটাকে নেড়ে চেড়ে বাজিয়ে দেখে যায়;—অপমানে বুকখানা হয় ক্ষত!
মুখে তোমরা যতই বলো আমরা দেবী—লক্ষ্মীরূপা—এ সংসারের রাণী,
পুরুষ জাতির সুখ সুবিধার যন্ত্র ছাড়া আর—নই যে বেশী কিছু—স্পষ্ট এটা না
মানলেও অন্তরে তা জানি!"
নীলু এবার গুণ্‌লে প্রমাদ মনোরমার চ'খে—নির্য্যাতিতা নারীজাতির ক্ষোভের
অনল দেখে।
তাড়াতাড়ি ও-প্রসঙ্গ চাপা দেবার তরে ব'লে উঠলো হেঁকে—

"আরে না না, মেয়ে ওদের মনে ধরেছে মনু, গোল ছিল যা দেনা-পাওনা নিয়ে—
আজকে আমি নিজেই গিয়ে তাও এসেছি সব ফর্দ্দমতো হিসেব চুকিয়ে দিয়ে!
গয়না দু'সুট জড়োয়া, সোনার, খাট-বিছানা, বরাভরণ'
এসব ছাড়াও আড়াই হাজার নগদ তারা চেয়েছে পণ,
ফুল-চিরুণী পাবে অনু গায়ে-হলুদে'ই ওখান থেকে
শ্বাশুড়ী তার নিজের হাতের বালা দেবেন বউকে দেখে—"
বাধা দিয়ে বললে মনু "আড়াই হাজার টাকা—নগদ তুমি গুণে ওদের দেবে?"
মনোরমার গলার স্বরে নিরুৎসাহ নীলু—বললে—"দেব,—তাছাড়া আর
পাচ্ছিনে ত আমি উপায় কিছু ভেবে!
যে ক'রে হোক্ যোগাড় ক'রে ওই টাকাটা পুরো দেওয়াই তাদের চাই—
তার কমে আর এ বাজারে পাত্র তেমন ভালো কোথায় বলো পাই?
ছেলের বাপের পয়সা আছে, দিব্যি ছেলে—পড়ছে বি-এ
এমন ছেলের খবর পেলে কন্যাদায়ে লোকে লুফেই নেবে তিনটি হাজার দিয়ে!
দেখতে দেখতে এই করে তো কাটলো কোথা দিয়ে গোটা একটা বছর
বলছিলে না সেদিন তুমি—মেয়ের বয়স ক্রমে—উঠ্‌ছে বেড়ে—তেরো চোদ্দর ওপর!
এখন কি আর ভাবলে চলে নগদ টাকা অতো আস্‌বে কোথা থেকে;
টাকার যোগাড় করিছি আজ চুণীলালের কাছে—ভিটেমাটি সবটা বাঁধা রেখে!"
চম্‌কে উঠে ব'ললে মনু—"সে কি সর্ব্বনাশ! ক'রলে তুমি কি!
কেমন ক'রে শুধ্‌বে সেটা—ধার করবার আগে একটিবারও ভাবলে না কো ছি!
ছেলে দু'টোর হাত ধ'রে কি দু'দিন পরে শেষে—নামবো গিয়ে পথে—"
বাধা দিয়ে বললে নীলু "রোসো রোসো থামো,—মেয়ের বে'টা হয়ে যাক্‌ত' ফতে!
আমি যখন বলেছিলুম ছেলের মতই 'অনু' থাকবে ঘরে, শিখবে লেখাপড়া দেবোনা তার বে'
চটেই আগুন হ'য়েছিলে সে কথা মোর শুনে, মুখ ফোলা সে রাগের বহর
দেখে তখন কে?
কেন', তাতে দোষ কী হ'তো? থাকতো মেয়ে কাছে, ভুগত নাকো শ্বশুর-বাড়ীর জ্বালা;
তুমিই তো ওর বিয়ের জন্যে দিনরাত্রি আমায় উঠতে বস্‌তে
ক'রতে ঝালাপালা!"
কাতর ভাবে বললে মনু' মুখটি করে ভার—"সাধ ক'রে কি বলি,
তোমরা যে গো যুগ-যুগান্ত রেখে এসেছো এই মেয়ে-মানুষের
জাতকে পায়ে দলি!
সত্ত্বা যদি স্বতন্ত্র তার রাখতে কিছু বাকী,
তা'হলে কি এমন করে অপমানের বোঝা ব'হে আমরা নতশিরে
জড়ের মতো থাকি?
চিরকুমারী থাকতে গেলে জীবন চলার মতো,—চাই কিছু তার নিজের সংস্থান,
তা যদি না পায় সে, তবে দিতেই হবে তাকে অর্থকরী শিক্ষা কিছু দান।

নইলে দেশের অসহায় বাল-বিধবার মতো দুঃখে তাদের দগ্ধ হবে জাত,
পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে জুটিয়ে নিতে হবে লজ্জাকটু দু'মুটো রোজ ভাত!
স্বাধীন ভাবে একলা থাকার সুযোগ কি ছাই দ্যায় নিষ্ঠুর এই সমাজ তোমার তাকে,
অকারণে কলঙ্ক দেয় মাথায় তুলে যে গো!
সন্দেহ তার জীবনটাকে তিক্ত করে রাখে!
পুরুষ শুধু থাকতে পারে এই সমাজে অকৃতদার আজীবনটা ইচ্ছা মতো সুখে,
নারীর বেলাই বিবাহটা বাধ্য-বিধি শুধু—এ ভার তার
চাপিয়ে যেন দিতেই হবে বুকে!"
নীলু দেখ্‌লে ঝড় উঠেছে মনোরমার মনে, ধাক্কা এখন সামলে ওঠা ভার।
বললে "দেখো, ও-কথা যাক্, অঘ্রাণেতেই বিয়ে,
এখন থেকেই লাগতে হবে আয়োজনে তার।
আশীর্ব্বাদের দিন করেছি আস্‌ছে রবিবারে; সকালবেলাই মিটিয়ে নেবো দু'পক্ষের কাজ।
কাকে কাকে ব'লতে হবে—রান্না হবে কি কি—এসো একটা ফর্দ্দ করি আজ!"

২

বর এসেছে ঘটা ক'রে, সঙ্গে মেলাই বর-যাত্রী;
একটি মাত্র লগ্ন ছিল ন'টার মধ্যে সে রাত্রি।
'শ্রীবিষ্ণু' সেরে পুরুৎ সুরু ক'রেছে সম্প্রদান
এমন সময় বরের বাপ হেঁকে উঠল "মশাই দাঁড়ান,
কম্ পড়েছে পণের টাকা তিনটি হাজার পাইনি পুরো;
এ স্থলে আর দেবোই না বে' জোচ্চুরী সব! ওঠ্‌রে 'সুরো'—"
ত্রস্ত শুনে নীলাম্বর, শুকিয়ে গেল মুখখানি তার!
গলবস্ত্র করজোড়ে বললে—"সেকি নগদ দেবার
কথাই ছিল আড়াই হাজার, গুণেও আমি দিয়েছি তাই,
বসতবাড়ী বাঁধা রেখে ধার ক'রেছি, আর ত' নাই।
এখন হঠাৎ চেয়ে বসলেন—তিনটি হাজার পুরোপুরি,—
কোথায় পাবো এমন সময়?—কার বাড়ীতে কোরবো চুরি?
নেহাৎ যদি আর পাঁচশো নগদ আপনি নিতেই চান,
কালকে দে'বো যোগাড় করে;—হয়ে যাক্ ভাই সম্প্রদান!"
বল্‌লে শুনে বরের বাপ—"নইক' আমি কাঁচা ছেলে—
ইচ্ছে বুঝি ফাঁকি দেবার সম্প্রদানটা চুকে গেলে?
চ'লবে নাকো ও-চালাকী, অম্বিকা বোস বোকা নয়;
আর পাঁচশো আনাও, যদি কন্যাদানে ইচ্ছে হয়।"
পাত্র সুরেন শুনে এসব সিঁটিয়ে গেল পীঁড়ের ওপর
হেঁট-মুখে সে লজ্জানত; পড়ল খ'সে মাথার টোপর।
দেখতে দেখতে সে ঘরটায় জমে গেল অনেক লোক
কেউ বললে 'এটা জুলুম,' কেউ বললে 'বিয়েটা হোক্'!

বর-ক'নেতে মাঝখানে তার লজ্জাভ'য়ে উঠছে ঘেমে ;
ব্যাপার শুনে মেয়ের দলও এসে পড়েছেন নীচেয় নেমে।
নানান্ লোকের বাক্‌বিতণ্ডায় বেড়ে উঠছে গণ্ডগোল,
অম্বিকা বোস হাঁকছে কেবল "সুরো উঠে আয়, চেলী খোল্"।
সামনে ছিল চুণী মিত্তির, পাড়ার সে এক মস্ত ধনী,
হেসে বল'লে "বোস্‌জা মশাই, মেয়ের বাপ কি টাকার খনি ?
ইচ্ছে মতো কুপিয়ে নেবেন পণ পাওনার দাবী দিয়ে,
ভদ্রলোকের এ ব্যবহার দেখিনি আর, ব্যাপার কী এ ?—
আসেননি ত' বেচ্‌তে ছেলে, নিতে এসেছেন পুত্রবধূ
দেখুন দেখি মায়ের আমার কান্তি কেমন স্নিগ্ধ-মধু !
যা হোক্, এখন হুকুম করুন—শেষ হ'য়ে যাক্ সম্প্রদান—
আমিই দিচ্ছি বাড়্‌তি টাকা—আপনি যেটা লুট্‌তে চান !"
শুনে সবাই 'ধন্য ধন্য' করে উঠল চতুর্দ্দিকে
"—এই ত' হলো ব'নেদী চাল, বড় লোকের কাজ ত' ঠিক এ !"
পাঁচশো টাকার পাঁচখানা নোট চুণী মিত্তির দিলে গুণে ;
আনন্দে সব মেয়ের দল উলু দিয়ে উঠলো শুনে !

৩

চল্‌ল' আবার সম্প্রদানটা যথারীতি মন্ত্র প'ড়ে ;
বরযাত্রীর কাছে গিয়ে চুণী মিত্তির করজোড়ে
বল্‌লে তখন ; "চোখের উপর দেখলেন ত' ব্যাপার আজ,
ছেলের বে'তে ভদ্রলোকের এই কি মশাই উচিত কাজ ?
লগ্ন যদি থাকতো আজ আর—তবে নিশ্চয় এটার ঘরে—
দিতাম নাকো নীলাম্বরকে মেয়ে দিতে এমন ক'রে !
বলেন যদি আপনারা সব—বোস্‌জাটাকে শিক্ষা দিই,
যে টাকাটা ঠকিয়েছে সে, কায়দা ক'রে ফেরত নিই !"
শুনে সবাই সমুৎসাহে ব'ললে "অমত নাইক' কারো,
জব্দ করো ইতরটাকে যেমন ক'রে তোমরা পারো !"
চুণী মিত্তির গিয়ে তখন বরের বাপকে ব'ললে ডেকে—
"এই এতজন ভদ্রলোককে ধ'রে এনেছেন কোথা থেকে ?
এঁদের তো কেউ আমরা গিয়ে ক'রে আসিনি নিমন্ত্রণ ;
এ বাড়ীতে হয়নি এঁদের আহারাদির আয়োজন।
আপনি যখন ডেকে এনেছেন, আপনারই এ তখন ভার—
কি খাওয়াবেন এই রাত্রে—ব্যবস্থাটা করুন তার !"
অম্বিকে বোস বললে রেগে—"এ সব কথার মানেটা কি ?
ছেলের বে'তে বরযাত্রা সবাই এমন এনেই থাকি।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা যা, করবে সে তো মেয়ের বাপ ;
এ যে দেখছি আমার ওপর দিতে চাইছেন উল্টো চাপ !"
চুণী মিত্তির বললে হেসে "যা বল'ছেন খুবই ঠিক ;
কিন্তু, আমার ইচ্ছেটা আজ—বজায় রাখতে উভয় দিক,
আড়াই হাজার কথা ক'য়ে,—আর পাঁচশ' নিলেন ধরে,
বর তুলে নে' চলে যাবার ভয় দেখালেন গায়ের জোরে ;
এতো লোকের খাওয়া-দাওয়ার ক'রতে হ'লে আয়োজন
বুঝতে কি আর পারছেন না—অনেক টাকার প্রয়োজন ?
আপনি যেটা নিলেন বেশী, সে টাকাটা থাকলে হাতে
ভালমন্দ যা হোক্ কিছু দিতে পারতেম এঁদের পাতে ;
কিন্তু যখন খরচটা তার নগদ আপনি নিলেন চেয়ে,
আমরা ওসব পারবো না আর ; আপনি শুধু যাবেন খেয়ে !"
শুনে আগুন অম্বিকে বোস ব'ললে "তোমরা অতি ইতর !"
"সেটা তুমিই" কে একজন বলে উঠল' ভীড়ের ভিতর !

৪

স্ত্রী-আচার ও সম্প্রদানটা ইতিমধ্যেই গেছে চুকে'
বধূর রূপে মুগ্ধ সুরেন বাসর-ঘরে হাসছে সুখে ;
এমন সময় শুনতে' পেলে নীচে থেকে হাঁক্‌ছে পিতা—
"সুরো, এখনি আয় নেমে আয়, চাইনি এমন কুটুম্বিতা !
ছোটলোকের এ মেয়েকে যাবই না আর আমি নিয়ে—
এই মাসেতেই দেবো আবার ছেলের আমার অন্য বিয়ে !"
মলিন হ'য়ে উঠল শুনে নববধূর ইন্দুমুখ— !
মিলিয়ে গেল কোন্ আঁধারে বাসর-ঘরের দীপ্তিটুক্ !
রোষে ক্ষোভে অভিমানে সুরেন এল নীচেয় নেমে,
লজ্জিত সে পিতার কার্য্যে, উত্তেজনায় উঠ্‌ছে ঘেমে,
বাপ ব'ললে "বেরিয়ে চলো, হাজির আছে বাইরে গাড়ী,
এই কাপড়েই আমার সঙ্গে এখনই আজ ফিরবে বাড়ী—"
রুক্ষভাবে ব'ললে সুরেন—"চলুন, কিন্তু কাজটা খারাপ—
একি আপনার অত্যাচার !—সইবে কেন এত পাপ ?
দাদার বে'তেও এই কাণ্ড করেছিলেন কুড়ুল গ্রামে,
ফিরিয়ে দিন সব টাকাকড়ি নিয়েছেন যা আমার নামে—"
বলতে বলতে ছিনিয়ে নিয়ে বাপের হাতের টাকার তোড়া
ব'ললে—"আমি চাইনে এ-সব, যত নষ্টের এই ত গোড়া !"
চুণীবাবুকে ব'ললে ডেকে "ফিরিয়ে নিন্ এই টাকাকড়ি,
এই আপনার হীরের আংটি, এই দেখে নিন সোনার ঘড়ী—"

বাপকে ডেকে বললে—"আমি, সাক্ষী রেখে নারায়ণ—
অগ্নি ছুঁয়ে বেদমন্ত্রে—পত্নীরূপে আপনি গ্রহণ
করেছি আজ সভায় যাকে,—সঙ্গে তাকে নে'যেতে চাই,
নিরপরাধ সে বালিকায় কোন্ বিধানে ত্যাগ করে যাই ?"—
ভীষণ চটে অম্বিকে বোস ব'ললে "তবে থাক্ এখানে,
আজ থেকে তুই ত্যজ্যপুত্র, স্থান পাবিনি আর সেখানে।"—
বলতে বলতে বেরিয়ে গেল, মুখ ক'রে তার—কালো—আঁধার,
বাইরে থেকে শুনতে পেলে—উঠছে ছেলের—'জয় জয়কার!"
চুণী মিত্তির জড়িয়ে বুকে ব'লছে—"বাবা থাক্ বেঁচে থাক্!"
ঘন ঘন উঠ্ছে উলু,—মেয়ে-মহলে বাজছে শাঁখ!

তক্ষশিলা *

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এ

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবস্থান এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য

তক্ষশিলা জেলা রাওলপিণ্ডি সহরের ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, এবং সীমান্ত প্রদেশান্তর্গত পেশাওয়ার নগরের ৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উত্তর পারে অবস্থিত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম General Cunningham প্রাচীন লেখকদের প্রদত্ত অবস্থান-নির্দ্দেশ বিচার করিয়া এই স্থানকে তক্ষশিলা বলিয়া অনুমান করেন। তৎপর এখানে আবিষ্কৃত কতিপয় প্রাচীন লিপির মধ্যে তক্ষশিলার উল্লেখ দৃষ্টে, এই স্থানই যে তক্ষশিলা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ট্যাক্‌শিলা জংশন হইতে মূল লাইন পশ্চিম দিকে পেশাওয়ার অভিমুখে, এবং শাখা লাইন উপত্যকার প্রান্তর-বক্ষ ভেদ করিয়া উত্তর দিকে, কাশ্মীরের পথে, হেভেলিয়াঁ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্র-বক্ষ হইতে এই উপত্যকার উচ্চতা প্রায় ১৭০০ ফিট।

তক্ষশিলায় পৌঁছিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমরা যেন পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক-ছিন্ন, জনসমাগম-বিরল এক পরিত্যক্ত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। চতুর্দ্দিকেই উত্তুঙ্গ শৈলরাজির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর এই রমণীয় উপত্যকাটিকে পরিবেষ্টিত করিয়া ঠিক যেন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সযত্নে ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। উত্তরে সীমান্ত প্রদেশস্থ হাজরা জেলার বিশাল-গর্ভ পাহাড়; পূর্ব্বে মারি-শৈলের শাখা-প্রশাখা; দক্ষিণে বিখ্যাত মারগালা পাহাড়; পশ্চিমে বহুবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ শৈলস্তূপ শ্রেণী,—ইহারই মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন বৈদেশিক ও স্বদেশী নরপতিবৃন্দের ক্রীড়াভূমি, ইতিহাস-বিশ্রুত, কীর্ত্তি-বহুল, প্রকৃতির রম্য লীলা-নিকেতন তক্ষশিলার সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা।

উপত্যকার উত্তর দিক দিয়া হারো নাম্নী পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিতা। হারো হইতে আনীত বহুসংখ্যক কৃত্রিম জল প্রণালী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইয়া শস্যক্ষেত্র সমূহের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী মারগালা পাহাড়ের পাদনিম্নস্থ একটি ঝরণা হইতে 'কালা' নামক জলস্রোত বাহির হইয়া পশ্চিমাভিমুখে বহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকের শৈলমালা হইতে বহুসংখ্যক কঠিন প্রস্তরময় ঊর্দ্ধ-শীর্ষ পাহাড়রাশি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া উপত্যকার পূর্ব্ব অংশ কোণাকুণি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই শৈল-শ্রেণীর পশ্চিমাংশ 'হথিয়াল' নামে পরিচিত। উত্তর ভাগের উপর দিয়া পুণ্ডী নালা নামক হারো নদীর একটি ক্ষীণকায় উপস্রোত অন্যান্য বহুবিধ প্রশাখা সহ প্রবাহিত। দক্ষিণাংশের উপর দিয়া, হথিয়ালের পশ্চিম পাদদেশ ধৌত করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তক্ষা বা তক্ষা নালা বহিয়া গিয়াছে। এই অংশের স্থানে স্থানে বহু গভীর গহ্বর ও কঠিন প্রস্তরময়, উদ্ভিদাদিশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের স্তূপ অবস্থিত। উপরিউক্ত নদী এবং নালাগুলি বৎসরের অধিক সময়ই জলশূন্য থাকে; ইহাদের তলমধ্যস্থ শ্বেত উপলখণ্ড রাশির স্তর দূর হইতে ঠিক রৌপ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

মোটের উপর স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম—উর্দ্ধে স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশের নীল চন্দ্রাতপ, চতুর্দ্দিকে বিচিত্র-বর্ণ শৈলরাজির প্রাচীরবৎ পরিবেষ্টন, অধোদেশে নিম্নভূমে অথবা শৈল-অঙ্কে শস্য-শ্যামল ক্ষেত্ররাজি, স্থানে স্থানে ঘনপত্র-সমন্বিত ফলাই এবং সোনাখা বৃক্ষের

* [এই প্রবন্ধান্তর্গত তক্ষশিলার প্রাচীন কীর্ত্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিত্র, প্রত্ন-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ (Director General of Archaeology) Sir John Marshall অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুদ্রিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।—লেখক]

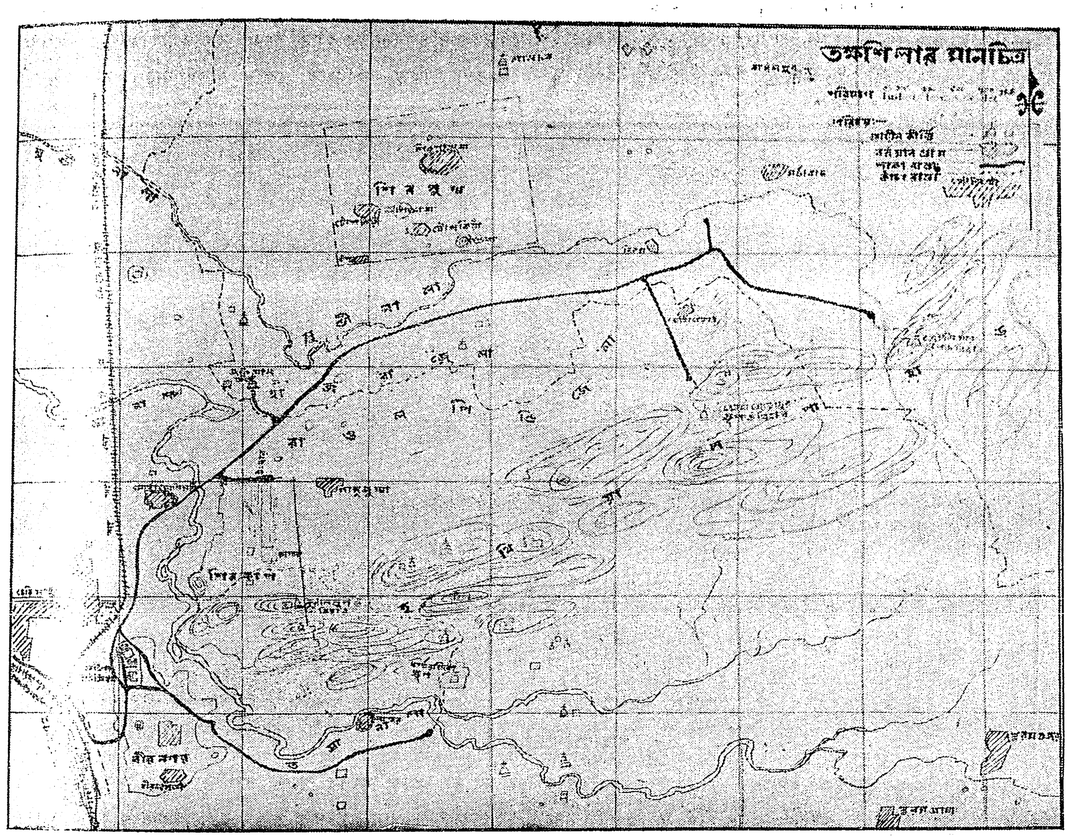

তক্ষশিলার মানচিত্র

কুঞ্জবীথিকা, দূরে দূরে সমতল ভূমি অথবা পাহাড়োপরিস্থ এক একখানি ক্ষুদ্র মনোরম পল্লী, মাঝে মাঝে রজতশুভ্র অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর ইতস্ততঃ বক্র গতি-রেখা, আর সর্ব্বোপরি সমগ্রের মধ্যে বিরাজিত একটা বীর, স্থির, সৌম্য, শান্ত, গম্ভীর, পবিত্র ভাব,—ভাবুকের উপভোগ্য!

উল্লিখিত দ্বিধা-বিভক্ত ভূখণ্ডের মধ্যে, স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশনের ঠিক উত্তর-পূর্ব্বে বিনষ্ট-সমৃদ্ধি তক্ষশিলার প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত থাকিয়া আজ তাহার বিগত গৌরব-মহিমা ঘোষণা করিতেছে। তক্ষশিলার গৌরব-রবি অস্তমিত হইবার পর হইতে এতাবৎকাল অধিকাংশ ধ্বংস-স্তূপই কৃষকগণের শস্য ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; কতকগুলির উপর গ্রাম বসিয়া গিয়াছে; আর কতকগুলি পাহাড় উপরিস্থ সৌধের ভগ্নাবশেষ নানাবিধ বৃক্ষলতা ও মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত হইয়া একরূপ নিশ্চিহ্নই হইয়া আসিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে বিগত কয়েক বৎসর অবধি ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্ন-বিজ্ঞান বিভাগ হইতে এই সমুদায় স্থান খনন করিয়া কতিপয় প্রাচীন নগর ও মন্দির, বহুসংখ্যক বৌদ্ধ স্তূপ ও সঙ্ঘারাম বা বিহার, এবং তন্মধ্যস্থিত অসংখ্য পুরাতন দ্রব্য সামগ্রী আবিষ্কার করা হইতেছে। প্রত্ন-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ (Director General of Archaeology) সুপণ্ডিত Sir John Marshall মহোদয় অনুসন্ধিৎসু দর্শকবৃন্দের সুবিধার্থে উক্ত প্রাচীন দ্রব্যাদি স্থানীয় অফিস-সংলগ্ন একটি গৃহে অস্থায়ীভাবে রক্ষা করিয়া সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

আবাল্য-শ্রুত তক্ষশিলায় পৌঁছিয়াই এই সকল কীর্ত্তিরাজি দর্শন করিয়া বহু দিনের সযত্ন-সঞ্চিত গোপন আশা তৃপ্ত করিতে লাগিলাম।

আমরা ক্রমে ক্রমে উল্লিখিত নগর ও অন্যান্য সৌধাবলীর বিশদ বর্ণনা প্রদান করিব। তৎপূর্ব্বে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তক্ষশিলার ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

তক্ষশিলার বিভিন্ন নাম।—প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তক্ষশিলার বিভিন্ন নাম পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত পুস্তকাদিতে "তক্ষশিলা" নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "তক্ষশিলা"র অর্থ Dr. Wilsonএর মতে "কর্ত্তিত শৈল"; Sir John Marshallএর মতে "কর্ত্তিত শিলার নগরী"; Prof. Buhlerএর মতে "নাগরাজ তক্ষকের শৈল।" কোন কোন গ্রন্থে "তখশিলা" দেখা যায়। একখানি তাম্রশাসনে ইহার পালি নাম "তক্কশিলা" উৎকীর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, "তক্ক" জাতি কর্ত্তৃক এই নগরী স্থাপিত বলিয়া ইহার নাম "তক্কশিলা"। রামায়ণে দেখা যায়, ভরত তাঁহার পুত্র তক্‌খের নামানুসারে ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন "তক্‌খশিলা।" প্রবাদ এই—ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার পূর্ব্ব এক জন্মে এইখানে নিজ মস্তক অপরকে কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তক্ষশিলা "তক্ষশির" অর্থাৎ খণ্ডিত বা কর্ত্তিত মস্তক নামে উক্ত হইয়াছে। এই অর্থে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ইহার নামকরণ করিয়াছেন "চু-ষা-ষি-লো"—"খণ্ডিত মস্তক।" তক্ষশিলায় প্রাপ্ত একখানি খরোষ্ঠি লিপিতে ইহার নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে "তছশির।" তিব্বতীয় ভাষায় ইহার নাম "rdo-hjog" অর্থাৎ কর্ত্তিত শিলা। গ্রীক এবং রোমের লেখকগণ লিখিয়াছেন, "ট্যাক্‌শিলা" (Taxila)। বলা বাহুল্য, অধুনা প্রচলিত ইংরাজী নামও "ট্যাক্‌শিলা।" এখানকার স্থানীয় লোকে বলে "টেশ্‌কিলা।"

তক্ষশিলার প্রাচীনতা।—অতীতের জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, নবাগত আর্য্যজাতি-অধ্যুসিত পঞ্চনদ প্রদেশের একদা-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই পুরাতন নগরটির প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। তথাপি যে সেই সুদূর অতীতে, সেই নবীন প্রভাতের নবীন আলোকে উদ্ভাসিত অতীতের তলে পঞ্চনদ ভূমি তথা সমগ্র ভারতের বক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া তক্ষশিলার গৌরব-দুন্দুভি নিনাদিত হইত, এবং তাহার গৌরবোন্নত শীর্ষে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িত,—তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যীশুর জন্মের অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তক্ষশিলার প্রাচীনতম নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল—বর্ত্তমান আবিষ্কার তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। (১)

প্রাচীন সাহিত্যে তক্ষশিলার উল্লেখ। ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যেও তক্ষশিলার ভূরি ভূরি উল্লেখ তাহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ দিতেছে। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়,—আমরা পূর্ব্বেই

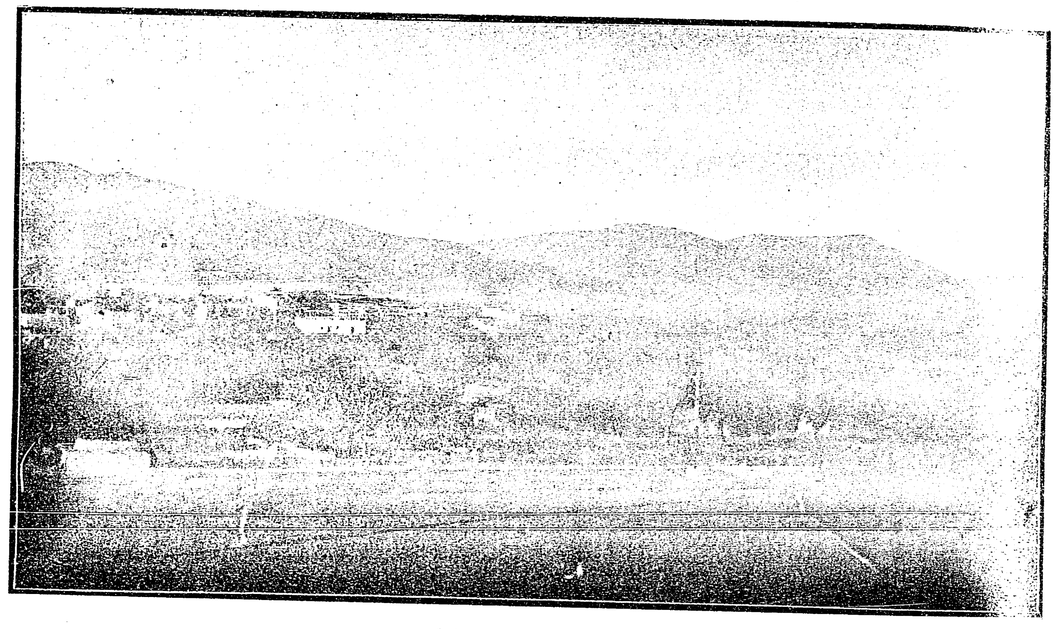

পাহাড়োপরিস্থ টেরিসাহাঁ গ্রাম

(১) The foundation of the earliest city goes back to a very remote age, at least to the second, if not to the third, millenium before our era."—Sir John Marshall (Annual Report of the Director General of Archaeology, 1912—13, p. 5).

উল্লেখ করিয়াছি—ভরত তাঁহার পুত্র তক্‌খ এবং পুষ্কলের নামানুসারে গন্ধর্ব্ব ও গান্ধার প্রদেশে যথাক্রমে তক্‌খশিলা এবং পুষ্কলবত নামক দুইটি নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পুত্রদ্বয়কে তথাকার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রকৃতিপুঞ্জের ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য স্থান দুইটির প্রসিদ্ধি ছিল। সারি সারি পণ্য-বীথিকা, সুরম্য অট্টালিকা, সপ্ততল সৌধ, মনোহর মন্দির এবং তাল-তমাল বকুল-তিলক প্রভৃতি বৃক্ষরাজি নগরদ্বয়ের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিত। ভরত তথায় পাঁচ বৎসর বাস করেন। (২) মহাভারতে দেখা যায়, রাজা জন্মেজয় তক্ষশিলা জয় করার পর তথায় তাঁহার বৃহৎ সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যজ্ঞের সময় সমস্ত মহাকাব্যখানি পঠিত হইয়াছিল। বায়ু পুরাণে তক্ষশিলা

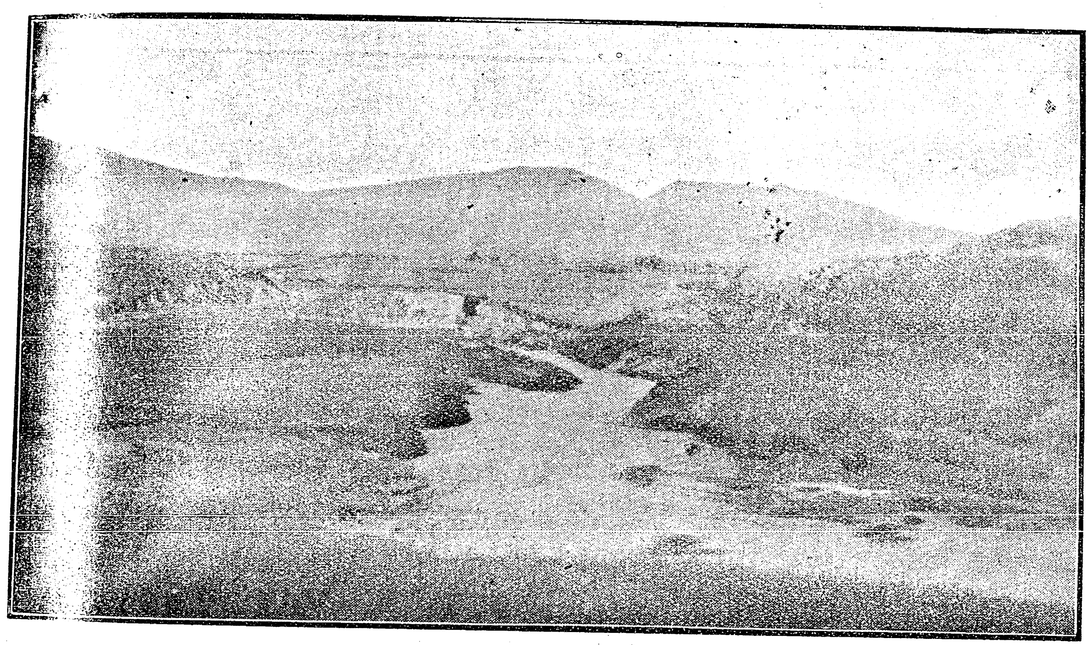

তক্ষালার এক দৃশ্য

তক্‌খের রাজধানী এবং রমণীয় নগরীরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নি-পুরাণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণেও তক্ষশিলা "……রম্যা তক্ষশিলা পুরী" রূপে বর্ণিত হইয়াছে। (৩) এতদ্ব্যতীত, পাণিনি, রঘুবংশ, বৃহৎ সংহিতা, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য-গ্রন্থেও তক্ষশিলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র।—খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে তৎপরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত বিশাল শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশিলার সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের বহিঃস্থিত মিশর, ব্যাবিলন, সিরীয়া, আরব, চীন, তিব্বত প্রভৃতি সুদূর দেশ হইতে আগত বহু শিক্ষার্থী তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। এই বিদ্যালয়ে "তিন বেদ, অষ্টাদশ বিদ্যা" শিক্ষা দেওয়া হইত। মহা ভাষ্যকার পতঞ্জলি, প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ্ পাণিনি এবং কুশাগ্র-বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য এখানে শিক্ষার্থ আগমন করিয়াছিলেন। (৪) বৌদ্ধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ জাতকাদিতে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশিলা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ধম্ম পদট্‌ঠ-কথায় দেখা যায়, কোশলাধিপতি পশেনদী তক্ষশিলায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিনয় পিটক নামক পুস্তকানুসারে মহারাজ বিম্বিসারের সভা-চিকিৎসক প্রসিদ্ধনামা জীবক তক্ষশিলায় ভেষজ এবং শল্য-বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের যুবরাজগণ এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এক স্থানে দেখা যায়, লালহ দেশের (লালহ=রালহ=হুগলী জেলা) জনৈক যুবক বিদ্যা-লাভার্থ তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন। বহু সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এখানে বাস করিতেন। একখানি জাতকে তৎকালীন ছাত্রজীবনের একটি অতি মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বারাণসী-অধিপতির জনৈক পুত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গমন করেন। তিনি অধ্যাপকের দক্ষিণা-বাবদ এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সঙ্গে লইয়া যান। সেই সময় দুই শ্রেণীর ছাত্র ছিল—প্রথম, যাহারা তাহাদের অধ্যাপনার জন্য দক্ষিণা প্রদান

(২) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা প্রণীত "Historical Gleanings."

(৩) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা প্রণীত "Historical Gleanings."

(৪) ভারতী, ১৩৩২।

করিত ; দ্বিতীয়, যাহারা দক্ষিণার পরিবর্ত্তে দিবাভাগে অধ্যাপকগণের সেবা করিত, এবং রাত্রিকালে অধ্যয়ন করিত। প্রথমোক্ত ছাত্রগণ অধ্যাপকের গৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় বাস করিত। অপরাধ করিলে সে সময়েও দৈহিক শাস্তি দেওয়া হইত। জনৈক রাজকুমার কোন অপরাধের জন্য তদীয় অধ্যাপক কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছিলেন।—চিত্ত সম্ভূত জাতকে দেখা যায়, কেবল উচ্চ শ্রেণী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়-গণকেই শিক্ষা দেওয়া হইত।—"বোধিসত্ত" (বোধিসত্ত্ব) তাঁহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে তক্ষশিলায় গমন পূর্ব্বক বিবিধ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, অনেক জাতক-গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে। আমরা নিম্নে এই জাতক গল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি—

(১) বারাণসী-অধিপতি ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব কোন

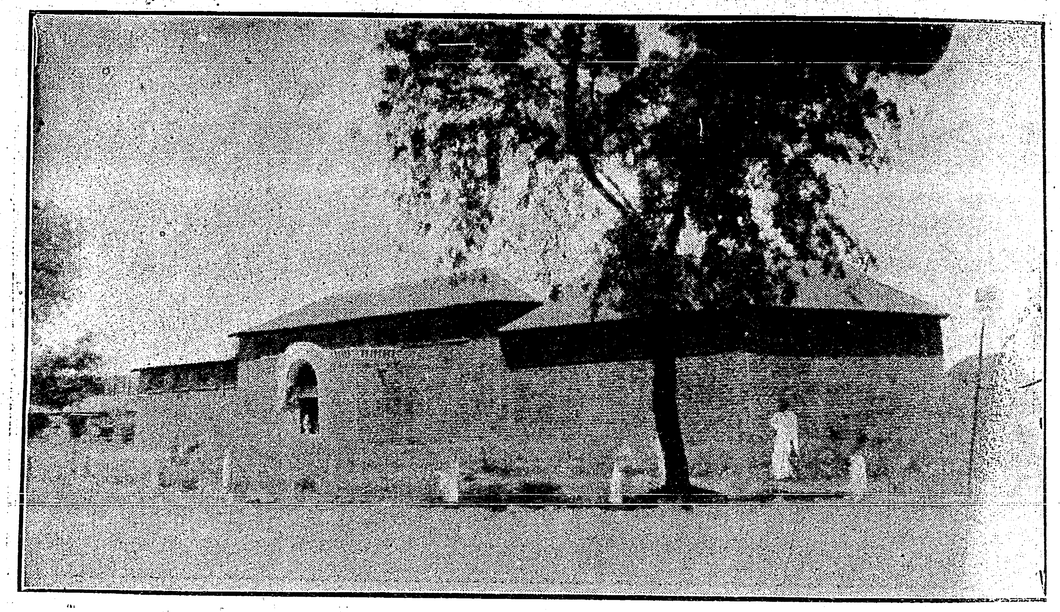

তিনি তদীয় পিতা কর্ত্তৃক তক্ষশিলায় প্রেরিত হইয়া বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি তদীয় অধ্যাপকের নিকট হইতে "খগ্গ রতণ" (মূল্যবান্ খড়্গ), "সন্ধিযুত্ত মেণ্ড সিঙ্গা ধনুম্" (মেষের শৃঙ্গ নির্ম্মিত ধনুক), "সন্ধি যুত্ত তুণ হিরম" (সন্ধি স্থানে নির্ম্মিত তূণ), "সন্নাহকঞ্চুকম্" (বর্ম্ম), "উণহিস" (উষ্ণীষ) প্রভৃতি লাভ করেন।—বোধিসত্ত্ব তথায় পাঁচ শত যুবককে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত বিদ্যাগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, যথা—"সরলট্ঠি" (তীর দ্বারা লাঠি নির্ম্মাণ), "সর রজ্জুম" (তীর দ্বারা রজ্জু তৈরী), "সরবেণী" (তীর দ্বারা বেণী নির্ম্মাণ), "সরপাসাদ" (তীর দ্বারা প্রাসাদ গঠন), সরমণ্ডপ (তীর দ্বারা মণ্ডপ নির্ম্মাণ), "সরসোপান" (তীর দ্বারা সোপান নির্ম্মাণ), "সরপোক্খরণী" (তীর দ্বারা পুষ্করিণী

মিউজিয়মের নব-নির্ম্মিত গৃহ

এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তক্ষশিলায় "তিন বেদ, অষ্টাদশ 'বিজ্জা' (বিদ্যা)"—অধ্যয়ন করেন (কোসিয় জাতক)।

(২) বারাণসী-অধিপতি ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব তদীয় প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ব্রহ্মদত্ত কুমারো নাম প্রাপ্ত হন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি তক্ষশিলায় গমন পূর্ব্বক "তিন বেদ, অষ্টাদশ 'বিজ্জা'য়" ব্যুৎপত্তিলাভ করেন (দুম্মেধ জাতক)।

(৩) বারাণসী-অধিপতি অসদিসের জ্যেষ্ঠপুত্র বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় "তিন বেদ, অষ্টাদশ 'বিজ্জা'" আয়ত্ত করেন (অসদিস জাতক)।

(৪) বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং পরে একজন ধনুর্বিদ্যাবিশারদরূপে খ্যাতিলাভ করেন (ভীমসেন জাতক)।

(৫) বোধিসত্ত্ব জনৈক পুরোহিতের স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

গঠন), "সরপদুমং" (তীর দ্বারা পদ্ম রচনা), "সরবসসম" (তীরের একত্র নিক্ষেপ)—(সরভঙ্গ জাতক)।

(৬) বারাণসী-অধিপতি ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তক্ষশিলার জনৈক অধ্যাপকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করেন (পঞ্চাবুধ জাতক)।

(৭) বোধিসত্ত্ব জনৈক পুরোহিতের স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি তদীয় মাতৃ-আজ্ঞানুসারে বিশ হাজার যোজন দূরবর্ত্তী তক্ষশিলা নগরীতে গমন করেন, এবং এক দিনেই "হৃত্থিহুত্তম" শিক্ষা করিয়া চলিয়া আসেন (সুসীম জাতক)।

চাম্পেয্য জাতকে দেখা যায়, বারাণসীর জনৈক যুবক তক্ষশিলায় "অলম্বন মন্তম" (সর্প বশীভূত করিবার মন্ত্র) শিক্ষা করেন।

ব্রহাছত্ত জাতকে উল্লিখিত আছে, কোশলাধিপতির এক পুত্র তক্ষশিলায় "নিধি উদ্ধরণ মন্তম" শিক্ষা করেন। (৫)

এতদ্ব্যতীত দিব্যাবদান, দীপবংশ, অবদান-কল্পলতা প্রভৃতি অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে, এবং পৌমচরিয়,—আবশ্যক নিরুক্তি, ত্রিষষ্টি-শলক পুরুষ-চরিত, বিধিপক্ষ, প্রভাবক চরিত, দর্শন রত্ন রত্নাকর, হির সৌভাগ্য, শত্রুজয় মাহাত্ম্য প্রভৃতি জৈন গ্রন্থে তক্ষশিলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীক এবং চৈনিক লেখকদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে, এবং কতিপয় প্রাচীন লিপি ও মুদ্রা অবলম্বনে এ পর্য্যন্ত তক্ষশিলার যে ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ নহে। যাহা হৌক, আমরা এক্ষণে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। (৬)

পারসীক অধিকার

পারস্যাধিপতি দারয়াবুসের কোন কোন উৎকীর্ণ লিপিতে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে,—খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ অথবা ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গান্ধার, সিন্ধুদেশ এবং সিন্ধুনদের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী পঞ্জাবের কিয়দংশ সহ তক্ষশিলা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (পক্ষান্তরে কোন কোন বৌদ্ধ জাতকে তক্ষশিলা—গান্ধার প্রদেশেরই রাজধানী রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।) গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস পারস্য-সম্রাটের ভারত-আক্রমণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"দারয়াবুস গান্ধারের সীমান্তে উপস্থিত হইয়া সম্ভবতঃ ৫১০ খৃঃ পূঃ অব্দে স্কাই-লাক্স নামক স্বীয় গ্রীক সেনাপতিকে সিন্ধুনদের উভয় কূলবর্ত্তী অধিবাসীদের অবস্থা অনুসন্ধান জন্য প্রেরণ করেন। স্কাইলাক্স প্রত্যাবৃত্ত হইলে দারয়াবুস সসৈন্যে বহির্গত হন। পারসীক সম্রাট ভারতবর্ষের কিয়দংশ বিজিত করিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি ভারতবর্ষের কতদূর পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। কিন্তু হিরোডোটাসের ইতিহাস পাঠ করিলে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, গান্ধার এবং সিন্ধুনদের উভয় কূলবর্ত্তী স্থান পারসীক অধিকারভুক্ত ছিল, এবং সে অধিকার সিন্ধু-সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।…ফলতঃ পশ্চিম পঞ্জাবের অধিকাংশ (তক্ষশিলা ইহার অন্তর্গত ছিল) এবং সিন্ধুদেশ পারস্য সাম্রাজ্যাধিপতির হস্তগত হয়। হিরোডোটাসের মতে এই অংশ পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ এবং সারবান ছিল। এরূপ কথিত আছে যে, "এই অংশ হইতে পারসীক সম্রাটের রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ আদায় হইত, এবং পঞ্জাব ও সিন্ধুবাসীরা তাঁহাকে সুবর্ণ খণ্ডে রাজস্ব প্রদান করিত।" (৭) খৃঃ পূঃ ৫ম অথবা ৪র্থ শতাব্দীর আর্ম্মিয় অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি প্রস্তরলিপি তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতেও তক্ষশিলায় পারসীক প্রভাব সূচিত হইতেছে। এই সময়ে এবং ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া তক্ষশিলার শিক্ষা ও সাধনার বিশাল প্রতিষ্ঠান হইতে উৎসারিত জ্ঞান ও সভ্যতার যে মন্দাকিনী ধারা ভারতবর্ষের বক্ষ প্লাবিত করিয়া তাহার বাহিরে যাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার অমৃত রস পান করিবার মানসে শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতের বহিঃস্থিত বহু সুদূর দেশ হইতে শত শত জ্ঞানপিপাসু এসিয়ার এই পুণ্য তীর্থ-ক্ষেত্রে আসিয়া সমবেত হইতেন,—ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

তক্ষশিলা তথা সমগ্র পঞ্জাবে কতদিন পারসীক অধিকার বিদ্যমান ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তবে ইহা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে যে, খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দের পূর্ব্বেই তক্ষশিলা পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। উক্ত অব্দে গ্রীক বীর আলেকজণ্ডার পঞ্চনদ ভূমি আক্রমণ করেন ; এই সময়ে তক্ষশিলায় অস্তি (মতান্তরে আম্ভি ; গ্রীক লিখিত নাম ওম্ফিস্ বা ট্যাক্শাইলেস্) নামক একজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন।

মাসিডোনীয় অধিকার।

আলেকজণ্ডারের আক্রমণ।—গ্রীসের অন্তর্গত মাসিডোন প্রদেশের অধিপতি মহাবীর আলেকজণ্ডার দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কাবুল এবং সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী কতিপয় ক্ষুদ্র জনপদ বিমর্দ্দিত ও বিমথিত করিতে করিতে খৃঃ পূ: ৩২৬ অব্দের বসন্তকালে উন্দ্ (উদভাণ্ড) নামক স্থানে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তক্ষশিলা রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তক্ষশিলা রাজ্য পশ্চিমে সিন্ধুনদ এবং পূর্ব্বে ঝিলাম (বিতস্তা) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময় তক্ষশিলার রাজা অস্তি তদীয় প্রতিবেশী অভিসারাধিপতি এবং বিতস্তার পরপারবর্ত্তী রাজ্যের পরাক্রান্ত নৃপতি 'পুরুর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। আলেকজণ্ডারের আগমনে শত্রুদিগকে দমন করিবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত বিবেচনা করিয়া, অস্তি গ্রীক বীরের সাহায্য লাভের আশায় তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াই তাঁহার নিকট বশ্যতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক দূত প্রেরণ করিলেন, এবং তদীয় কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য তক্ষশিলা হইতে নিজ সৈন্যদল চালনা করতঃ স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। এইরূপে আলেকজণ্ডারের সহিত অস্তির সন্ধি স্থাপিত হইল। আলেক-জণ্ডার পুরুর রাজ্য আক্রমণোদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইবার মানসে কয়েক সপ্তাহ তক্ষশিলায় অস্তির প্রাসাদে অবস্থান করেন। অস্তি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আলেকজণ্ডার অস্তিকে সে রাজ্যের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। অস্তি বিজেতার প্রসাদ লাভে প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদিগকে সুবর্ণমুকুট উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। গ্রীক সৈন্যের জন্য প্রচুর আহার্য্য প্রদত্ত হইল। ফলতঃ রাজা অস্তি আলেকজণ্ডারের অনুগ্রহ-ভাজন হইবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট বদান্যতার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু কৌশলজ্ঞ আলেকজণ্ডার তাঁহাকে সখ্য সূত্রে আবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে

(৫) Historical Gleanings.

(৬) পরবর্ত্তী অংশ মূলতঃ Sir John Marshall প্রণীত "A Guide to Taxila" অবলম্বনে লিখিত।—লেখক।

(৭) শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত "প্রাচীন রাজমালা।"

তদপেক্ষা অধিক বদান্যতা প্রদর্শন আবশ্যক বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদর্থে তিনি অম্ভির সমস্ত দ্রব্য প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য ভোজনপাত্র, পারস্য-জাত অগণিত পরিচ্ছদ, ত্রিংশৎ সংখ্যক সুসজ্জিত অশ্ব এবং সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন। আলেকজণ্ডারের কর্ম্মাধ্যক্ষবৃন্দ তাঁহার তাদৃশ বদান্যতা দর্শনে বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু এই উপায়ে (পুরুর বিরুদ্ধে অভিযান নিমিত্ত) পঞ্চ সহস্র রণ-নিপুণ যোদ্ধা লব্ধ হইল। অম্ভি রাজার বশ্যতা চির-সৌহৃদ্যে পরিণত হইল, ভারত অভিযানকালে বহু সহায়তা লাভের পথ পরিষ্কৃত হইল। সেকালে তক্ষশিলা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাজ্যরূপে গণ্য ছিল। তাদৃশ পরাক্রান্ত রাজ্যের অধিপতি অতি সহজে গ্রীক বীরের নিকট বশ্যতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে বিস্ময় জন্মিতে পারে; কিন্তু ঈর্ষা এবং

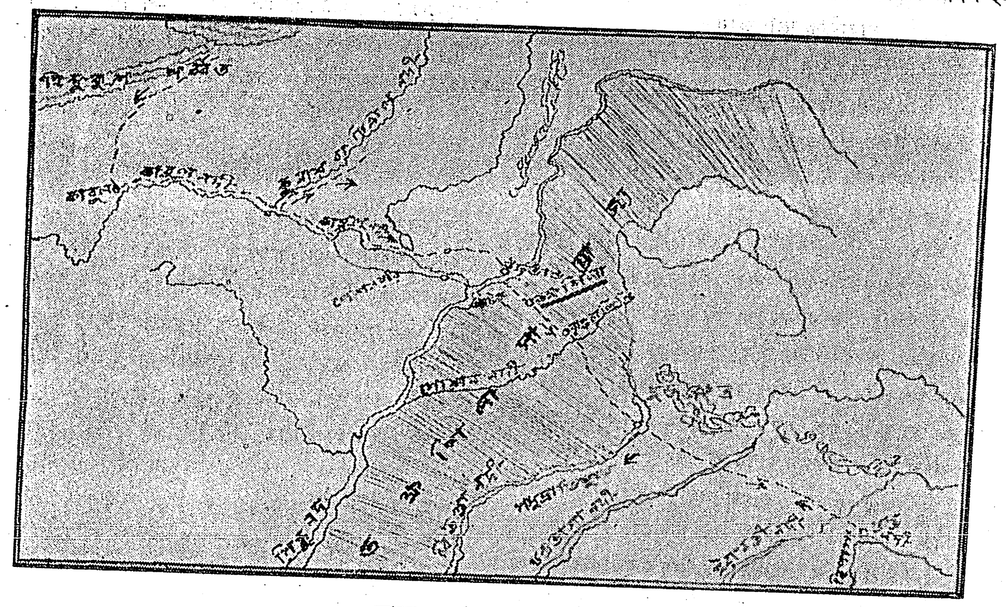

আলেকজণ্ডারের আক্রমণ-পথ

পররাজ্য লালসা তাঁহাকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করিয়াছিল। তিনি প্রখ্যাতনামা বীরের সাহায্যে আপনার শত্রু পুরু রাজা এবং অভিসারাধিপতির বিনাশ সাধন করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন।" (৮)

আলেকজণ্ডার অম্ভির বশ্যতা দেখিয়া আশা করিয়াছিলেন পুরু রাজাও সেইরূপ করিবেন। কিন্তু পুরুর নির্ভীক উত্তর পাইয়া অবশেষে তিনি তক্ষশিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

প্রবল যুদ্ধে পুরু অসাধারণ বীরত্ব এবং রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া অবশেষে পরাজিত হন। কিন্তু তথাপি বীর আলেকজণ্ডার এই পুরুষ-সিংহের তেজস্বিতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুনঃ সিংহাসনে স্থাপন করেন। তৎপরে পুরু এবং অম্ভির মধ্যে যে ঘোর শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল, আলেকজণ্ডার তাহা দূরীভূত করতঃ তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, এবং সে বন্ধুত্ব স্থায়ী এবং সুদৃঢ় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিলেন। (৯) তৎপরে ভারত-সীমা পরিত্যাগের পূর্ব্বে আলেকজণ্ডার অম্ভির রাজ্যের সহিত আরও কতিপয় নূতন স্থান সংযোজন দ্বারা তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন।

আলেকজণ্ডার ভারত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত দেশের কতকাংশ, অর্থাৎ সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশ, বিদ্রোহ আরম্ভ করে। ইহার ফলে তত্রত্য গ্রীক শাসনকর্ত্তা ফিলিপ্পাস নিহত হন। কিন্তু যথা সময়ে আলেকজণ্ডার এই দুঃসংবাদ পাইয়াও উক্ত প্রদেশের জন্য কোন প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে অক্ষম হন। তখন বাধ্য হইয়া তিনি তক্ষশিলার রাজা অম্ভি এবং ফ্রেসীয় সৈন্যের অধিনায়ক ইউডিমসের উপর শাসন-কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। (১০)

আলেকজণ্ডারের সঙ্গী ও সমসাময়িক ব্যক্তিগণের লিখিত বিবরণে তক্ষশিলার তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অবগত হওয়া যায়। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো লিখিতেছেন, তৎকালে তক্ষশিলা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী, জনাকীর্ণ এবং সুশাসিত ছিল। রাজ্যের আয়তন সিন্ধুনদ হইতে বিতস্তা (ঝিলাম) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আলেকজণ্ডারের অন্যতম সঙ্গী এরিষ্টোবুলাস বলিতেছেন, যাহারা দরিদ্রতা নিবন্ধন আপন কন্যাদিগের বিবাহ দিতে সমর্থ হইত না, তাহারা তাহাদিগকে বিক্রয়ার্থ

(৮) প্রাচীন রাজমালা।

(৯) প্রাচীন রাজমালা।

(১০) প্রাচীন রাজমালা।

হাট-বাজারে পাঠাইত। মৃত ব্যক্তির শব-শকুনি গৃধিনীর ভক্ষণার্থ তাহাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করা হইত। বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক স্ত্রী স্বেচ্ছায় তাহাদের মৃত স্বামীর সহগমন করিত। যাহারা সহমরণে অসম্মত হইত, তাহারা সমাজের চোখে অত্যন্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সময় তক্ষশিলায় অনেক দার্শনিক ও সাধু-সন্ন্যাসী ছিলেন। আলেকজণ্ডারের একজন সঙ্গী অনেসক্রিটোস দণ্ডমিস এবং কলানোস নামক এইরূপ দুইজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। (১১)

আলেকজণ্ডারের উত্তর-পশ্চিম-ভারত অধিকার অতি চমকপ্রদ ঘটনা। কিন্তু ইহার ফল মোটেই স্থায়ী হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে স্থায়ী অধিকার স্থাপন আলেকজণ্ডারের সংকল্প ছিল।—এতদুদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বিজয়-লব্ধ স্থানসমূহে গ্রীক উপনিবেশ এবং বহু সৈন্য সামন্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলনে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার পর তদীয় বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার লইয়া বিভিন্ন গ্রীক প্রতিনিধির মধ্যে ঘোর আত্মকলহ উপস্থিত হয়। ইহাতে ভারতে গ্রীক-সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল কম্পিত হইয়া উঠে। গ্রীক নায়কদের এইরূপ আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে খৃঃ পূঃ ৩২১ অব্দে গ্রীক সাম্রাজ্যের ভাগ বন্দোবস্ত হয়। তদনুসারে তক্ষশিলার রাজা অম্ভি স্বরাজ্যের অধিপতি বলিয়া পুনরায় স্বীকৃত হন। এই সময় গ্রীক সেনাপতি সেলিউকাস পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ার আধিপত্য লাভ করেন, এবং উইডমস্ সিন্ধুদের উপত্যকা ভূমির শাসনাধিকার প্রাপ্ত হন।

তাহার কতিপয় বৎসর পরে, খৃঃ পূঃ ৩১৭ অব্দে গ্রীক শাসনকর্ত্তা ইউমেনেস্, এণ্টিওকাসের বিরুদ্ধে ইউমিনেস্‌কে সাহায্য করিবার জন্য তদীয় সমস্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া সিন্ধুনদের উপত্যকা হইতে প্রস্থান করেন। এই সময়, অথবা সম্ভবতঃ ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, মগধের অধিপতি বীরকেশরী চন্দ্রগুপ্ত অতুল শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সিন্ধুনদের পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী সমুদায় গ্রীক সৈন্য বিতাড়িত করতঃ ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তক্ষশিলা এবং পঞ্জাবের অন্যান্য রাজ্য অধিকার করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিলেন।

মৌর্য্য অধিকার।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৩০৫-৩ অব্দে পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ার গ্রীক অধিপতি সেলিউকাস নিকাটর আলেকজণ্ডারের হৃত সাম্রাজ্যের উদ্ধার মানসে বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তক্ষশিলার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু বীর কেশরী চন্দ্রগুপ্ত প্রবল বিক্রমে তাঁহার গতিরোধ করেন। সেলিউকাস পরাজিত হইয়া নিতান্ত অসম্মানজনক সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধি অনুসারে গ্রীক রাজকন্যা চন্দ্রগুপ্তের সহিত পরিণীতা হন; এবং বর্ত্তমান হিরাট, কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি স্থান, অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত সমস্ত মাসিডোনীয় প্রদেশ, তাঁহার অধিকারাধীন হয়। পক্ষান্তরে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য এবং রাজদুহিতার বিনিময়ে সেলিউকাসকে ৫০০ রণ-হস্তী উপঢৌকন প্রদান করেন। এই সময় হইতে মেগাস্থিনিস গ্রীক দূতরূপে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থান করিতে থাকেন।

মেগাস্থিনিসের লিখিত চন্দ্রগুপ্তের শাসন বিবরণীতে ভারত-সীমান্ত হইতে পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক সুপ্রশস্ত রাজপথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত রাজপথ তক্ষশিলা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, যমুনা, হস্তিনাপুর, গঙ্গা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ প্রভৃতি বিখ্যাত জনপদ এবং নদনদী অতিক্রম করিয়া মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎপরে ইহা মগধ দেশ অতিক্রম করতঃ তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। উক্ত পথ অতিক্রম করিয়া মেগাস্থিনিস বিশ্রুতনামা পাটলিপুত্র নগরীতে উপনীত হন। (১২) এই রাজপথের ধ্বংস-রেখার উপর দিয়াই প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরে সেরশাহ কর্ত্তৃক আধুনিক গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ নামক সুদীর্ঘ পথ নির্ম্মিত হয়। (১৩)

চন্দ্রগুপ্ত আতশয় কঠোর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই নিমিত্ত বৈদেশিক গ্রীক-অধিকার বিলোপের পর, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেও, তদ্দেশবাসীরা মগধ-রাজ-শক্তির অনুরাগী হয় নাই। তাঁহার সুদৃঢ় শাসনের ফলে পঞ্জাব-বাসীরা মস্তকোত্তোলন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বিন্দুসারের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ২৯৮—২৭৩) তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং উহার দমন জন্য রাজকুমার অশোকবর্দ্ধন রাজনিয়োগ লাভ করেন। অশোক তথায় উপনীত হইয়া সুকৌশলে অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। তিনি তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি পূর্ব্বক সুশাসন এবং সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রজাকুলকে প্রীত করেন। কিন্তু তাঁহার তক্ষশিলা পরিত্যাগের পর আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; এবার জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুষীম বিদ্রোহ দমনার্থ গমন করেন।" (১৪)

মহারাজা অশোক।—মহারাজা বিন্দুসার পরলোকগত হইলে খৃঃ পূঃ ২৭৩ অব্দে যুবরাজ অশোক মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাসনকার্য্যের সুবিধার্থ মহারাজা অশোক তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে তক্ষশিলা গান্ধার প্রদেশের রাজধানী ছিল। সম্রাট অশোক তদীয় সুশাসন প্রণালী দ্বারা তক্ষশিলা তথা সমগ্র পঞ্জাবে শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিম্বদন্তী এই,—অশোকের রাজত্বকালে তৎপুত্র কুণাল বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার ষড়যন্ত্রে তক্ষশিলায় প্রেরিত হইবার পর তদীয় চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন-সঙ এই ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া আরও একটী কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:- পুত্র কুণালের এইরূপে

(১১) Mc' Crindle—Ancient India as described in Classical Literature.

(১২) প্রাচীন রাজমালা।

(১৩) Vincent Smith.

(১৪) প্রাচীন রাজমালা।

অন্ধ হইবার পর অশোক বহুসংখ্যক তক্ষশিলা-বাসীকে নির্ব্বাসিত করেন; উহারা চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত খোটান নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

অশোকের মৃত্যু :—মৌর্য্য সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা,—তক্ষশিলার স্বাধীনতা ঘোষণা।—খৃঃ পূঃ ২৩১ অব্দে ভারতগৌরব রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোক মৃত্যু-মুখে পতিত হন। ইহার অত্যল্প কাল পরেই বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করে। এই সময় তক্ষশিলা এবং তৎসন্নিহিত অন্যান্য রাজ্য-সমূহ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক অধিকার।

ঈদৃশ অরাজকতা দর্শনে পার্শ্ববর্ত্তী ব্যাক্‌ট্রিয়া রাজ্যের (১৫) গ্রীকগণ ভারতের দিকে লোলুপ দৃষ্টি করিতে থাকে। অনুমান খৃঃ পূঃ ১৯০ অব্দে ব্যাক্‌ট্রিয়ার চতুর্থ রাজা ডেমিট্রিয়াস সর্ব্ব প্রথম তক্ষশিলায় আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি কাবুল উপত্যকা, পশ্চিম পঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশে সৈন্যচালনা করিয়া উক্ত দেশসমূহ নিজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লন। ডেমিট্রিয়াসের পর তৎপুত্র প্যাণ্টালিয়ন এবং এগাথোক্লেশ যথাক্রমে তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। (১৬) তৎপরে খৃঃ পূঃ ১৭৫-১৭০ অব্দে ইউক্রেটাইডেশ নামক আর একজন গ্রীক বীর প্রথমতঃ ডেমিট্রিয়াসের ব্যাক্‌ট্রিয়া রাজ্য, এবং পরে তক্ষশিলাসহ তদীয় ভারত-অধিকারের কতকাংশ নিজ করতলগত করেন।

উক্ত দুই নরপতি হইতে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ইঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পরের রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে থাকেন। তৎপর খৃঃ পূঃ ১৬০-১৫৬ অব্দে (?) গ্রীক বীর মেনান্দর, এবং খৃঃ পূঃ ১৫৬-১৪০ অব্দে (?) এপলোটোডাস তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। ইঁহারা উভয়েই ডেমিট্রিয়াসের বংশধর। মতান্তরে, এপলোটোডাস ইউক্রেটাইডেশের পুত্র ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতাকে জনসাধারণের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করতঃ তাঁহার হত্যাসাধন পূর্ব্বক পিতৃরক্তে রঞ্জিত পদে সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১৭) মেনান্দর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। খৃঃ পূঃ ১৪৫-১৪০ অব্দে (?) এণ্টিয়ালকিডাস নামক একজন গ্রীক বীর তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। ইনি ইউক্রেটাইডেশের বংশসম্ভূত। এণ্টিয়ালকিডাস তক্ষশিলা হইতে হেলিওডোরাস নামক একজন গ্রীককে রাজদূতরূপে মধ্য ভারতস্থ বিদিশা বা বেশ নগরের অধিপতির নিকট প্রেরণ করেন। হেলিওডোরাস বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। গোয়ালিয়র রাজ্যান্তর্গত ভিলসা নগরের অদূরস্থিত উক্ত বেশ নগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

সুবিশাল পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আরও অনেক গ্রীক অধিপতি রাজত্ব করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের জ্ঞান অতীব সঙ্কীর্ণ। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ নৃপতি তক্ষশিলায় শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সহিত উল্লিখিত দুইটি রাজবংশের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, অথবা আদৌ ছিল কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না।

ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীকগণ অনধিক এক শত বৎসর তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ অথবা প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীক অধিকারের লোপ হইয়াছিল।

পার্থিয় এবং শিথীয় বা শক অধিকার। (১৮)

অনুমান খৃঃ পূঃ ১৩৮ অব্দে পার্থিয়া রাজ্যের গ্রীক অধিপতি মিথ্রিডেট্‌স্ বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া ভারতসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক তক্ষশিলা রাজ্য অধিকার করিয়া তদীয় রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার এই অধিকার মোটেই স্থায়ী হইতে পারে নাই। (১৯) ইহার অনেক বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর প্রথমভাগে পার্থিয় এবং সিথীয় বা শকগণের সম্মিলিত আক্রমণ হয়; তজ্জন্য ভারতবর্ষ হইতে গ্রীকরাজত্বের মূলোচ্ছেদ ঘটে।

শক নামধারী অসভ্য তুরেণীয়গণ তাহাদের বাসস্থান মধ্য এসিয়া (শকদ্বীপ) হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রথমতঃ ব্যাক্‌ট্রিয়া রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক গ্রীকদিগকে বহিস্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু অল্প দিন পরেই তাহারা তাহাদের জ্ঞাতিশত্রু ইউচিগণ কর্ত্তৃক নবলব্ধ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া (২০) নিকটবর্ত্তী পার্থিয়ার উপরাজ্য সিস্তানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক দীর্ঘ কাল তথায় বসবাস করে, এবং পার্থিয়দের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে মেলামেশা ও বিবাহাদি করিতে থাকে। তৎপর সিস্তান হইতে তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী আরাকোসিয়া বা কান্দাহার রাজ্য এবং অন্যান্য জনপদ সমূহ আক্রমণ করে। ইহাদের একদল ভনোনেস নামক জনৈক পার্থিয়ের অধিনায়কত্বে কান্দাহারেই আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক বসবাস করিতে থাকে; আর একদল মৌয়েস নামক একজন শক বীরের নেতৃত্বে ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইয়া সিন্ধুনদ অতিক্রম করতঃ তক্ষশিলা রাজ্য অধিকার করে। মৌয়েস সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৯৫ অব্দে কান্দাহারে প্রবল হইয়া উঠেন, এবং ইহার ১০ কি ১৫ বৎসর পরে তক্ষশিলায় উপস্থিত হন। মৌয়েসের পর খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দে অথবা তাহার সমসময়ে এজেস তক্ষশিলার অধিপতি হন। এজেস ভনোনেসের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে পার্থিয় এবং

(১৫) সেলিউকাস প্রতিষ্ঠিত বিশাল রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য উদ্ভূত হয়, তন্মধ্যে দুইটির সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ছিল; একটির নাম ব্যাক্‌ট্রিয়া, অপরটির নাম পার্থিয়া।—লেখক।

(১৬) Vincent Smith.

(১৭) প্রাচীন রাজমালা।

(১৮) মধ্য এসিয়ার বিবিধ শ্রেণীর তুরেণীয়গণ পুরাকালে ভারতবর্ষে একমাত্র শক নামে পরিচিত ছিল। তাহাদের বাসস্থান শকদ্বীপ নামে কথিত হইত। পারস্যের ইতিহাসেও তাহাদিগকে একমাত্র সিথীয় নামে অভিহিত করা হইয়াছে।—লেখক।

(১৯) Vincent Smith.

(২০) প্রাচীন রাজমালা।

শক—উভয় জাতীয়রূপেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এজেসের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না; তবে তাঁহার রাজত্ব যে সুদীর্ঘ এবং উন্নতি-শীল ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ তিনিই যমুনার তীর পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতে শকরাজ্য বিস্তৃত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজ-শাসন ব্যাপারে তিনি সত্রপ (ক্ষত্রপ—প্রতিনিধি) কর্ত্তৃক শাসন প্রথা (ইহা প্রাচীন পারসীক প্রণালী) অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই প্রথা বহুকাল পঞ্জাবে প্রচলিত ছিল। এজেসের পরবর্ত্তী এজিলাইসেস (অঃ ১৫ খৃঃ পূঃ) এবং ২য় এজেসও (অঃ ৫ খৃঃ পূঃ) এই প্রথার অনুসরণ করেন। ইঁহাদের প্রতিনিধি, শকবংশীয় সত্রপ উপাধিধারী নিয়াক-কুসুলক (১৭ খৃঃ পূঃ), পাতিক (১০ খৃঃ পূঃ—১০ খৃঃ) এবং জিহুম (১০ খৃঃ) তক্ষশিলায়, ও রাজুভুল এবং সুদাস মথুরায় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

২য় এজেসের মৃত্যুর পর খৃঃ ২০-৩০ অব্দে তক্ষশিলা এবং কান্দাহার এই দুই রাজ্য পার্থিয় অধিপতি গণ্ডোফারনেস কর্ত্তৃক এক-শাসনভুক্ত করা হয়। গণ্ডোফারনেস অতি প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তাঁহার যশোরাশি পাশ্চাত্য জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেণ্ট টমাস নামক প্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক তদীয় রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি—গণ্ডোফারনেসকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। (২১)

তক্ষশিলা এবং কান্দাহার রাজ্যদ্বয় এক-শাসনভুক্ত করিবার পর গণ্ডোফারনেস কাবুলাধিপতি শেষ গ্রীক রাজা হারমিয়াসকে বিতাড়িত করিয়া উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার এই সম্মিলিত রাজ্য মোটেই স্থায়ী হইতে পারে নাই; কারণ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন প্রদেশের সত্রপগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে গণ্ডোফারনেসের বিশাল রাজ্য বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এব্‌ডাগেস পশ্চিম পঞ্জাব, অর্থাগ্‌নেস এবং তৎপর পাকোরেস্ কান্দাহার ও সিন্ধুদেশ লাভ করেন; এবং রাজ্যের অন্যান্য অংশ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতির হস্তগত হয়। ইঁহাদের মধ্যে সাসান, সাপাডেনেস এবং শতবস্ত্রের নামাঙ্কিত মুদ্রা তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পার্থিয় রাজত্বের কালে, সম্ভবতঃ ৪৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের অন্তর্গত টিয়ান নগরের অধিবাসী, পিথাগোরাস সম্প্রদায়ের দর্শনবিদ্ এপলোনিয়াস তক্ষশিলা পরিদর্শন করেন। তদীয় জীবনী-লেখক ফিলোষ্ট্রেটাস লিখিয়াছেন, এই সময় ফ্রাটোস নামক জনৈক পরাক্রমশালী অধিপতি তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি সমগ্র গান্ধার প্রদেশের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এপলোনিয়াস উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া তক্ষশিলায় প্রবেশ করিয়া নগর-প্রাচীরের সম্মুখস্থ একটি মন্দিরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তিনি ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। খুব সম্ভব এই মন্দিরই বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত জণ্ডিয়ালের মন্দির। তাঁহার মতে তখন তক্ষশিলা নগরী আয়তনে নাইনেভ নগরের সমান, এবং গ্রীসের সহরগুলির ন্যায় সুশৃঙ্খলভাবে সুরক্ষিত ছিল। রাস্তাগুলি এথেন্সের রাস্তার ন্যায় সঙ্কীর্ণ এবং শৃঙ্খলাহীন ছিল; গৃহগুলি বাহির হইতে দেখিতে একতল বলিয়া মনে হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকানিম্নে ভিত্তি-প্রকোষ্ঠ-সমূহ নির্ম্মিত ছিল। নগরের মধ্যে একটি সূর্য্যমন্দির, এবং আড়ম্বরবিহীন, সাদাসিদা একটি রাজপ্রাসাদ ছিল। ফিলোষ্ট্রেটাস-লিখিত বিবরণ স্থানে স্থানে কল্পনাপ্রসূত হইলেও মূলতঃ সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

কুষান অধিকার

গণ্ডোফারনেসের মৃত্যুর পর তদীয় বহুধা-বিভক্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। এই সুযোগে কাবুলের সিংহাসন-চ্যুত অধিপতি হারমিয়াস তাঁহার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় বিশেষ সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি কুষানগণের পর ক্রমশালী নেতা কজুল কদফিসের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক, প্রথমতঃ তাঁহার সাহায্যে কাবুল রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন, এবং পরে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া গান্ধার এবং তক্ষশিলা অধিকার করিতে সমর্থ হন।

উক্ত কুষানগণ চৈনিক ঐতিহাসিকদের নিকট ইউচি নামে পরিচিত। খৃঃ পূঃ ১৭০ অব্দের সমসময়ে ইহারা ইহাদের আদি বাসভূমি সুদূর উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ ব্যাক্‌ট্রিয়া এবং অকসাস্ রাজ্য, তৎপর কাবুল উপত্যকা, এবং পরিশেষে উত্তর-ভারত অধিকার করে। কজুল কদফিস এবং হারমিয়াস সম্ভবতঃ ৫০ বা ৬০ খৃষ্টাব্দে পার্থিয়দের নিকট হইতে কাবুল ও তক্ষশিলা জয় করেন। অনুমান ৭৮ খৃষ্টাব্দে কজুল কদফিস মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তৎপুত্র বিম কদফিস সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিম কদফিস তাহার রাজ্য সমধিক বিস্তৃত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি দৃষ্টে Sir John Marshall এবং তাঁহার অনুসরণ করিয়া অধুনা Vincent Smithও, বিম কদফিসকেই শকাব্দের প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিম কদফিসের পর সম্ভবতঃ ১০০-১১০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে "সোটের মেগস" (Soter Megas—মহান ত্রাণকর্ত্তা) রূপে পরিচিত জনৈক নামবিহীন রাজা তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। (তক্ষশিলায় "সোটের মেগস"-অঙ্কিত কতিপয় রাজমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।) "সোটের মেগসে"র পর খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১২০—১২৫ অব্দ-মধ্যে) প্রসিদ্ধনামা মহারাজ কনিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনিষ্ক পুরুষপুরে অর্থাৎ আধুনিক পেশওয়ারে তাঁহার শীতকালীন রাজধানী স্থাপন করেন। মহারাজ কনিষ্ক ভারতবর্ষের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট; তিনি মধ্য এসিয়া হইতে বঙ্গদেশের সীমানা পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত দেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কনিষ্ক সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরাধিক কাল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। তৎপরে ক্রমে তদীয় পুত্র হুবিষ্ক এবং বাসুদেব রাজত্ব করেন। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাসুদেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই কুষান রাজ্যের অবনতি হইতে থাকে। (তক্ষশিলায় অনেক সাসানীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয়, কুষান রাজ্যের অবনতির সময় পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশে পারস্য দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত সাসানীয় রাজবংশের আক্রমণ হয়, এবং তজ্জন্য কুষান রাজ্য দ্রুতগতিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে।) এই অবস্থায় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে হুন জাতির আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুধু পঞ্জাব প্রদেশে কুষান রাজত্ব বিদ্যমান থাকে।

খৃঃ ৪০০ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তক্ষশিলায় উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন সৌধাবলী পরিদর্শন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তৎসমুদায়ের কোন বিবরণ রাখিয়া যান নাই। তবে তাঁহার লিখিত ভারতের অন্যান্য স্থানের বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তদীয় পর্য্যটনকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতস্থ বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ অতিশয় সৌষ্ঠবশালী ছিল।

অতঃপর খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগে অসভ্য শ্বেত হুনগণ অসি ও অগ্নি হস্তে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত সংখ্যায় দলে দলে ভারতবর্ষে আগমন করতঃ গান্ধার হইতে কুষান রাজত্বের মূলোচ্ছেদ করে, এবং তৎপরে তক্ষশিলায় প্রবেশ পূর্ব্বক নির্ব্বিচারে ও নির্ম্মমভাবে বিবিধ সৌধসমূহের ধ্বংস সাধন করিয়া আপনাদের বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

এই আকস্মিক বিপদ্‌পাত হইতে আর তক্ষশিলার উত্থান হয় নাই। তার পর ৬৩০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, ও পরে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সঙ তক্ষশিলা পরিদর্শন করেন, তখন তিনি দেখিতে পান, তক্ষশিলা কাশ্মীর রাজ্যের অধীন একটি ক্ষুদ্র জনপদ মাত্র; স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃগণ পরস্পর কলহে মগ্ন, এবং অধিকাংশ বিহারই জনহীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। (ক্রমশঃ)

(২১) প্রাচীন রাজমালা।

কথা ঃ—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানাদেবী

মিশ্র সাহানা—দাদ্‌রা

হরিহে তুমি আমার সকল হবে কবে ?
(আমার) মনের মাঝে ভবের কাজে
মালিক হয়ে রবে (কবে ?)
(আমার) সকল সুখে সকল দুখে
তোমার চরণ ধরব বুকে
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই কবে।
কিনব যাহা ভবের হাটে
আনব তোমার চরণ বাটে
তোমার কাছে হে মহাজন
সবই বাঁধা রবে (কবে ?)
স্বার্থ প্রাচীর করে' খাড়া
গড়ব যখন আপন কারা
বজ্র হয়ে তুমি তারে
ভাঙ্‌বে ভীষণ রবে !
পায়ে যখন ঠেল্‌বে সবাই
তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই
জগতের সকল আপন
হ'তে আপন হবে (কবে ?)
(শেষে) ফিরব যখন সন্ধ্যা বেলা
সাঙ্গ করে' ভবের খেলা
জননী হ'য়ে তখন
কোল বাড়ায়ে লবে !

II { জ্ঞা | রা সা রা | না সা রা | রা রা -া |
হ রি হে - তু মি আ মা র
+ ০ + ০ ॥ +
সা রা -া | পা মপা ধপা | মপা মজ্ঞা মজ্ঞা | মজ্ঞা (মজ্ঞা মজ্ঞা | মা -া) }
স ক ল হ বে - ক বে - - - - - -
+ ০ + ০
মা মা | মপা পা -া | পা পা -া | পা পা ধা | পা পা ধপা |
আ মার ম নে র মা ঝে - ভ বে র কা জে -
+ ০ + ০ +
মপা মগা -া | -া গা গা | গা মা -া | মপা মরা মা | জ্ঞা -া II
মা লি ক - হ' য়ে র বে - ক বে - - -
+ ০ + ০
মা মা | { মা পা -া | না না -া | না র্সা -া | র্সনা র্রর্সা নর্সা |
আ মার স ক ল সু খে - স ক ল দু খে -
আ মি স্বা - র্থ প্রা চী র ক' রে - খা ড়া -
আ মি ফি র ব য খ ন স - ন্ধে বে লা -
+ ০ + ০
ণধা ণা -া | ধা ণা -া | ধা র্সা র্সণা | ধা পা ধা | }
তো মা র চ র ণ ধ র ব বু কে -
গ ড় ব য খ ন আ প ন কা রা -
সা - ঙ্গ ক' রে - ভ বে র খে লা -
+ ০ + ০
{ পমা পা পা | পা পা -া | পণা ণা -া | ধা পা ধপা |
ক - ণ্ঠ আ মা র স ক ল ক থা য়
ব - জ্র হ' য়ে - তু মি - ত খ ন
- জ ন নী - হ' য়ে - ত খ ন
+ ০ + ০
মা মা -া | পা মপা ধপা | মপা মজ্ঞা -া | (মা মা) }
তো মা র ক থা ই ক বে - ও গো
ভা ঙ্‌ বে ভী ষ ণ র বে - ও গো
কো ল বা ড়া য়ে - ল বে - ও গো
০ +
মজ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা | মা -া II
- - - - -
০ - - - -
- - - - -
+ ০ + ০
II { সা -া সা | সা সা রা | না সা রা | রা রা -া |
প্র ভু কি ন ব যা হা - ভ বে র হা টে -
ও গো পা য়ে - য খ ন ঠে ল্‌ বে স বা ই

+	০	+	০
রগা রগমা মা	মা মা গা	রা রগরা মগা	গরা সন্া সা
আ ন্ ব	তো মা র	চ র ণ	বা টে -
তো মা র	পা য়ে -	পা ই ব	ঠা - ই
+	০	+	০
সা সা -া	সা সা রা	ণ্সা ণ্সরা সা	ণ্ধ্া ণ্ধ্া প্া
তো মা র	কা ছে -	হে - ম	হা জ ন
- - জ	গ তে র	স ক ল	আ প ন
+	০	+	০ +
« সা রা পা	পা মপা ধপা	মপা মজ্ঞা মজ্ঞা	রা সা -া | -া -া II
স র ই	বাঁ ধা -	র বে -	ক বে - - -
হ' তে -	আ প ন	হ বে -	ক বে - - -

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৩২

পরদিন বৈকালে কিরণ মোটরে করিয়া লীলাকে তুলিয়া লইতে আসিল। লীলা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া ছিল,—কিরণের আগমন সংবাদ পাইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল ড্রয়িং-রুমে—বীণা ও কুমার গুণেন্দ্রভূষণ!

কুমার লীলাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসিলেন। সহাস্যে নমস্কার করিয়া তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—'আজ আপনাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। খানিকটা বেড়িয়ে এলে শরীর আরো সুস্থ বলে মনে হবে!'

লীলা কোন উত্তর না দিয়া একটু হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিল। আজ দিনের আলোয় কুমারের প্রতি সে একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত চাহিয়া দেখিল—তাঁহার আকৃতি যথার্থই মনোরম—আচরণ ব্যবহার অত্যন্ত নম্র ও ভদ্রতাপূর্ণ—কিন্তু তাঁহার চক্ষের দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল—লীলা সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

গাড়ি ক্রমশঃ সহরের সীমা ছাড়াইয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও আমবাগানের মধ্য দিয়া চলিল। বহু দিন পরে মুক্ত বাতাসে ও প্রকৃতির নয়নাভিরাম মুগ্ধকর হরিৎ দৃশ্যে লীলার দেহ মন যেন জুড়াইয়া গেল। সে উৎফুল্ল নেত্রে কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি সুন্দর সব মনে হচ্ছে আজ!

কিরণ তাহার প্রীতিফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তাহলে রোজ এমনি সময় আমরা এদিকে বেড়াতে আসবো, কেমন? সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে যাবো, যাতে তোমার ঠাণ্ডা না লাগে। তাহলে আর কেউ বারণ করবেন না।

তাই আসা যাবে! আঃ! এত ভাল লাগছে! মনে হচ্ছে, যেন এমন ফাঁকা হাওয়ায় জীবনে আর কোন দিন বেরোই নি! বলিয়া লীলা একটু থামিয়া বলিল—কিরণ! কুমারকে তুমি ভাল রকম চেন কি? ওঁকে তোমার কি রকম লোক বলে মনে হয়?

কিরণ একটু ভাবিয়া বলিল—আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ নেই—সামান্য পরিচয় আছে মাত্র। অবশ্য ভদ্রলোকের সম্বন্ধে না জেনে-শুনে কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে আমার কি জানি কেন ওঁকে বড় একটা ভাল লাগে না—মনে হয়, যেন সর্ব্বদাই লোকটা একটা মুখোস পরে বেড়াচ্ছে!

লীলা বলিল—তুমি ঠিক ধরেছ কিরণ! কুমার লোক

মাটেই ভাল নয়! আমি অসুখ থেকে উঠবার পরে দেখছি—বীণা তার সঙ্গে অতিরিক্ত মাত্রায় মিশছে! মাও তাকে খুব প্রশ্রয় দিচ্ছেন! বীণার জন্য আমার এত ভাবনা হচ্ছে!

লীলা কিরণকে জোছনার কথা ও ক্ষান্তর মুখে কুমার সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছিল, সমস্তই একে একে বলিয়া গেল।

তাহার পর বলিল, এখন সে মেয়েটার কি দশা হবে বলো? ও যে রকম লোক, তাতে আর দুদশ দিন পরে হয় ত তাকে রাস্তায় তাড়িয়ে দেবে। তখন তার কি গতি হবে? আমি ত এ কথা শুনে পর্য্যন্ত তার জন্য ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছি! বীণার সঙ্গে কুমারের দেখা-শুনো বন্ধ করে দিলেই চলবে, কিন্তু জোছনার কি করবো?

কিরণ সমস্ত শুনিয়া বহুক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—এ সব অত্যন্ত কুৎসিত বিষয় লিলি! এর মধ্যে তোমার নিজের গিয়ে কাজ নেই। এ সব ব্যাপার সংসারে অহরহ ঘটছে। তুমি এ সব কিছু জান না—নতুন একটা আজ শুনেছ—তাই মনে এত লাগছে। ও নিয়ে বৃথা ভেবে কি হবে?

লীলা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—এটা কিন্তু তোমার উপযুক্ত কথা হলো না কিরণ! তুমি এ কথা বলবে—আমি তা আশা করি নি। একটা নিতান্ত অল্প বয়সের মেয়ে,—যে সংসারের ভাল মন্দ কিছুই বোঝে না—তাকে একটা পাষণ্ড জোর করে টেনে এনে রাস্তায় দাঁড় করালে—তার সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে; এক—আত্মহত্যা করে মরা; আর এক আরও অবনতির পথে নেমে যাওয়া। আমি নিজে নারী হয়ে নারীর এই চরম দুর্গতি দাঁড়িয়ে দেখবো, অথচ তার জন্য কোন কিছুই করতে পারবো না—এ আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। আজ সকালে বাবার কাছে এ কথা পেড়ে মেয়েটার বিষয় কি করা যায়, জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও ঠিক তোমার মতই বিরক্ত হয়ে বল্লেন—এ সব লজ্জাকর বিষয় নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি? একটা মানসম্ভ্রম নেই? সত্যি—তোমাদের কাণ্ড দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি!

কিরণ লীলার অভিমানপূর্ণ কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া গেল! সে সঙ্কোচের সহিত বলিল—তুমি কিছু মনে করো না লিলি! এই সব ইতর কাজের মধ্যে তোমার কোথাও কোন সংস্রব আছে, এ চিন্তা পর্য্যন্ত আমায় বড় আঘাত করে। সেই জন্য তোমাকে বারণ করেছিলুম। আর তা ছাড়া, তুমি তার জন্য কিই বা করতে পারো? তার আত্মীয়স্বজন, এমন কি তার মা বাপ পর্য্যন্ত, এ ঘটনার পর আর তাকে ঘরে স্থান দেবে না। তুমি নিজে তাকে এনে তোমার ঘরে রাখতে পারবে না; কারণ, তাহলে তোমাদের সমাজেও অত্যন্ত কুৎসিত চর্চ্চা আরম্ভ হবে,—তোমাদের সঙ্গে কেউ তাদের মেয়েদের মিশতে দেবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছো, সাধ করে একটা অনর্থ ঘটাবার জন্য তোমার মা, কিম্বা আর কেউ তাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হবেন না। তার পর আমাদের দেশে এ রকম মেয়েদের জন্য, এখনো সে রকম কোন আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি, যেখানে এই সব লাঞ্ছিতা নারীরা আশ্রয় পাবে। তা-হলে বল, তুমি তার জন্য আর কি করতে পারো?

লীলা অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া নিরাশ ভাবে বলিল, তবে কি তার কোন উপায়ই হবে না কিরণ? এই ভাবে মেয়েটা তবে কি একেবারেই অকূলে ভেসে যাবে?

কিরণ বলিল—কেবল একটি মাত্র উপায় আছে। এখানে খ্রীষ্টান মিশনরিদের মেয়েদের জন্য যে মিশন আছে, যদি তাকে সেইখানে দিয়ে আসতে পারো, তা হলে তাদের কাছে সে আশ্রয় পাবে। সেখানে তারা তাকে ভাল ভাবে রাখবে, লেখাপড়া বা অন্য যে-কোন রকম শিল্প কাজ, যা সে শিখতে চায়, তাই তাকে শিখিয়ে তাকে স্বাবলম্বী করে দেবে। যতদিন সে নিজের খরচ নিজে উপার্জ্জন করে চালাতে না পারে, ততদিন তার সমস্ত ভার মিশনের উপর থাকবে। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আমি ত আর কিছু দেখতে পাই না। তোমার সঙ্গে ত সেখানকার বড় মেমের আলাপ আছে?

লীলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল—তা যেন আছে। কিন্তু এটা কি রকম কথা হলো? আমাদের নিজেদের সমাজে, আমাদের ঘরের মেয়েরা অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে পথে পথে ফিরবে, মানসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে পেটের দায়ে হীন ব্যবসা করতে বাধ্য হবে, আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো, অথচ তাদের মুখে এক মুঠো অন্ন বা একটু আশ্রয় দিতে চেষ্টা করবো

না, আর সেই ব্যবস্থা করবে কি না—একদল বিদেশী বিধর্ম্মী সম্প্রদায়—যাদের সঙ্গে তাদের কোন দিক থেকে কোন সম্বন্ধ, কোন যোগাযোগ নেই? কি চমৎকার ব্যবস্থা! আমি কোন্ মুখে সেখানে গিয়ে মিস নেল্‌সনকে এ কথা বোলবো?

কিরণ গম্ভীর মুখে বলিল—এটা আমাদের পক্ষে বাস্তবিক বিষম লজ্জার কথা লীলা! কিন্তু যা সত্য কথা—তা তো বলতে হবে? শুধু এই একটা কেন—এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। আমাদের দেশের—যাদের আমরা ইতর বলে, অস্পৃশ্য বলে ঠেলে সরিয়ে রেখেছি, দুর্জ্জয় গলিত ব্যাধিগ্রস্ত বলে যাদের কাছে এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দি, ওরা সেই সব অশিক্ষিত বর্ব্বর জাতকে সুশিক্ষিত করে উন্নত করে তোলবার জন্য কি পরিশ্রম, কি চেষ্টাই যে করছে, সেই সব সংক্রামক রোগগ্রস্তদের জন্য আশ্রম স্থাপন করে, তাদের সুস্থ করবার জন্য, একটু আরামে রাখবার জন্য কি যে জীবনব্যাপী চেষ্টা ও যত্ন করছে, সে কথা বলবার নয়। কিন্তু যাক এ কথা। তোমায় আমি বলছি—যদি সত্যই সে মেয়েটিকে একটা ভাল জায়গায় রাখতে চাও, তবে তাকে মিস নেল্‌সনের কাছে দিয়ে এসো।

লীলা বলিল—তাই যাব। যখন এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই, তখন যেতেই হবে। বেলা পড়ে এলো—এস আজকের মত বাড়ী ফেরা যাক্।

ফিরিবার মুখে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া কিরণ বলিল—অরুণ তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে লিলি! আর তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে রাখতে পারছি না। এর মধ্যে যাবে এক দিন তার কাছে?

লীলা বলিল—আমি আর দু এক দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি তাকে বোলো। আর এবার গিয়ে তাকে সব কথা খুলে বোলবো স্থির করেছি। তার পর সব শুনে সে যা বলবে—

লীলা কথাটা শেষ না করিয়া মুখ নত করিল। কিরণ ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—আমার আর কিছুই বলবার নেই লীলা। তোমার অসুখের এই দুমাস নিয়ত তার কাছে থেকে থেকে আমি বুঝেছি—সে তোমায় কি আত্মহারা হয়ে ভালবেসেছে। তোমায় হারালে সে বুঝি আর প্রাণে বাঁচবে না! সে আমার বড় প্রিয়, বড় আদরের বন্ধু। তার উপর এখন সে অসহায় অন্ধ। আমি বরং দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ দেব, তবু তোমায় তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবো না। তবে যদি সে নিজে—যাক্‌গে—সে কথা ভেবেই বা আর কি হবে। আমি ত সে দিন আমার সব কথাই তোমাকে বলেছি। আমার জীবন সম্পূর্ণ ভাবে তোমার। তোমাকে পাই, না পাই, এর পরিবর্ত্তন কোন দিনই হবে না।

দুই দিন পরে রাত্রি এগারটার সময় লীলার শয়নকক্ষে লীলা ও বীণা কথা বলিতেছিল। বাড়ীর সকলেই তখন নিদ্রিত, কেবল ক্ষান্ত সেদিন তখনো শুইতে আসে নাই।

বীণা বলিতেছিল—কথাটা তোমার কাছে না বলে থাকতে পারছিলুম না লিলি! আমি যে মনের মধ্যে সব সময় কি একটা আনন্দ, কি তৃপ্তি বোধ করছি, সে তোমায় বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে পারবো না ভাই! তাঁকে ভালবেসে মন আমার শান্তিতে আনন্দে ভরে গেছে! যখন তিনি কাছে না থাকেন, ততক্ষণ আমি আর কোন বিষয় ভাবতে, কোন কাজে মন দিতে পারি না। কেবল তাঁর কথাই থেকে থেকে মনে পড়ে—আর অধীর হয়ে উঠি। কিন্তু যখন তিনি আসেন, আমার যেন তখন সব কথা হারিয়ে যায়,—তাঁর মধ্যে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। তিনি কথা বলেন—আমি শুধু অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কেবল শুনি, আর মনে হয়, তাঁর কথা যেন শেষ না হয়। এ যে কি তীব্র সুখ—সে আমি তোমায় কি করে বোঝাবো? তুমি সুখী হয়েছ লিলি?

লীলা উত্তর দিতে পারিল না। বীণার প্রেমে পুলকে ঝলমল মুখখানির দিকে একবার ব্যথিত ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া চক্ষু নত করিল।

বীণা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের মনেই বলিতে লাগিল—কুমারকে দেখবার আগে আমি কোন দিন কারুকে ভালবাসি নি ভাই! চিরকাল সকলকে নিয়ে কেবল খেলা করে, আমোদ করে বেড়িয়েছি। তুমি ত সবই জান, আমি চঞ্চল স্বভাবের বলে তুমি কতদিন আমাকে কত কথা বলেছ, কত বুঝিয়েছ। তখন শুধু পুরুষদের ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই আমার প্রধান আমোদ ছিল। আমি নিজে কোন দিন কারুকে ভালবাসি নি। এখন সে

সব কথা মনে হলে লজ্জা হয়। একটা বড় জিনিস মনের মধ্যে পেয়ে, আমার আগেকার সব চাঞ্চল্য, সব ক্ষুদ্রতা কেটে গেছে ভাই! আমি যেন মনে প্রাণে নতুন মানুষ হয়ে গেছি। তাই আমি ভাবতুম, কত দিনে তুমি ভাল হয়ে উঠবে—কত দিনে তোমায় এ সব কথা খুলে বলতে পাব। মা বলেছেন—শীঘ্রই আমাদের এন্‌গেজ্‌মেণ্ট হয়ে যাবে। তুমি খুসী হয়েছ লিলি?

লীলা এবার বলিল, আমি যদি খুসী হতে পারতুম,—অন্তর্যামী জানেন, তার চেয়ে সুখের বিষয় আমার কাছে আর কিছু থাকতো না দিদি!

বীণার মুখ শুকাইয়া গেল। সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—কেন লিলি—ও কথা বল্লে কেন ভাই? কি হয়েছে?

লীলা বলিল—আমার বলবার অনেক কথা আছে দিদি! কিন্তু কি করে যে বোলবো, আমি সারাক্ষণ সেই কথাই ভাবছি। আমি তোমাকে বড় ব্যথা দিতেই এসেছি ভাই!

বীণা সভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া তাহার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

লীলা ম্লান মুখে আবার বলিল—কিন্তু সে কথা যে বলতেই হবে—দিদি! তুমি বড় প্রতারিত হয়েছ—কুমার মোটেই ভাল লোক নয়! সে চরিত্রহীন, লম্পট, মাতাল। সে তোমার সঙ্গে মেশবার উপযুক্ত নয়—

বীণা ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ও কথা বোল না লিলি! কুমার—ওঃ! অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুমি তাঁকে জানো না—তাই ও-কথা বলতে পারলে! কে এ সব তাঁর নামে মিছে করে রটালে?

মিছে নয় ভাই! সব সত্য! তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেয়ে কি আমি তোমার কাছে এ কথা বলতে পারি? আমি খুব ভাল করেই সন্ধান নিয়েছি। ওর স্ত্রী ওর অত্যাচারের জ্বালায় বিষ খেয়ে মরেছে—

বীণা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ওর স্ত্রী? কুমার কি তবে বিবাহিত?

লীলা বলিল—শুধু বিবাহিত নয়—ওর যে এ-রকম আরও কত কীর্ত্তি আছে—তা বলা যায় না। এবার থেকে আর তুমি ওর সঙ্গে দেখা কর না। যদি আসে, তা হলে যা বলবার—তা আমিই বলে দেবো। কোন ভদ্রসমাজেও লোকটা মেশবার উপযুক্ত নয়। ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত—

বীণা উন্মাদিনীর মত আকুল হইয়া বলিয়া উঠিল—না! লিলি! না—এমন করে তাঁকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না—আমি মরে যাব তা হলে! সত্যই মরে যাব! আমি নিজে তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করবো! আমি যে এ সব কথা বিশ্বাস করতে পারছি না! এ কি কখনো হতে পারে? আমি দুমাস ধরে নিয়ত তাঁকে দেখছি যে! লিলি! নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে কিছু,—তিনি কখন এমন হতে পারেন না!

লীলা গম্ভীর মুখে বলিল—ভুল যদি হতো, তা হলে আমি যে কত সুখী হতুম, তা তুমি জান না। আমারও ত তাকে খুব ভালই লেগেছিল। কিন্তু তা ত নয়! এই সম্প্রতি ও একটি ছোট মেয়ের কি সর্ব্বনাশ করেছে—শোন—

লীলা জোছনার কথা একে একে সবিস্তারে বলিয়া গেল। তাহার পর বামা এখানে আসিয়া কি করিয়া তাহাকে চিনিয়া গেল, সব বলিয়া শেষে বলিল—এখনো কি কিছু অবিশ্বাসের কারণ আছে? বামা তার বাড়ীতে থেকে রোজ দেখছে—সে অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত মাতাল হয়ে কাটায়। আর এর চেয়ে কি প্রমাণ চাও? বল ত ক্ষান্তর বোনকে ডেকে তোমার সামনে সব জিজ্ঞাসা করি।

বীণা সমস্ত শুনিয়া সর্পাহতের মত বিবর্ণ মুখে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

লীলা বলিতে লাগিল, আমি যখন প্রথম এ কথা শুনলুম, তখনি জানি যে এ ঘটনায় তোমার কত বড় আঘাত লাগবে। তাই আমি কোন কথা প্রকাশ না করে, ভাল করে তার বিষয় সন্ধান করেছি। তোমায় যে সব কথা বলেছি, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এর পর আর তোমার তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কাল বিকেলে তুমি ড্রয়িংরুমে নেমে যেও না—অন্ততঃ সে আসা পর্য্যন্ত তোমার ঘরেই থেকো। আমি তার জন্য নীচে অপেক্ষা করবো। সে এলে, যা বলবার সব আমিই বলে, এ অপ্রীতিকর বিষয় একবারে শেষ করে ফেলবো। আমি চাই, আর যেন তোমার সঙ্গে তার দেখা না হয়।

বীণা আবার অস্থির হইয়া উঠিল—সে কিছুতেই লীলার এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না। সে বলিল—সে কিছুতেই

হয়ে না লিলি! যদি বলতেই হয় এ কথা, তা হলে আমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। আমারই তাঁকে বলবার একমাত্র অধিকার। তুমি এর মধ্যে কোন কথায় থেকো না। তুমি যে রাগী, হয় ত কি কথায় কি বলে বসবে, আর তিনি কখনো এ-মুখো হবেন না। যদি এ সব কথা সত্যই হয়, তা হলেও আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটবার পর আর যে তিনি এ পথে কখনো যাবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে। আমায় তিনি সত্যই অত্যন্ত ভালবেসেছেন।—তুমি ত জান লিলি! মানুষ ভালবাসলে তার মধ্যে কত বড় বড় পরিবর্ত্তন হয়ে যায়, আর তিনি বদলাবেন না এ কি কখনো হতে পারে?

লীলা বলিল, তিনি তোমার মত আরো অনেককেই ভালবেসেছেন, আরো অনেককে বাসবেন,—তার জন্য কোন চিন্তা কোর না। উপস্থিত তোমার সম্বন্ধে আমি যা বলছি, এইটিই সবচেয়ে ভাল কথা। এতে কোন গোলযোগ হবে না, তোমারও মর্য্যাদার কোন হানি হবে না, কারণ আমার বিশ্বাস আমার মুখ থেকে কোন কথার আভাস পাবামাত্র সে নিজের মানের দায়েও এখান থেকে সরে পড়বে। সে বিদেশী লোক, তার এ রকম চলে যাওয়ায় কেউ কিছু মনেও করবে না। কথাটা চাপা পড়েই যাবে। অবুঝের মত কথা বোলো না। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ, তা হলেই সব বুঝতে পারবে।

বীণা কিন্তু লীলার কোন যুক্তি শুনিল না। ইহার মধ্যে ভাবিয়া দেখিবার কি আছে, তাহাও সে বুঝিল না। সে কেবল অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল—লিলি! তুমি বড় নিষ্ঠুর, তোমার প্রাণে একটু দয়ামায়া নেই। আমি তোমায় সত্যই বলছি, আমি কিছুতেই কুমারকে ছাড়তে পারবো না। তাঁকে ছাড়তে হলে আমি আর বাঁচবো না। তুমি ত কোন দিন কারুকে ভালবাসনি,—তুমি আমার অবস্থা বুঝবে কি করে? সংসারে ভাল মন্দ সব রকম লোকই থাকে,—সকলেই কি একবারে দেবচরিত্র সাধু পুরুষ হয়ে জন্মায়? যদি তাঁর কিছু দোষ থাকে—নিশ্চয় তিনি তা শুধরে নেবেন। আমি কালই তাঁকে এ সব কথা বোলবো।

লীলা বলিল—বেশ! তোমার যা ইচ্ছা, তাই করো। তবে এটা নিশ্চয় জেন যে, আমি তোমার এই সব অযথা খামখেয়ালির প্রশ্রয় দিতে পারবো না। তোমার যদি নিজের সামান্য কিছু বুদ্ধি থাকতো, তা হলে তুমি নিজেই এ বিষয়টা ভাল করেই বুঝতে। তোমার ভালর জন্য তোমাকে সাবধান করে দিলুম,—তার চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তার সমস্ত দোষ তোমার চোখের উপর ধরে দিলুম,—তোমার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে মাতাল, লম্পট, বদ্‌মাস—যা খুসি হোক্, তবু তাকে তোমার চাই-ই। চমৎকার কথা! আজ সে তোমায় নিয়ে দুদিন খেলা করে' শেষে জোছনার মত রাস্তায় তাড়িয়েই দিক্—কিম্বা সখের খেয়ালে আজ বিয়ে করে বাড়ীতে তোমায় ফেলে রেখে নিজে যা খুসি করেই বেড়াক্—কিছুতে তোমার আপত্তি নেই। শুধু তার সঙ্গে বিয়ে হলেই হল। ধন্য তোমরা! আর ধন্য তোমাদের ভালবাসা! আমি কিন্তু কালই বাবার কাছে কুমারের বিষয় সব বোলবো!

বীণা পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিত। লীলার রাগ দেখিয়া ও পিতার নামে সে অত্যন্ত দমিয়া গেল। বলিল···তুমি বড় একটুতেই রেগে যাও লিলি। হঠাৎ বাবার কাছে এ সব কথা বলে একটা হৈ-চৈ বাধান কি ভাল? যাই হোক, কুমার নিজে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক,—তাঁর নামে এ রকম একটা কুৎসা রটান, চারিদিকে তাঁর বদনাম করা কি ভাল হবে? আমাদের নিজেদেরও ত মান-সম্ভ্রম আছে—

লীলা বাধা দিয়া বলিল, তা আর তুমি বুঝছো কই? যাতে আমাদের বা তার সম্বন্ধে কারু মনে কোন কথা না ওঠে, সেইজন্যই ত আমি তোমায় তার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করছি। আজ যদি বাবার কাণে এ কথা ওঠে, আর তিনি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন, তা' হলে সমাজে একটা সোরগোল পড়ে যাবে। তুমি এ দুমাস ধরে তার সঙ্গে যে ভাবে মিশছো, মা তাকে বাড়ীতে ডেকে এনে যে রকম ঘনিষ্ঠতা করছেন, সে কি আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এ ভাবে এত মেশার পর হঠাৎ তাকে তাড়িয়ে দিলে, লোকে তোমার আর তার সম্বন্ধে কি ভাববে,—আর তার পর ঘরে ঘরে তোমার নামের সঙ্গে তার নাম যোগ করে কি রকম চর্চ্চা চলবে, সেটা একবার ভেবে দেখো। তাই যদি তুমি চাও, বেশ—তাই হবে।

বীণা ছোট বয়স হইতেই নিজে একটি সামাজিক জীব,—এ সব ব্যাপার ও এই সব কুৎসিত আলোচনার গুরুত্ব সে ভাল করিয়াই বোঝে। লীলার এ কথার পর সে সহসা আর কোন উত্তর দিতে পারিল না।

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া লীলা আবার বলিল—এই ত সে দিন অরুণকে নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল, এখনো সবাই সে কথা ভাল করে ভোলে নি। তারপর দুমাস যেতে না যেতেই আবার এই নতুন একটা কাণ্ড—লোকে বলবে নাই বা কেন? সকলের ঘরেই আমাদের মত বড় বড় মেয়ে আছে, কিন্তু কারুকে নিয়ে কোন দিন কোন চর্চ্চা ত শুনি নি! আমাদের বেলাতেই বা লোকে চর্চ্চা করবার অবসর পায় কেন? যা হোক, তুমি এখন কি স্থির করলে, বলো—আমি কালই এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা করে ফেলতে চাই।

বীণা চোখ মুছিয়া বলিল—আমি এত ঘড়ীর কাঁটার মত চলতে পারবো না। সব তাতেই তোমার তাড়াতাড়ি। আজকার রাত্রি আমায় ভাল করে ভাবতে দাও। কাল সকালে যা হয়, তখন হবে। (ক্রমশঃ)

গোস্বামী-বন্দনা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ

১

তোমরা উদাসী—গৃহী নহ প্রভু, চরণে প্রণাম করি;
মনে তোমরা করিয়াছ বন—কুঞ্জ দিয়াছ গড়ি।
বুঝিতে পারিনে ভিখারী কি ধনী,
কানু লাগি আনো ক্ষীর, সর, ননী,
তাঁহারি সেবায় গোটা দিন যায় কেটে যায় বিভাবরী।

২

তোমরা জ্ঞানের পাষাণ-ভূমিতে মৃদুল মালতী ফুল,
উষর মরুর ধূসর বালুতে যমুনার কুলুকুল।
হাটের মাঝারে মধু মৃদঙ্গ,
কঠোর কারায় সাধুর সঙ্গ,
সংসার আসরে মনোহরসাহী পদাবলী মধুকরী।

৩

কেমন সব হরিরে সঁপেছ তিল ও তুলসী দিয়া,
কালো কলঙ্কের গরব ধরে না—ভোর হয়ে আছে হিয়া।
সব কাজ তব তাঁরি আরাধনা,
তাঁরি দেওয়া সুখ, তাঁহারি বেদনা,
সংসার তাঁর সুমুখে রেখেছ তাঁরে নিবেদন করি।

৪

মুক্তি চাহ না মুক্তি বিতর তোমরা ভক্তিকামী,
কৃষ্ণ-সেবার অধিকার তব মোক্ষের চেয়ে দামী।
হেরি নবঘন ঝরে আঁখি তব,
ভকতির কথা অধিক কি কব,
অনুরাগ-ফাগে ভুবন রাঙ্গালে এ কি প্রেম হরি হরি!

৫

কেন গো পরুষ পুরুষের বেশে ভ্রমিছ অবনীতলে,
নবনীর মত হৃদি তোমাদের প্রেমের পরশে গলে।
ভ্রমিতেছ গোপী চন্দন লেপি'
শ্যাম সোহাগিনী যেন ব্রজগোপী
বঁধুর মধুর নামে ঝরে আঁখি দেখিয়া কাঁদিয়া মরি।

৬

নামে এত রুচি, এমন পীরিতি ভুবনে মেলা যে ভার,
দেবতারে কর প্রেমের পুতুল, তুলনা যে নাহি তার।
বিপুল পৃথিবী গৃহ পরিজন,
কেহ যেন তব নহেক আপন,
গরবী নাগরী শ্যামের সোহাগে নিয়েছ গাগরী ভরি।

৭

তমালের তলে তোমাদের গৃহ, যমুনার কূলে বাসা,
অনুরাগী কর রসের বেসাতি, যেচে দাও ভালবাসা।
বাঁশরীর স্বরে উদাস পরাণ,
হরিণীর মত কর আনচান,
গোরা-গরবিনী তোমাদিগে আমি পুরুষ বলিতে ডরি!

৮

রূপের জহুরী বুকেতে ধরেছ সব-সেরা নীলমণি,
দু'হাতে ভক্তি মুক্তি ছড়াও অক্ষয় ধনে ধনী।
হে দয়াল প্রভু, তব কৃপা যাচি,
অতি দীন হেথা দাঁড়াইয়া আছি,
কড়িহীন এই অনাথ পথিক পাবে না কি পদতরী!

ইয়োরোপের পত্র

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু এম-এ, বার-এট্-ল

ইংলণ্ডের হ্রদের দেশে

(English Lake District)

বন্ধুবরেষু,

ইংলণ্ডের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তভাগে ওয়েষ্টমুরল্যাণ্ড (Westmorland) ও ক্যামারাল্যাণ্ড (Cumberland) এই দুই কাউণ্টি জুড়ে ছোট ছোট পাহাড়ের মালা-ঘেরা যে সতেরোটি সুন্দর হ্রদের সারি আছে, সেই জায়গাটিকে ইংলিস লেক্ ডিষ্ট্রিক্ট বলে। এই Lake District তোমার মত ইংরাজী সাহিত্যানুরাগীর, কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-ভক্তের চিত্তে অপ্রমেয় ছায়া বিস্তার করে আছে। এ জায়গাটি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে নিশ্চয় তোমার মন খুব খুসি হবে। তাই এ হ্রদগুলির মধ্যে আমার একটি দিনের ভ্রমণের কথা তোমায় জানাচ্ছি।

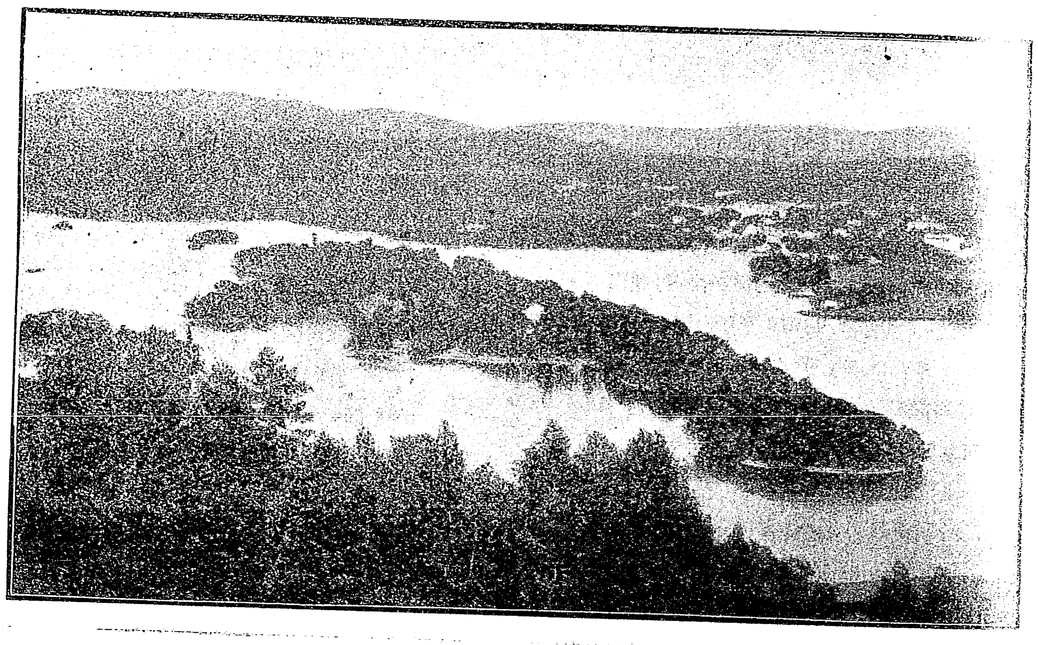

Windermere উইন্‌ডারমেয়ার হ্রদ।

Lake District ! এই কথাটির সঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মত কোলরিজ, সাদে, শেলী—কত কবি, কত সাহিত্যিকের স্মৃতি জড়ান। ইংরাজী কাব্যের রোমান্টিক যুগ সোণার সিংহদ্বার যেখানে উদ্ঘাটিত হয়েছিল, সেই পাহাড় ও হ্রদের মালাগুলি ইংরাজি কাব্য-ইতিহাসে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে আছে,—ইংরাজি কাব্যরসিকের চিরকাল আকর্ষণ করবে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে প্রকৃতির যে বিশেষ রূপের চিত্রগুলি দেখেছি, প্রকৃতির সেই রূপটি দেখবার জন্যে এবার এডিনবরা থেকে লণ্ডনে যাবার পথে লেক ডিষ্ট্রিক্ট এলুম। Windermere হচ্ছে এই হ্রদগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হ্রদ,—লম্বায় দশ মাইল, চওড়ায় এক মাইল। এই হ্রদের তীরে Windermere সহরে এসে হ্রদগুলি দেখব ঠিক করলুম।

সকাল প্রায় ছ'টার সময় ট্রেণ Windermere ষ্টেসনে এসে পৌছাল। তখন চারিদিকে সুন্দর প্রভাতের আলো। তখন গ্রীষ্মকাল। তার পর এই পাহাড়ে জায়গায় এত উত্তরে খুব শীঘ্র সূর্য্যোদয় হয়।

আমার সুটকেস ও ছোট ব্যাগটি ষ্টেসনের ক্লোকরুমে (cloak room) রাখলুম। এ দেশে ষ্টেসনে রেল-কোম্পানীর চার্জ্জে মালপত্র রাখবার ব্যবস্থাটি বড়ই সুন্দর, বিশেষতঃ ভ্রমণকারীদের পক্ষে বড়ই সুবিধের। এ ব্যবস্থা যদি না থাকত, তাহলে আমার মালপত্র নিয়ে কোন হোটেলের সন্ধানে বাহির হতে হত। কিন্তু এই জিনিষ রাখার ব্যবস্থা থাকাতে, আমি জিনিষগুলি ষ্টেসনে রেখে নিশ্চিন্ত মনে সমস্ত দিন টো-টো করে বেড়াব। তার পর সন্ধ্যার গাড়ীতে জিনিষগুলি নিয়ে চলে যাব,—আমার হোটেলের চার্জ্জ কিছুই লাগবে না।

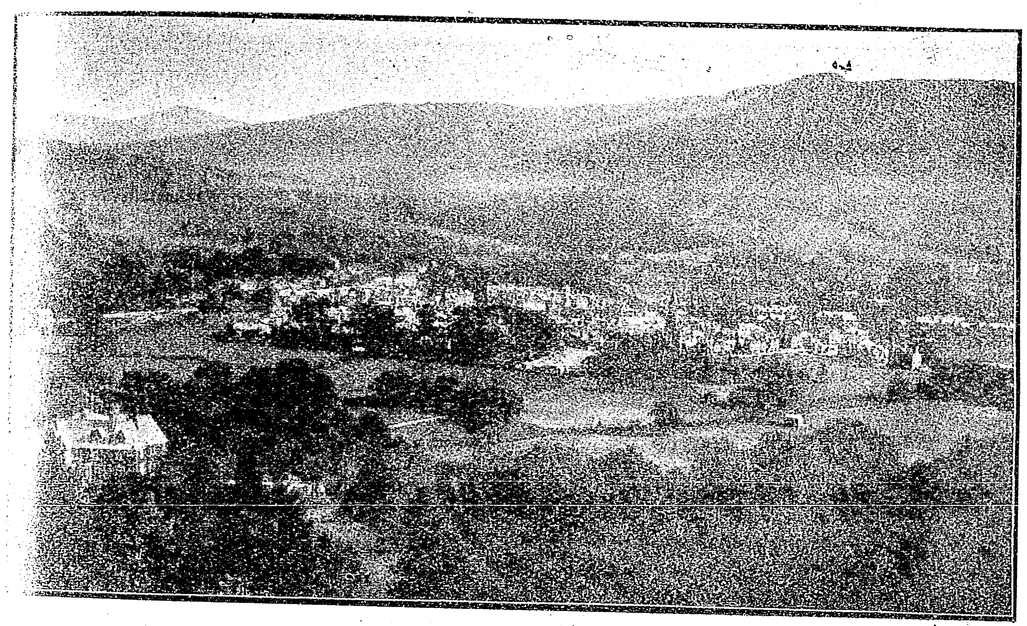

Ambleside আম্‌বেল সাইড্।

ষ্টেসনে হাতমুখ ধুয়ে সহর দেখতে বাহির হলুম। দেখি, এখনও কেউ জাগে নি,—বাড়ীগুলি সব নিদ্রিত, নিঝুম। ছোট ঘুমন্ত সহরটি সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় বড় সুন্দর লাগল। ইংলণ্ডের যে-কোন সহরেই গেছি, সেখানে তার জনতা, কর্ম্মকোলাহল, মোটরের ভক্‌ভক্ ও গতির ব্যস্ততায় মন বিক্ষিপ্ত ও ব্যথিত হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের সহরের মধ্যে কখনও এরূপ শান্ত স্তব্ধ প্রভাত দেখি নি। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতার মধ্যে জীবনের কর্ম্মকোলাহলের পর যে পরমা শান্তির আস্বাদ আছে, সেই শান্তির একটু স্পর্শ এই প্রভাতে পেয়ে বড় তৃপ্ত হলুম।

সাজান দোকানের সারির মাঝ দিয়ে বড় রাস্তা পার হয়ে লেক রোড দিয়ে নেমে হ্রদের তীরে এসে পড়লুম। নীল জল প্রভাতের আলোয় ঝলমল করছে। চারি দিক শান্ত, স্নিগ্ধ। ওপারে নীল পাহাড়ের মালার ছায়া জলে এসে পড়েছে। এপারে ব্লুবেল ও ক্যাটবেলের নীলে, ফক্সগ্লাভের লালে সবুজ পাড় রঙীন হয়ে উঠেছে,—যেন রঙীন পাড়-ওয়ালা নীল অঞ্চল ঝলমল করছে। দু'চারটি পাখী মৃদু কলরব করে উড়ে গেল। একটি পাথরের ওপর বসলুম। Prelude-এর একটি প্রভাতের বর্ণনা মনে পড়ল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব্বের একটি ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

দেখলুম, দুটি যুবক হ্রদের তীরে বেড়াচ্ছে। বেশভূষার বাহার নেই, মাথায় টুপি নেই, চুল বাতাসে উড়ছে। এক-জন একটু খর্ব্বাকৃতি, তার প্রশস্ত কপোল প্রথমে চোখে

পড়ে। মুখ রেখাঙ্কিত প্রৌঢ়ের মত সব সময় যেন চিন্তিত। তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটি প্রকৃতি-গ্রন্থখানি তন্ন তন্ন করে দেখছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ যেমন করে কোন প্রাচীন শিলালিপি পড়ে, তেম্নি মনোযোগ করে প্রকৃতির শোভা দেখছে। জলের একটু ঝিকিমিকি, ফুলের একটু দোলা, ঘাসের একটু কাঁপন, পাখীর একটু গান, দূর পাহাড়ের নিস্তব্ধতার একটু ভাঙন, প্রকৃতির প্রতি রং ও ছবি ও চাঞ্চল্য তাহার চিত্ত স্পর্শ করে ছবির মত মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে। আর একজন একটু লম্বা; তার গতি চঞ্চল,—তরুণ মুখ প্রতিভায় জ্বলজ্বল করছে। চোখ দুটি স্বপ্নময় প্রকৃতির এ রঙীণ অবগুণ্ঠন ভেদ করে যেন কোন

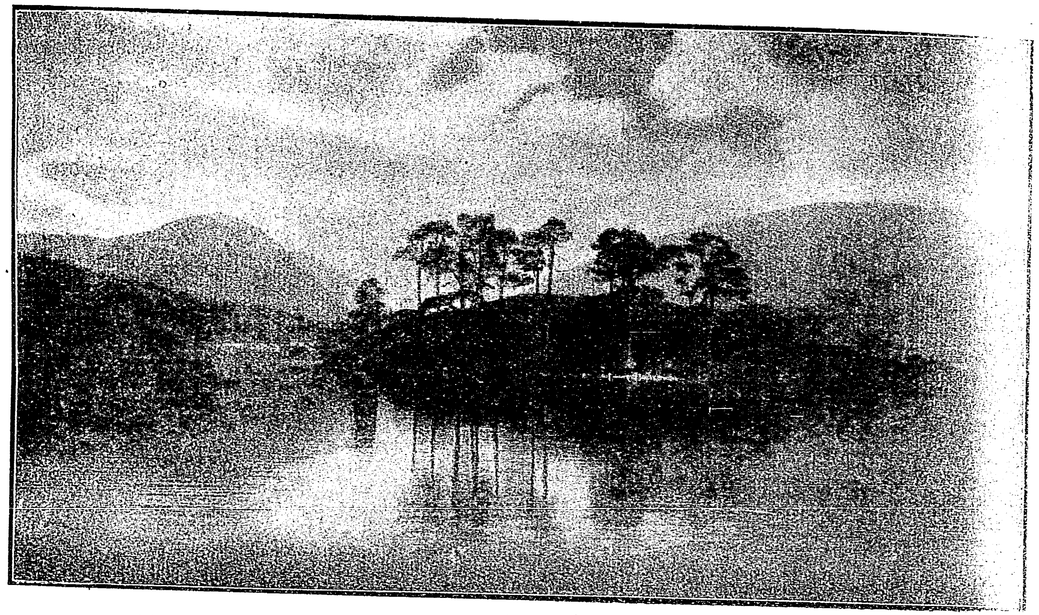

Grasmere গ্লাসমেয়ার হ্রদ।

অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধানে আছে; মাঝে মাঝে সে হাতে ভঙ্গী করে প্রভাতের শান্তিভঙ্গ করে অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে। তার জ্বলজ্বল চোখের দিকে চাইলে মন মুগ্ধ হয়। একজন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, আর একজন কোলরিজ। ফরাসী-বিপ্লবক্ষুব্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর সোণার স্বপ্নময় প্রত্যূষে ইংরাজীকাব্য-সরস্বতীকে যাঁরা রোমান্টিক পর্ব্বের স্বর্গদ্বার খুলে প্রথম আবাহন করেছিলেন, সেই কবিদ্বয় হয় ত এম্নি কোন নির্ম্মলোজ্জ্বল প্রভাতে এই হ্রদের তীরে Lyrical Ballad-এর আইডিয়া করেছিলেন।

ঘণ্টাদেড়েক পরে যখন Windmereএ ফিরলুম, তখন সহরটি জেগে উঠেছে। তখনও দোকান সব খোলে নি; তবে পথে গাড়ী, লোকজন চলছে। Royal Mail-লাঞ্ছিত ডাকগাড়ী প্রথমে চোখে পড়ল। তার পর দুধওয়ালার গাড়ী, রুটিওয়ালার গাড়ী বাড়ী বাড়ী ঘুরছে। এ দেশে গৃহস্থদের প্রতিদিন বাজারে গিয়ে বাজার করার বড় হাঙ্গামা নেই। জিনিষপত্তর প্রায় সবই বাড়ীতে দিয়ে যায়। কিছুদিন হল গবর্ণমেণ্ট গৃহিণীদের জন্য আরও সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। এখন পোষ্টাফিসের সাহায্যে রুটি মাখন ইত্যাদি কেনা যেতে পারে। কোন গৃহিণীর হয় ত চিনি ফুরিয়ে গেছে, তিনি তাড়াতাড়ি কোন চিনির দোকানদারের কাছে টেলিফোন করে দিলেন, তাড়াতাড়ি কিছু চিনি পাঠিয়ে দিতে। দোকানদার এক প্যাকেট চিনি কাছের পোষ্টাফিসে দিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে পোষ্টাফিসের পিয়ন চিনির প্যাকেট নিয়ে হাজির,—সে বাড়ীতে দিয়ে দাম নিয়ে যাবে। শুধু বই বা জামা-কাপড় নয়—এখন চিনি ময়দা ইত্যাদি জিনিষও ভি-পিতে কেনা যাবে। তাতে দোকানদার ও গৃহস্থের খুব সুবিধা।

ধীরে ধীরে দোকানপাট খুল্ল। একটি ছোট মনোহারী দোকান—তার সঙ্গে একটি ছোট রেস্তোরাঁ চোখে পড়লো। দোকানের সামনে একটি বড় বোর্ডে কোন্ খাবারের জিনিষের

কত দাম—লেখা রয়েছে। বেশ পেটভরে খেয়ে নেওয়া গেল, সমস্ত দিন আর না খেলেও যেন চলে; কারণ, বিদেশে ভ্রমণের সময় খাবার জিনিষ পেলে বেশ পেটভরে খেয়ে নেওয়া উচিত। আবার কখন খাবার জুটবে তার নিশ্চয়তা নেই। এ দেশে অবশ্য সব জায়গাতেই হোটেল বা রেস্তোরাঁ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এই পাহাড় ও হ্রদের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে হয় ত কোন হোটেল পাব না, এই ভাবনাও ছিল।

তার পর বেড়ানোর ব্যবস্থা করতে বাহির হলুম। এরূপ বেড়াবার জন্য সব যায়গাতেই মোটর টুর কোম্পানী আছে। তাদের বড় মোটর গাড়ীতে শস্তায় বেশ আরামে বেড়ান যায়। এখানেও কয়েকটি কোম্পানী আছে। তাদের মধ্যে এক জনের সঙ্গে ঠিক করা গেল—আজ সমস্ত দিন তাদের মোটরে করে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে,—প্রধান প্রধান হ্রদগুলির পাশ দিয়ে লেক ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যভাগটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। দাম দশ শিলিং।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় Windermere ষ্টেসনের পাশ দিয়ে যাত্রা করা গেল। বেশ বড় মোটর কোচ চারটি প্রশস্ত বেঞ্চি, মোটরচালক নিয়ে আমরা পনের জন যাত্রী। তার মধ্যে ছ-জন মহিলা। এ দেশে একা কেহ ভ্রমণ করে না, সঙ্গে বান্ধবী বা আত্মীয়া বা স্ত্রী থাকে। প্রতি সঙ্গে কোন মহিলা আছেন। শুধু একটি ইংরাজ ও আমি একা। আমি একটি বোটের সিট দখল করে বসলুম, ইংরাজটি আমার পাশেই বসল। দুজন আমেরিকান, দুজন ক্যানেডিয়ান, দুজন অষ্ট্রেলিয়ান, দুজন স্কচ্ আমি ভারতীয়, তাছাড়া সব ইংলিশ। কন্‌টিনেণ্ট থেকে বড় কেউ ইংলণ্ডে বেড়াতে আসে না। এলেও লণ্ডন দেখেই চলে যায়। কোন ফরাসী বা জার্ম্মাণের সহিত ইংলণ্ড-ভ্রমণে বড় দেখা হয় না।

আমার পাশের প্রৌঢ় ইংরাজটি আমার সঙ্গে প্রথম

Dove Cottage ডোভ কটেজ।

আলাপ সুরু করলেন। আমায় প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন, আমি Lake Districtএ আগে এসেছি কি না। আমি 'না' বলাতে, তিনি বল্লেন, তিনি দু'বার জায়গাগুলি দেখে গেছেন,—এই তাঁর তৃতীয় বার। কোন আফিসে কাজ করেন। এখন গ্রীষ্মের দু'সপ্তাহ ছুটি উপভোগ করে বেড়াচ্ছেন। ইংলণ্ডের হ্রদ দেখে স্কটলণ্ডের হ্রদ দেখতে যাবেন। আমি বল্লুম, আমি স্কটলণ্ডের হ্রদ দেখে আসছি, Lock Lomond ভারি ভাল লাগল। শুনে খুব খুসি হয়ে উঠলেন।

এদেশে গ্রীষ্মকালে প্রত্যেক কাজের লোক ১৫ দিন বা এক মাস ছুটি পায়। আফিসের কেরাণী থেকে হাস্পাতালের ডাক্তার—সবাই পালা করে এক-একজন করে কিছু দিনের জন্য ছুটি নেয়। এই সময়টা বেড়াবার ও রৌদ্র উপভোগ করবার সব চেয়ে সুন্দর সময়। কোন সমুদ্রতীরে বা পাহাড়ে বা স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে মুক্ত বাতাস ও রৌদ্র উপভোগ করে দেহের স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার কিছু বাড়িয়ে নেওয়াই হচ্ছে এ ছুটির উদ্দেশ্য। আমার সঙ্গী প্রৌঢ় ইংরাজটিও এইরূপ ছুটি পেয়ে এসেছেন।

Windermere সহর ছাড়িয়ে Windermere হ্রদ পার হয়ে আমরা উত্তর দিকে চলেছি। কিছু দূর গিয়ে Ambleside বলে একটি ছোট পুরাতন সহরে এসে পড়লুম। আমার কাছে গাইড বই ছিল, কিন্তু তার কিছু দরকার হল না। আমার পাশের ইংরাজটি আমার গাইড হয়ে সব বলে যেতে লাগলেন। চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা সুন্দর ছোট সহরটি। ছোট ছোট বাড়ী, পথঘাট বেশ পরিষ্কার। একটি ধূসর রংএর পাথরে-তৈরী চার্চ্চের পাশ দিয়ে গাড়ী গেল। ইংরাজটি বল্লেন, এর একটি রঙীন-মূর্ত্তিময় কাচের জানলা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভক্তেরা তাঁর স্মৃতিচিহ্নরূপে দান করেছে।

Ambleside ছাড়িয়ে আবার খোলা রাস্তায় বাহির হলুম। চারিদিকে সবুজে সবুজ; মাঝে মাঝে এক এক ঝাঁক মারগারেট ফুল শিশুর হাসির উচ্ছ্বাসের মত ফুটে বাতাসে দুলছে। মাঝে মাঝে রোডোডেন্‌ড্রোন (Rhododendron) ফুলের ঝাড় সবুজ কাপড়ে আবীরের ছোপের মত জ্বলজ্বল করছে। উপত্যকার মাঝের পথ দিয়ে আমরা চলেছি।

ইংরাজটি দূরে বাম দিকে একটি বাড়ী দেখিয়ে বল্লেন, ওটি হচ্ছে, Knoll। ওখানে Harriet Martineau থাকতেন।

Keswick Road ধরে আমরা Rydal হ্রদের দিকে চলেছি। প্রথমে Rydal hill চোখে পড়ল—অতি প্রাতন

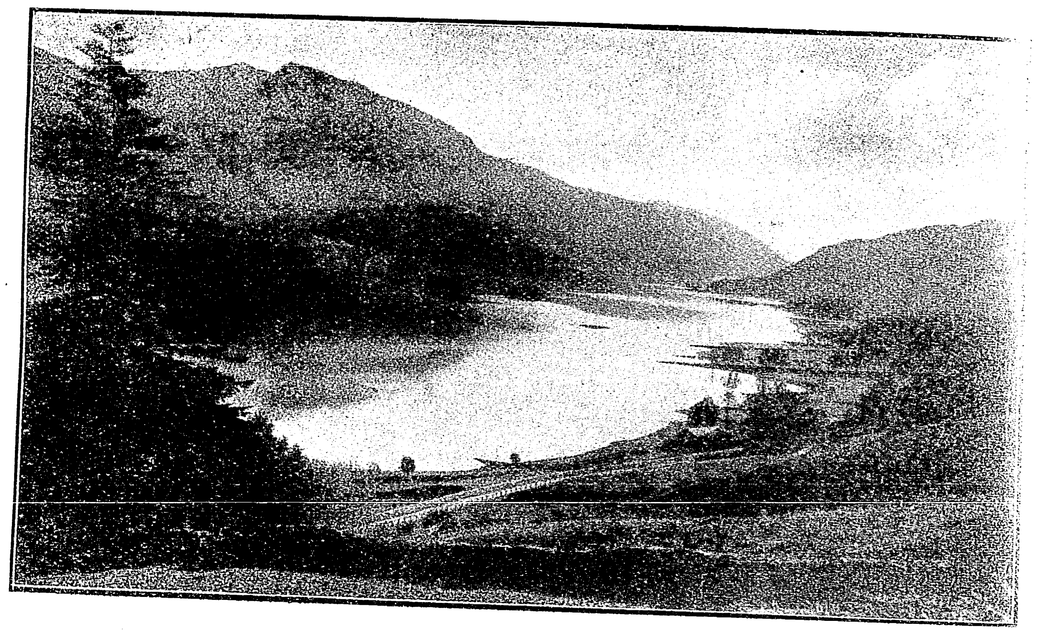

Thirlmere থিরল্‌মেয়ার হ্রদ।

সুন্দর কাঠের বাড়ী, Flemingsদের পুরাতন বসতবাড়ী। তারপর Rydal Mount,—এটি Wordsworthএর শেষ বসতবাড়ী। জীবনের শেষ চল্লিশ বছর তিনি এখানে ছিলেন। সুন্দর একটি ছোট বাড়ী—দোতলা, আকাশের নীল ও গাছের সবুজের ফ্রেমে আঁটা কাঠ ও কাঁচের কুটীর। প্রকৃতির উপাসক প্রকৃতির কবির উপযুক্ত বাসগৃহ। মার্থা ও মেরীর মত দুই ভক্তিমতী নারীর প্রেম ও সেবার মধ্যে প্রকৃতির কোলে এইখানে তিনি তাঁর সহজ সরল জীবনের দিনগুলি কাটিয়েছেন।

পথ এঁকেবেঁকে চলেছে। সহসা একটি ছোট হ্রদ রূপার পাতের পর্দ্দার মত উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। এটি হচ্ছে Rydal water। খুব ছোট হ্রদ, লম্বায় এক মাইলও হবে না, চওড়ায় আধ মাইলের চেয়েও কম,—আমাদের দেশের বড় দীঘির মত। কিন্তু ভারি সুন্দর মনে হল। স্থির, নির্ম্মল জলের সরোবর সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্তিতে জলরাশির মধ্য থেকে একটা দ্যুতি বাহির হচ্ছে,—যেন সবুজ পাহাড়ের ফ্রেমে আঁটা একখানি কাঁচের আয়না,—তাতে সূর্য্য আপনার মুখ দেখছে।

হ্রদের ধারের পথ দিয়ে আমরা চলেছি। একটি ছোট

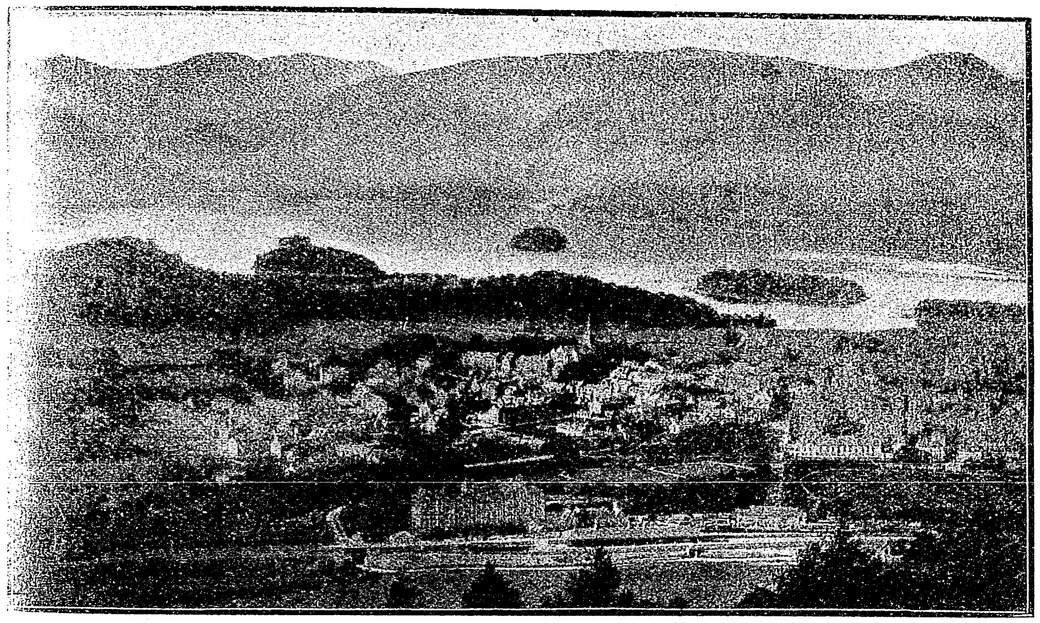

Keswick কেস্‌উইক্।

টিলার কাছে মোটরচালক তার মোটর একটু থামাল। ইংরাজটি বল্লে, এটি হচ্ছে Wordsworth's seat। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে একটি উঁচু যায়গায় ওঠা যায়। ওই স্থান কবির বড় প্রিয় ছিল।

ডান দিকে Nab Scar পাহাড়ের চূড়া উঠে গেছে। বাম দিকে Rydal waterএর জল ঝকঝক করছে। মাঝখানের পথ দিয়ে আমরা চলেছি। হ্রদের ধারে একটি ছোট কুটীরের সামনে আবার মোটর থামল। এই কুটীর হচ্ছে Nab। ডি-কুইন্‌সি এই বাড়ীতে অতিথি হয়ে কিছুদিন ছিলেন। এই বাড়ীর অধিকারী বুড়ো Simpsonএর মেয়েকে শেষে বিয়ে করেন। Confession of an Opium-Eater-এর লেখক তরুণ যৌবনে এইখানে তাঁর প্রেমের লীলা করেছিলেন। তাঁর প্রেমের স্মৃতিভরা বাড়ীটি ভারি সুন্দর লাগল। তার পর Hartley Coleridge এই Nab কুটীরে বাস করেন। এইখানে তাঁর মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর শবদেহের পেছনে যাত্রা করেছিলেন।

Rydal Water ছাড়িয়ে চলেছি। দুধারে ঘন গাছের সবুজ। সহসা সে সবুজ পর্দ্দা ভেদ করে আবার হীরার মত জলের ঝিলমিলানি। ইংরাজটি দীপ্তমুখে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন,—ওই Grasmere, Grasmere! আমেরিকান মহিলাটি বাইনেকুলার (ছোট দুচোখো দূরবীণ্) লাগিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলেন।

হ্রদটি মাঝারি রকমের—এক মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া। মাঝে একটি ছোট দ্বীপ রূপার থালে নীলকান্তমণির মত ঝিকমিক করছে। দেখতে খুব সুন্দর বোধ হল না, কিন্তু এই হ্রদটি এক দিন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিক্ষুব্ধ চিত্তে যে শান্তির প্রলেপ বুলিয়েছিল, তারি গুণে তিনি আনন্দময়ী কবিতাকে আবার জীবনে বরণ করতে পেরেছিলেন। এই

'Peaceful Vale'র রসভাণ্ডার হতে শান্তি ও সৌন্দর্য্যরস সঞ্চয় করে কবি তাঁর ভাষা ও ছন্দের বন্ধনে বেঁধে সাহিত্যরস-তৃষিতের জন্য চিরকালের তরে দান করে গেছেন।

হ্রদের ধারে ধারে রাস্তা দিয়ে আমরা চল্লুম। Grasmere হ্রদে আর ঢুকলুম না। ইংরাজটি একটি পথ দেখিয়ে বল্লেন, এ দিক দিয়ে একটু গেলেই Dove Cottageএ যাওয়া যায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ওই বাড়ীতে ১৭৯৯ থেকে ১৮০৮ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন।

Grasmereএর শান্তিময় উপত্যকা দিয়ে চলেছি। পথ এবার ধীরে ধীরে উঠছে। একটা পাহাড়ের ওপর উঠছি,—যেন সূর্য্য-ঝলমল নীলাকাশের দিকে আমাদের যাত্রা। খুব খাড়াই পথ,—মোটর ইঞ্জিনের ঝক ঝক শব্দ কাণে বড় বাজছে। দুধারে পাহাড়ের সারি,—তলায় সুন্দর উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের গা দিয়ে রূপার সুতার মত ঝর্ণা-ধারা বয়ে আসছে। তলায় একটি গিরি-স্রোতস্বিনী রূপালি সর্পের মত চলেছে। দূরে পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছে। কত অদ্ভুত, কত বিচিত্র তাদের মূর্ত্তি। একটি পাহাড়ের রূপের সঙ্গে আর এক পাহাড়ের মিল নেই।

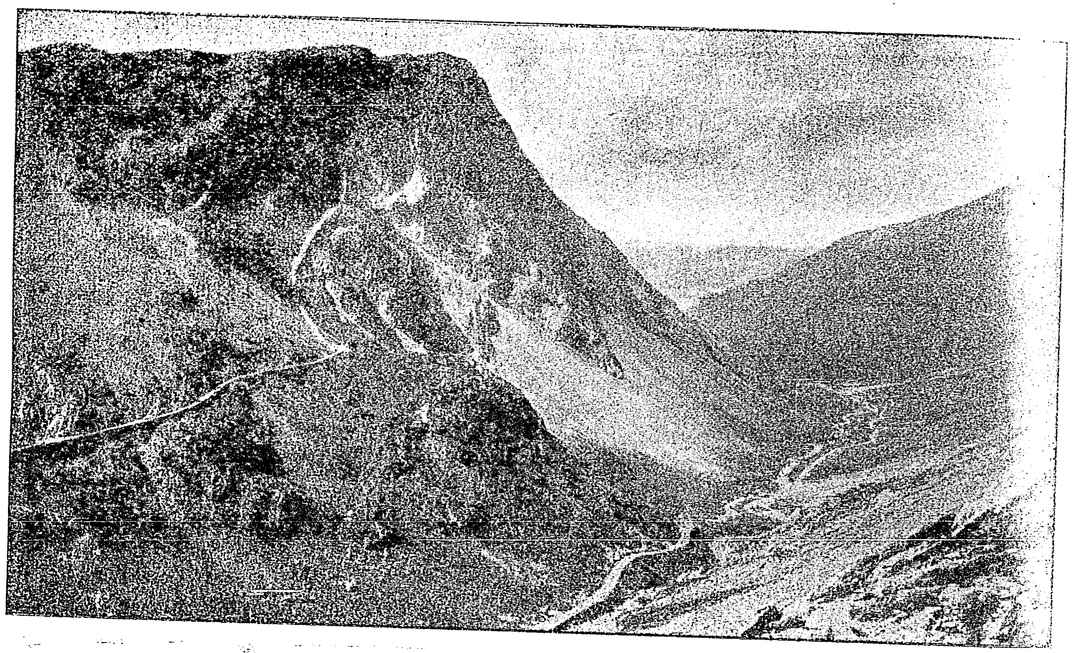

Honister Pass হনিষ্টার পাস্।

দুধারে সবুজ গাছের সারি। গাছগুলি পাতায় পাতায় ভরা। মাঝে মাঝে অতি মিষ্টি গন্ধওয়ালা সাদা ফুলের ঝাড়, মারগারেটের বন, ডেসির কুঞ্জ, রোডোডেনড্রনের সারি। রৌদ্র-উজ্জ্বল নীলাকাশে সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। তাহার ছায়া সবুজ মাঠে পড়ছে। পাহাড়ের মাথা দিয়ে মেঘ উড়ে চলেছে। পাহাড়ের তলায় মেষ চরছে, গরু চরছে। মাঝে মাঝে দু'একটি পাখী উড়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্যের মাঝ দিয়ে আমাদের প্রকাণ্ড মোটরের দ্রুতবেগে যাত্রা কিছু বেমানান হলেও চারিদিকের শান্তি ও সৌন্দর্য্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

আরও উঁচুতে উঠে চলেছি; এই খাড়াইকে Dunmeril Raise বলে। সমুদ্রতীর থেকে ৭৮৩ ফিট উঁচু। বামে Helm Crag (১২৯৯ ফিট) বলে একটি পাহাড়ের চূড়া চোখে পড়ছে। একটা পাহাড়ের চূড়া,—সম্মুখ থেকে দেখাচ্ছে, যেন একটা সিংহ থাবা মেলে বসে আছে, ওই হ্রদটার ওপর লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু পাহাড়টির আর এক পাশে আসতেই মনে হল, কোথায় সেই সিংহ,—এ যে একটি বৃদ্ধা অর্গান বাজাচ্ছে! বড় অদ্ভুত এই পাহাড়ের শিখরমালা।

আমরা Westmorlandএর সীমা পার হয়ে Cumberlandএ এসে ঢুকেছি। পথ নেমে চলেছে,—গড়গড়িয়ে নেমে

যাচ্ছি। রূপালি ঝর্ণাধারাগুলি যেখানে নদী হয়ে নিলেছে, নদীধারাগুলি যেখানে হ্রদে গিয়ে পড়েছে, সেইদিকে তলায় নেমে চলেছি। দু'পাশের পাহাড়ের মালা উঁচু আরও উঁচু হয়ে উঠছে।

আর একটি হ্রদের পাশে এলুম। Thirlmere হ্রদ।

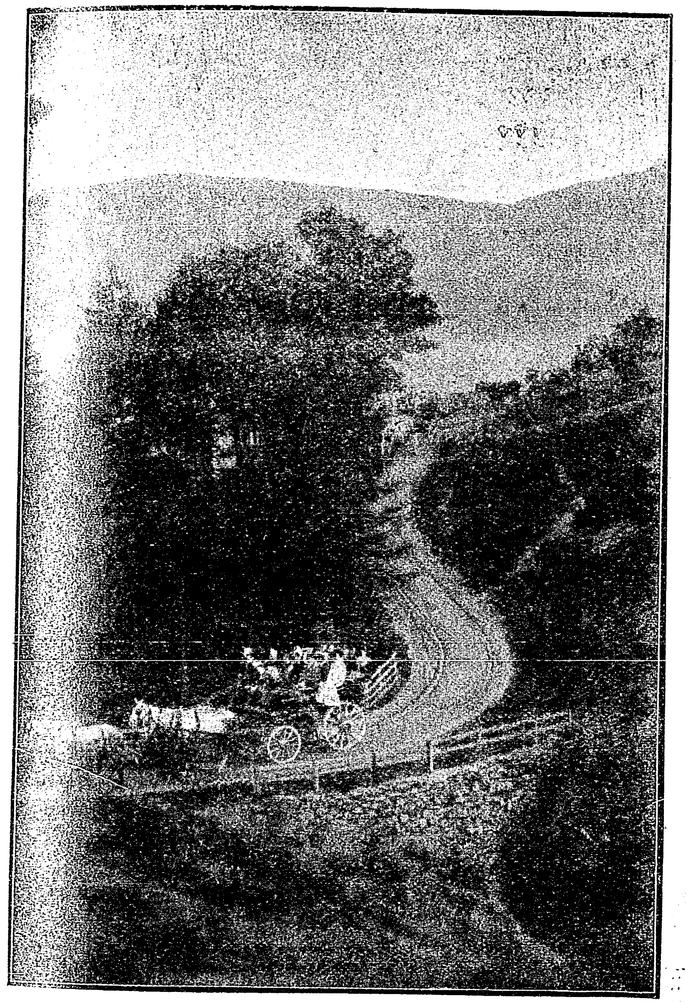

The Devi s Elbow ডেভিলস এলবো

এই হ্রদটী আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। খুব বড় নয়,—লম্বায় সাড়ে তিন মাইল; কিন্তু চওড়ায় আধ মাইল। দুধারে পাহাড়ের সারি, তার মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে হ্রদটি গেছে। হ্রদের বাম ধারে রাস্তা দিয়ে আমাদের মোটর চল্ল। সামনে চাইলে মনে হয়, ওই সামনের পাহাড়ের কোলে হ্রদটি শেষ হয়েছে; কিন্তু পাহাড়টি পার হলেই আবার দেখা যায়, দীর্ঘ হ্রদ পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে অনেক দূর চলে গেছে—যেন কোন বারুণী-কন্যা পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পালাচ্ছে,—তার রূপালি অঞ্চলটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে। হ্রদটি যখন শেষ হল, সমস্ত হ্রদটি বড় সুন্দর দেখাল,—যেন কোন রাজকন্যা নীলাঞ্চল ফেলে এ নির্জ্জন প্রান্তরে সুদীর্ঘ অঙ্গ এলিয়ে রবিকর পান করছে, আর তার চারদিকে পর্ব্বতের প্রহরী-দল দৈত্যের সারির মত গুম হয়ে বসে আছে।

হ্রদের জলরেখা আবার পাহাড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। পথ আবার উঁচুতে উঠে চলেছে। দুধারে পাহাড়-সারি বৃহৎ রুক্ষ রুদ্র হয়ে উঠছে। একটি খুব উঁচু জায়গায় এসে মোটর থামল। চারিদিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। পেছনে Thirlmere নীলকান্তমণি গড়া আলোর মত পড়ে,—সামনে Keswick উপত্যকা,—একটি ছোট্ট হ্রদের জল দেখা যাচ্ছে,—পার্ব্বত্যকন্যার নীল চোখের মত Derwent water আহ্বান কচ্ছে। হ্রদের ধারে একটি ছোট সহর এক সার রঙীন তাসের ঘরের মত দেখাচ্ছে। আরও দূরে একটি হ্রদের জল ঝিকমিক করছে। তার পাশে Skiddaw (৩,০৫৩ ফিট পর্ব্বতচূড়া রৌদ্র পরিপূর্ণ নীলাকাশে উঠে গেছে।

মোটর-চালক মোটর থামাতে, কোন দ্রষ্টব্য জায়গা এসেছে ভেবে, আমেরিকান ভদ্রলোকটি তাঁর নভেল হতে চোখ তুলে একবার চাইলেন, বলে উঠলেন, বা, কি সুন্দর! আমেরিকান মহিলাটি চোখে বাইনেকুলার লাগাতনে। অষ্ট্রেলিয়ান মহিলাটি গাইড বুকের ম্যাপ খুলে দেখলে

লাগলেন—জায়গাটা কোথা। আমার পাশের ইংরাজটি বল্লেন, ওই দূরে Keswick সহর। কানেডিয়ান ভদ্রলোকটি জায়গাটার একটা খসড়া ম্যাপ এঁকে হ্রদ ও সহরের নাম সব ডায়েরীতে লিখতে লাগলেন।

পথ নেমে চলেছে। গড়গড়িয়ে আবার নেমে চলেছি। Derwent water বামে রেখে Keswick সহরে এসে পড়লুম। মোটর-চালক মোটরের গতি কমালো। বিশেষতঃ সহরে ঢুকেই সামনে school বলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন লেখা থাকাতে খুব সাবধানে চালাতে লাগল।

মোটর-চালকদের জন্য ও পথের লোকেদের রক্ষার জন্য এ দেশে অনেক সুব্যবস্থা আছে। যেখানে এক রাস্তা আর এক রাস্তার ওপর দিয়ে গেছে, এরকম প্রতি চৌমাথার একটু আগে Cross-Road—Danger বলে একটি চিহ্ন থাকে। যেখানে রাস্তা খুব এঁকে বেঁকে ঘুরে গেছে, সেই বেঁকের মুখে, রাস্তাটা কি রকম ভাবে বেঁকেছে তার চিহ্ন দেওয়া থাকে। আর প্রতি স্কুলের সামনে রাস্তার ধারে Safety First বা School এই রকম লেখা একটি ছোট ত্রিভুজ চিহ্ন লোহার দাণ্ডায় বসান থাকে। এই রকম অনেক চিহ্ন দেখে বিধি-ব্যবস্থা মেনে এ দেশে মোটরকার

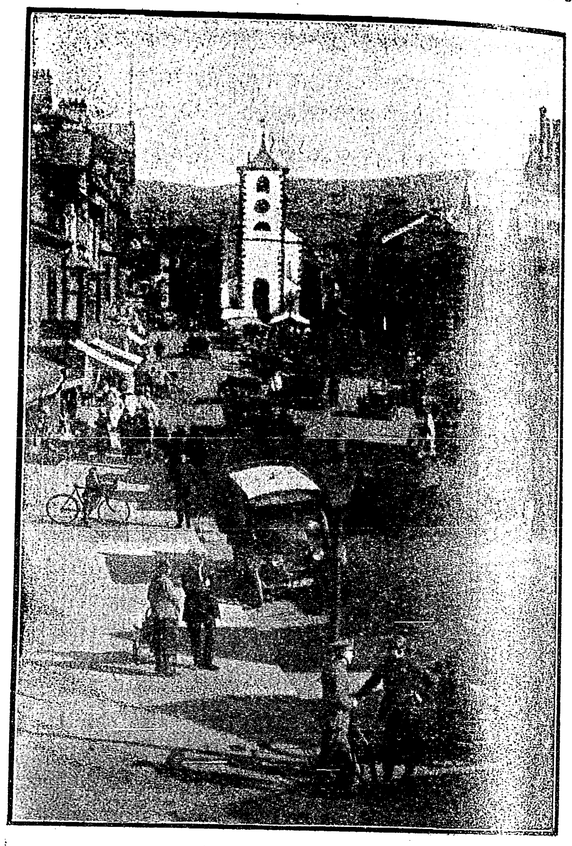

কেসউইক—মেন ষ্ট্রীট বা বড় রাস্তা

স্কলোমন্ (স্কটলণ্ড)

চালাতে হয়, এ বিষয়ে লোকের সাবধানতা ও ব্যবস্থা বড় সুন্দর।

Keswick একটি ছোট সুন্দর সহর। বেশ সুন্দর বেড়াবার জায়গা। তার দুদিকে দু'টি সুন্দর হ্রদ, চারিদিকে পাহাড়ের মালা। ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় পাহাড় Scawfell

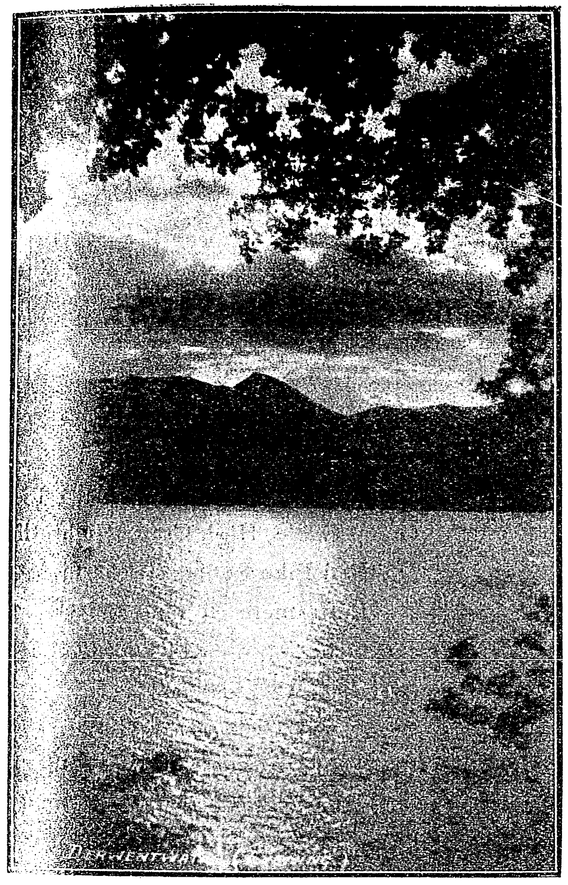

সন্ধ্যায় ড়ির্ ওয়েষ্ট ওয়াটার

Pik (৩২১০ ফিট) একদিক আড়াল করে আছে। এতক্ষণ ধূসর স্তব্ধ সবুজ পাহাড়ের সারি ও শান্ত নীল হ্রদের জলের ঝিলমিলানির পর এই মৃদু-কলরব-মুখর শান্ত সহরের নানা রংএর ছোট বাড়ীর সারি বড় সুন্দর মনে হল।

Main street পেরিয়ে পুরাতন বাজারের ভেতর দিয়ে Greta নদীর পাশ দিয়ে সহর ছাড়িয়ে আমরা আবার উদার উপত্যকায় পড়লুম। সুন্দর মাঠের মাঝ দিয়ে পথ। অদূরে Derwent নদীর জল ঝিকমিক করছে। মাঝে মাঝে মারগারেট ফুলের বন, বাতাসে দুলছে, শিশুর মুখের সাদা হাসির মত। আরও দূরে নীল পাহাড়ের মালা। তাদের ওপর সাদা মেঘ উড়ে চলেছে। চারিদিক রৌদ্রে ঝলমল করছে।

আর একটি হ্রদের পাশে এসে পড়লুম। দীর্ঘ লম্বা হ্রদ—Bassenthwaite Lake প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল লম্বা, কিন্তু আধ মাইল চওড়া। স্থির স্বচ্ছ জল টলমল করছে।

হ্রদের তীরে তীরে কিছুদূর গিয়ে আমরা বামে ঘুরলুম। এতক্ষণ উত্তর-পশ্চিম মুখে যাচ্ছিলুম, এখন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হ্রদের স্নিগ্ধ নীল জল ছাড়িয়ে ধূসর পাহাড়ের দিকে মোটর চল্ল।

পাহাড় ও প্রান্তরের মাঝ দিয়ে পথ উঠে নেমে এঁকেবেঁকে চলেছে। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকটা ছোটনাগপুরের মত মনে হল। কিন্তু ছোটনাগপুরের লালমাটি বা রুক্ষ পাহাড় বা ঘন জঙ্গল নেই। চারিদিকে সবুজে সবুজে ভরা। শরতে বঙ্গপ্রকৃতির মধ্যে যে পরিপূর্ণতা দেখা যায়, তার আভাস রয়েছে—ঝর্ণা ধারা ঝরে পড়ছে, নদীগুলি জলে টলমল করছে, বাঁশবনের মত ম্যারগারেট ফুলের ঝাড় বাতাসে দুলছে, মেষ চরছে,—ছোটনাগপুরের রুদ্র পার্ব্বত্য শোভার সঙ্গে বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামলতা-জড়ান প্রকৃতিশ্রী রৌদ্রে ঝলমল করছে।

কখন উঠে কখন নেমে মাইলের পর মাইল মোটর চলেছে। আর একটি হ্রদের তীরে এসে পড়লুম—Crummock Water। হ্রদটির তীরে তীরে প্রায় আড়াই মাইল গিয়ে আবার একটি প্রান্তর পার হয়ে আর একটি ছোট হ্রদের তীরে এসে পড়লুম। হ্রদটি খুবই ছোট; কিন্তু দূর থেকে বড়ই সুন্দর লাগল। এই হ্রদটির তীরে গাছের ছায়ায় একটি হোটেলের সামনে মোটর এসে থামল। ঘড়িতে দেখলুম দেড়টা বেজেছে, ল্যাঞ্চের

এই সময়। হোটেলে ল্যাঞ্চ খাবার জন্যে মোটর থামল।

সকলে ল্যাঞ্চ খেতে হোটেলে ঢুকল। আমার খাবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং হ্রদটা দেখতে ও সম্মুখে পাহাড়ে একটু উঠতে বিশেষ ইচ্ছা হ'ল। তা' ছাড়া পকেটে কিছু Sandwich ও চকোলেট রসদ এনেছিলুম।

সুন্দর ছোট হ্রদটি। লম্বায় দেড় মাইল হবে, চওড়ায় আধ মাইলের কিছু ওপর, কিন্তু বড়ই সুন্দর। তিন দিক প্রায় পাহাড়ে ঘেরা। ওপারে কয়েকটি উঁচু পাহাড়ের চূড়া। এপারের একটি ছোট পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলুম। ৫০০ ৬০০ ফিট উঁচু হবে। বন জঙ্গল কিছু নেই, শুধু বুনো বড় ঘাসে ভরা। কিছুদূর একটি ছোট সরু পথ দিয়ে উঠে গেলুম। তার পর, ঘাসের মাঝ দিয়ে উঠে যেতে হল। মেষ চরছে, আমায় দেখে পথ থেকে সরে গেল। পাহাড়ের মাথার দিকটা বড় খাড়াই। সেখানে পায়ে হেঁটে ওঠা যায় না, ঘাস ধরে ধরে উঠতে হল। কোন কীটপতঙ্গ নেই। শুধু যতই ওপরে উঠতে লাগলুম, একদল বন্য পাখীর কলরব বাড়তে লাগল।

পাখীগুলি অনেকটা চিলের মত দেখতে,—ঈগল জাতীয় হবে। তাদের বাসভূমি পাহাড়ের মাথায় এক মানুষকে,

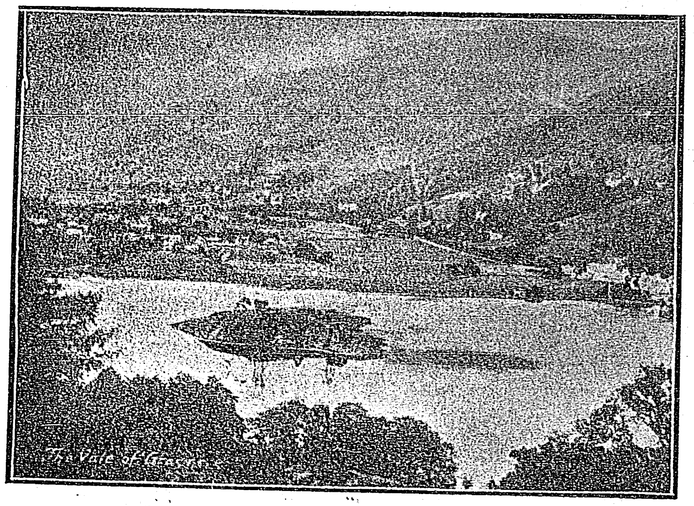

গ্রাসমেয়ার উপত্যকা

বিশেষতঃ কালো মানুষকে আসতে দেখে, তারা পাশের পাহাড়ের মাথায় বসে কিছুক্ষণ কলরব করলে। তার পরে মানুষের অসমসাহসিকতা দেখে উড়ে চলে গেল।

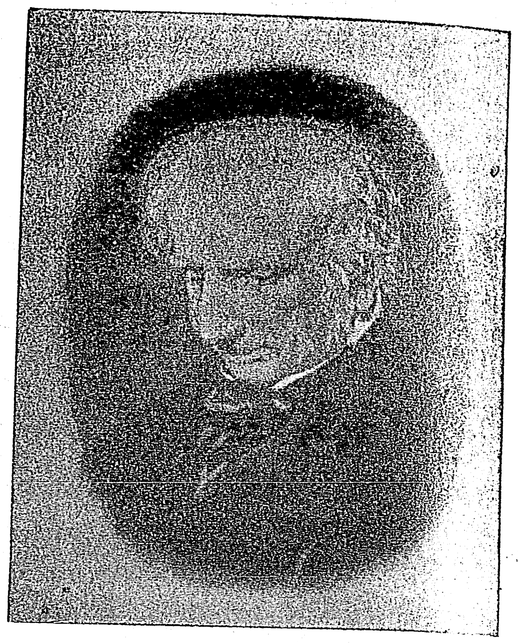

কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ

পাহাড়ের ওপর উঠে চারিদিকের শোভায় মুগ্ধ হয়ে গেলুম। Green Gable, High Crag, High Stile, Red Pike ইত্যাদি পাহাড়ের মালা-ঘেরা Buttermere বা মাখন-সরোবরটি বড়ই সুন্দর লাগল,—যেন দৈত্যপুরে কোন বন্দিনী রূপসী রাজকন্যা।

একটি পাথরের ওপর বসে sandwichগুলি ধ্বংস করে ধীরে নামলুম। দেখলুম পাহাড়ে ওঠার চেয়ে নামাটাই শক্ত।

নেমে হোটেলে ঢুকলুম। Victoria Hotel। দরজায় ঢুকেই দেখি—কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হাতের লেখা একটি বাঁধান প্রশংসাপত্র টাঙান রয়েছে। একটা লেমনেড খেয়ে কিছু ছবি কেনা গেল।

হ্রদের পাশে গিয়ে বসলুম। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ঝলমল হ্রদটি সিন্ধুনীল দিবাস্বপ্নের মত মনে হল। যেন একটি নীল স্ফটিকের পেয়ালা সবুজ পাহাড়ের অন্তরক্ষরিত সুধারসে

টলমল করছে। এই পেয়ালার রস পাণ করে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কবি-চিত্ত ছন্দিত হয়ে উঠেছিল।

মোটরের ভক্ ভক্ শব্দে চমকে উঠলুম। ফেরবার

ডোভ কটেজ—বাগান

সময় হয়েছে, যাবার ডাক এল। Windermere থেকে অনেক দূরে এসেছি। সন্ধ্যে ছটার মধ্যে সেখানে পৌঁছতে হবে।

যে পথ দিয়ে এসেছিলুম ঠিক সেই পথ দিয়ে ফিরছি না। Devil's Elbow পেরিয়ে Honister pass দিয়ে একটু ঘুরে চলেছি।

Keswickএ এসে মোটর থামল। চা খাবার সময়। আমি ছোট সহর ও আশপাস দেখতে বেরুলুম। এখানে দুটি প্রধান দেখবার জিনিষ আছে। সহরের প্রান্তে Greta নদীর কাছে Greta Hall—পাহাড়ের কোলে ছোট একটি সুন্দর বাড়ী। এখানে কবি কোলরিজ কিছু দিন বাস করেছিলেন। তার পর কবি সাদেও ছিলেন। কবি শেলীকে যখন Oxford থেকে চলে আসতে হয়, তখন তিনি তাঁর তরুণী বধূকে নিয়ে এই বাড়ীতে ছিলেন। বিকেলের আলোয় সেই বাড়ীর দিকে চেয়ে শেলীর জীবনের কথা ভেবে মন বেদনায় ভরে এল।

সহর ছাড়িয়ে Derwent হ্রদের দিকে চল্লুম। হ্রদের তীরে Friar's Crag বলে একটি ছোট সুন্দর পাহাড় আছে। তার তীরে রাস্কিনের একটি ছোট সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ। পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে সমস্ত হ্রদটি ও চারিদিকের পাহাড়ের মালা বড় সুন্দর দেখায়। রাস্কিন জায়গাটিকে বলেছেন, "one of the three most beautiful prospects in Europe." সন্ধ্যার সময় জায়গাটি বাস্তবিক অপরূপ হয়,—যখন অস্তগামী সূর্য্যের রাঙা আলোয় হ্রদের জল গলিত সোনার মত টলমল করে। তার পর পাহাড়ের পাশে সূর্য্যের শেষ স্বর্ণরেখা মিশে যায়, স্তব্ধ শান্ত জলে পাহাড়ের ছায়া পড়ে, তার ওপর রঙীন মেঘের মায়া ভাসে, সন্ধ্যার গম্ভীর ছায়া ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে, দূরে ঝর্ণার গান বাজে, গোধূলির আলোয় চারিদিক

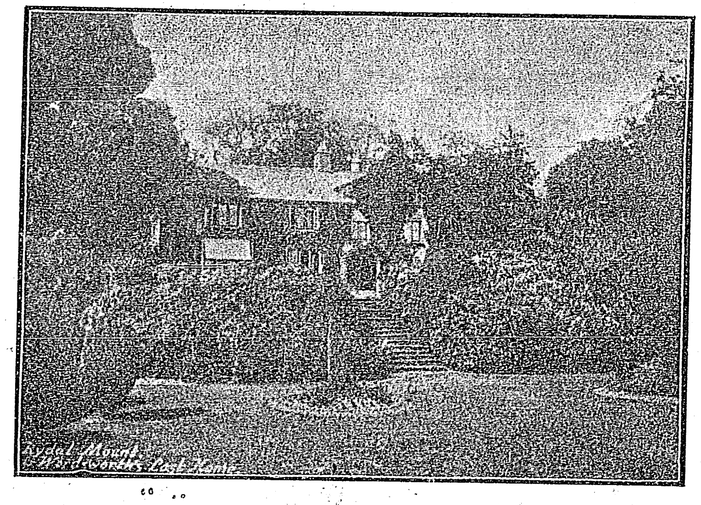

রিডাল মাউট

স্বপ্নময় দেখায়। তার পর অন্ধকার পটে রজত-প্রদীপের মত পাহাড়ের কোলে চাঁদ ওঠে, তারার মালা জলে ঝিলমিল করে, বনের অন্ধকার রহস্যময় হয়, তখন জায়গাটি সত্যই অপরূপ।

Keswick ছেড়ে মোটর চল্ল। St John Vale পার হয়ে Thirlmereএর পাশ দিয়ে Grasmereর দিকে চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্য্যের বিদূরিত আলোয় চারিদিকের পাহাড়ের মালা, বনের সারি, হ্রদের জল নবরূপ নিয়েছে। যাবার সময় দুপুরের আলোয় তাদের যে রূপ দেখেছিলুম, ফেরার পথে গোধুলির আলোয় তাদের নবরূপ দেখলুম, এক স্বপ্নময় ছায়া জড়ান। আমার ঠিক পেছনে এক নব-বিবাহিত ইংরাজ-দম্পতী বসেছিলো। সমস্ত পথ তাদের গল্প, মৃদু-গুঞ্জরণের বিরাম ছিল না। এখন তারা স্তব্ধ হয়েছে, মাঝে মাঝে অতি মৃদুস্বরে গান গেয়ে উঠছে, একটি ইতালীয়ান অপেরা হতে একটি duet আরম্ভ করেছে। গানটা কি মনে নেই—কিন্তু সে গানের সুরটা ভুলতে পারি নি। এখনও সন্ধ্যার আলোয় একটু চুপ করে বসলে, সেই সুরটি কানে বেজে ওঠে এবং পাহাড়ের কোলে সোনার পাতের মত একটি হ্রদের ছবি চোখে ভাসে।

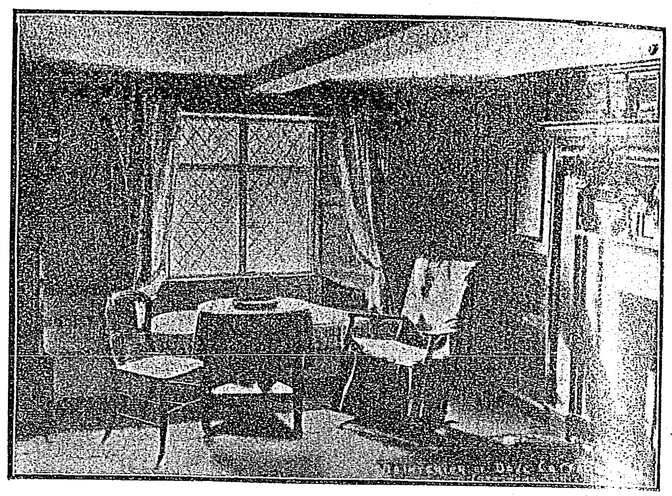

বসবার ঘর (ডোভ কটেজ)

বসবার ঘরটিতে ঢুকলে মনটা দুলে উঠে। মনে হয় যেন কাদের ছায়া বসে আছে। ১৭৯৯ সালের এ বাড়ীর এক সন্ধ্যার ছবি চোখে ভেসে উঠে। জানলার পাশে তরুণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বসে। তখনও তিনি শান্ত সমাহিত প্রকৃতির ঋষি হন নি। ফরাসী বিপ্লবের বহ্নি ধূমে তাঁর চিত্ত তখনও অন্ধকার। এক ফরাসী তরুণীর সঙ্গে তিনি যে প্রেমলীলা করে এসেছেন, তার দুঃস্বপ্নময় স্মৃতিতে অন্তর চঞ্চল ব্যথিত। তাঁর পাশে তাঁর ভগ্নি শান্ত হয়ে বসে। সম্মুখে চেয়ারে তরুণ কোলরিজ,—স্বপ্নময় চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে, Rhyme of Ancient Mariner পড়ে শোনাচ্ছেন—

He prayeth best who loveth best.
All things soth great and small.

Wordsworthএর মুখ আশায় আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল। বাড়ীতে Wordsworthএর অনেকগুলি জিনিষ আছে। তাঁর সব কাব্যের প্রথম-সংস্করণ বইগুলি এক জায়গায় সংগ্রহ

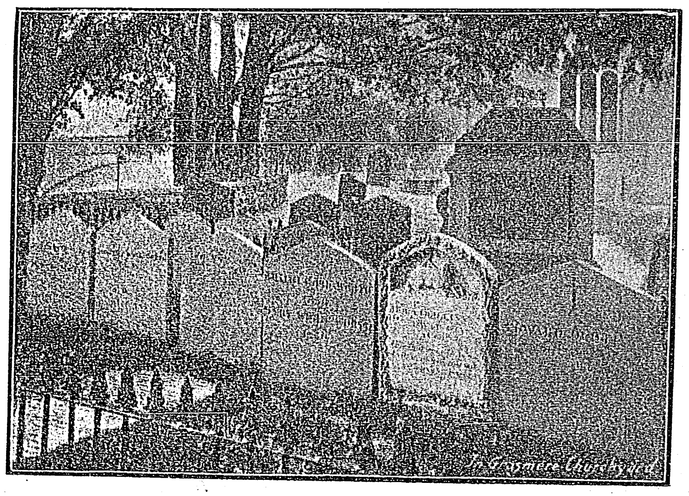

ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের সমাধিক্ষেত্র

Grasmereএর Dove cottageর সামনে মোটর থামল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-ভক্তদের এই কুটীর একটি তীর্থ। সাদা দোতলা একটি ছোট বাড়ী, অতি সহজ সরল নির্ম্মল—

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, ডি, কোয়েন্সে—কত জনের স্মৃতি জড়ান। বাড়ীর বাহিরটি যেমন, বাড়ীর ভিতরটিও তেম্নি সাদা ঝরঝরে, কোথাও উপকরণবাহুল্য, আড়ম্বর নাই। করা রয়েছে। তাঁর কতকগুলি হাতে-লেখা কবিতা রয়েছে, বাড়ীর আসবাবপত্র প্রায় সব ওয়ার্ডসওয়ার্থের সময়ের। তিনি যে খাটে শুয়ে মরেছিলেন, সে খাটটিও রয়েছে।

ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের শয়ন-গৃহ

কিন্তু Dove Cottageএর দিকে চেয়ে Wordsworthএর কথা নয়, আফিম-সেবী De Quinceyর কথা পর পর মনে পড়তে লাগল। Wordsworthএর পর তিনি এ বাড়ীতে বহু দিন ছিলেন। Wordsworthকে আমি ভক্তি করি, কিন্তু Confessions of an Opium Eaterএর লেখক আমার অন্তরে প্রীতি ও বেদনা জাগায়। সেই আফিম-ভক্ত তাঁর বিচিত্র চঞ্চল বেদনাময় জীবনে এই শান্ত কুটীরে কিছু শান্তি পেয়েছিলেন। তাঁর যা পাণ্ডিত্য, যা বাক্‌শক্তি, যা অত্যাশ্চর্য্যকর সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল, তার জন্যে তাঁর বন্ধুরা তাঁর কাছে যা আশা করেছিলেন, তা তিনি পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। কিন্তু বন্ধুদের আশা কে পূর্ণ করতে পারে। তাহলেও ইংরাজী সাহিত্যভাণ্ডারে তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভার দান অক্ষয় হয়ে আছে—খামখেয়ালী আফিম-মোহগ্রস্তের ছন্নছাড়া জীবনের কথা।

Grasmere গ্রামের মধ্য দিয়ে মোটর চল্ল। চার্চ্চের সামনে এসে একটু থামল। এই গির্জ্জার সমাধি-ভূমিতে Wordsworth ও Colerideগএর সমাধি আছে। তার পর একটি ছোট গেটের কাছে মোটর আবার থামল। এটি wishing gate,—সবাই মনে মনে কিছু ইচ্ছা করে। আমি মনে মনে ইচ্ছা করলুম,—আবার যেন এই সুন্দর হ্রদের দেশে আসি,—একা নয়, বন্ধুদের নিয়ে আসি।

Grasmere হ্রদের ধার দিয়ে নীলকান্ত-মণির মত Rydal water পার হয়ে Ambleside ছাড়িয়ে যখন Windermere ষ্টেসনে এসে পৌঁছুলুম তখন প্রায় সাড়ে ছ'টা। সবাইএর কাছে বিদায় নিয়ে মোটর থেকে নামলুম।

যে রেস্তোরাঁতে সকালে খেয়েছিলুম, সেইখানে খাওয়া গেল। তার পর আবার হ্রদের দিকে চল্লুম। পাহাড়ঘেরা হ্রদের জল আমায় যেন মোহগ্রস্ত করেছে।

সূর্য্য ডুবে গেছে, কিন্তু চারিদিকে স্নিগ্ধ মৃদুমধুর আলো। এই twilightএর সময়টি বড় সুন্দর। আমাদের দেশে সূর্য্য ডুবে গেলে, গোধূলির আলো চঞ্চলা বধূর মত এক নিমেষের

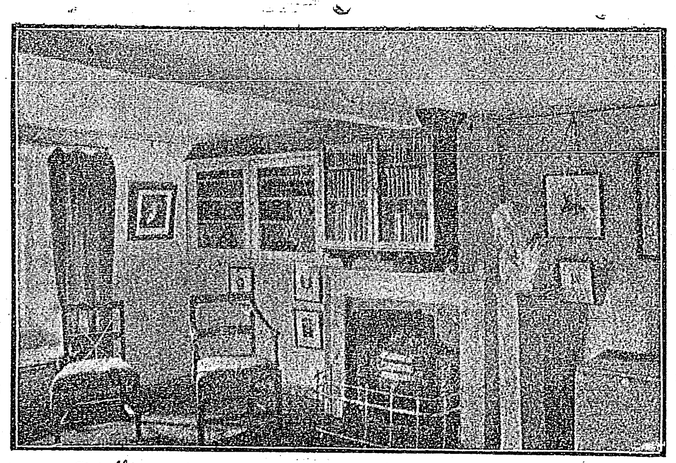

পাঠাগার (ডোভ-কটেজ)

মধুর চাউনি দিয়ে চলে যায়, চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু এ দেশে গোধূলির আলো অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে। স্কটলণ্ডে দেখেছি—রাত বারোটা

পর্য্যন্ত সুন্দর আলো, বেড়াবার বড় সুন্দর সময়। আরও উত্তরে নরওয়েতে গেলে, সেখানে সারা রাত আলো থাকে।

হ্রদের ধারে এসে দাঁড়ালুম। দূরে পাহাড়ের বনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, তার ছায়া জলে পড়েছে। দীঘির কালো জলের মত হ্রদের জল টলমল করছে, আকাশে গোধূলির আলো আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগা শিশুর চাউনির মত। দিনের আলোয় প্রকৃতিকে দেখেছিলুম যেন কল্যাণময়ী কর্ম্মরতা নারী, কিন্তু এ আলো-অন্ধকারের অবগুণ্ঠনতলে প্রকৃতিকে দেখলুম রহস্যময়ী সৌন্দর্য্যময়ী প্রিয়া। হ্রদটি বড় অপূর্ব্ব বোধ হল। মনে হল, যেন একে আগে দেখি নি,—এ যেন রূপকথার মায়া সরোবরের মত;—কখন্ রাজপুত্র সাপের মাথার মণি নিয়ে আসবে, সেই মণি হাতে করে অতল জলে ডুবে ঘুমন্ত রাজকন্যার সাতমহলা সোণার পুরীর সন্ধান পাবে, তার জন্য হ্রদটি স্তম্ভিত হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

এই হ্রদের দেশের শোভ দিনের আলোয় সম্পূর্ণ উপভোগ করা যায় না, দেখলুম, রাতের বেলা তার রহস্য, তার অপূর্ব্বতা, তার স্তব্ধতা মনকে অভিভূত, মুগ্ধ করে। বিশেষতঃ ঝড়ের রাতে মন মোহগ্রস্ত হয়।

পাহাড়ের মাথায় একটি তারা মণির মত জ্বলজ্বল করে উঠল। এই হ্রদের দেশের কবির কথা মনে পড়ল। রূপকথার রাজকন্যার মত এই হ্রদের দেশের সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতিকে তাঁর কল্পনার মণি দিয়ে জাগিয়ে তার রূপকথা তিনি চিরকালের জন্যে লিখে গেছেন। তাঁর কথা স্মরণ করে সুন্দর হ্রদের দেশের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তিনি আর এক ইংরাজ কবি সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, সেই কথাগুলি তাঁর সম্বন্ধেও মনে পড়ল—

"Thy soul was like a star and dwelt apart
Thou hadst a voice whose sound was
lik- the Sea,
Pure as the naked heavens, majestic free."

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর]

প্রণাম

পথের কাহিনী

শ্রীনিরুপমা দেবী

ট্রেণ চলিতেছে। মেয়েদের ইণ্টার্ ক্লাশে ভয়ানক ভীড়। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে গাড়ীখানা বিলক্ষণ তাতিয়া উঠিয়াছে। গতির বেগে কামরার মধ্যে যে বাতাস বহিতেছে, তাহা কিছুমাত্র সুখস্পর্শ নয়। গরমে ছোট ছোট ছেলেরা কাঁদিয়া মায়েদের অস্থির করিয়া তুলিতেছে। ষ্টেশনে যে সময় গাড়ী দাঁড়াইতেছে, সে সময়টা যেন আর যাইতে চাহে না। যাঁহারা নামিতেছেন বা উঠিতেছেন, তাঁহারা একটা উত্তেজনার মধ্যে সে সময়টা কাটাইতেছেন। বাকি লোকেরা তখন একেবারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে।

ক্রমে বেলা একটু পড়িয়া আসিল। ষ্টেশনের হরেক রকম ফেরির সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের দালালগণও বইয়ের বোঝা বা ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া বড় বড় ষ্টেশনগুলায় ফেরি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নব নব পাব্লিশারদের চার আনা, ছয় আনা, আট আনা, দশ আনা, এক টাকা প্রভৃতি সংস্করণের চক্‌চকে—ঝক্‌ঝকে ছবিওলা বই হাতে তাহারা হাঁকিতে লাগিল—"রূপের নির্ঝর" পাব্লিশারের ছাপা, চমৎকার উপন্যাস—দাম এক টাকা! "বাসরের বর" বারো আনা সংস্করণ! "চন্দ্রের লেখা" ছয় আনা! অন্য দল হাঁকিতেছে "পাষাণের রেখা!" "অজানার দেখা!" "হীরকের শাঁখা!" আট আনা—আট আনা! তার পরে "পথিক বঁধু" "ফুলের মধু" "কোণের বধূ" এমন কত অদ্ভুত নামই কানে যাইতে লাগিল।

গাড়ীর এক কোণে কয়েকটি তরুণীতে মিলিয়া নিজেদের একটি দল গঠন করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার মধ্যে একজন তরুণী একটি বালিকার দ্বারা একটা বৈওলাকে ডাকিয়া, অনেকগুলা চক্‌চকে বৈ লইয়া, খানিকক্ষণ দাম-কষাকষি এবং বই ফেরাফেরি করিয়া, শেষে কোন'খানাই তাঁহার মনঃপূত না হওয়াতে সবই ফেরত দিলেন; এবং মন্তব্য করিলেন—"এসব বৈ-ই আমার আছে। যে বইটা খুঁজছি—এদের কাছে নেই!"

"কি বই মা—নামটাই বলুন না, খুঁজে দেখি, যদি থাকে।"

"না, না বাপু, সে বৈ তোমাদের কাছে নেই, সে খুব ভাল বৈ। মলাটটা তার এত সুন্দর—একেবারে সোণালা। আর তার মধ্যে একটা পরী উড়ছে"—বলিতে বলিতে সঙ্গিনীদের পানে চাহিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"তার ভেতরের যা সব ছবি,—একটি যুবতী আর—"

ক্যাবিনের বাহিরে তখনো অনেক লোক চলাফেরা করিতেছে—সেটা হঠাৎ মেয়েটির হুঁস্ হওয়ায়—অর্দ্ধপথে কথাটাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"এ সব বৈ আমাদের সব আছে। আমাদের নিজেদের প্রাইভেট্ লাইব্রেরী আছে কি না—আল্‌মারী ভর্ত্তি ভর্ত্তি এই রকম কত সব বই,—আমি, আমার জা, ননদ সব আমরা দিন-রাতই পড়ছি! যে বই নতুন যখন উঠ্‌ছে, তখনি তা আমাদের কেনা হচ্চে।"

একজন সহযাত্রিনী তরুণী—সম্প্রতি যিনি উক্তা বিদুষীর সখীদল-ভুক্তা,—প্রশ্ন করিলেন, "হাঁ ভাই, সংসারের কিছু কাজ কর্ত্তে হয় না বুঝি তোমাদের?"

"তা হয় বৈ কি! সে অমনি যেমন-তেমন ক'রে সেরে আমরা বই নিয়ে পড়ি! "রূপের হাসি" ব'লে বৈখানা যেদিন প্রথম এল—"

একজন মধ্যবয়সী নারী তাহাদের কতকটা কাছাকাছিই স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একখানা বাংলা 'দৈনিক' মোড়া অবস্থায় রহিয়াছে,—বোধ হয় সঙ্কোচে অথবা ভিড়ের জন্য সেখানা তিনি মেলিয়া দেখিতে পারিতেছিলেন না। আমাদের বিদুষী তরুণীটির সেই দিকে নজর পড়িবামাত্র, নিজের বক্তব্য শেষ না করিয়াই, ছোঁ মারার মত করিয়া তিনি সেখানা হাতে তুলিয়া লইলেন। বারেক সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাচ্ছিল্য ভঙ্গীতে বলিলেন—"ও, খবরের কাগজ? এ আমরা ছুঁই না। কি হবে মিছে সময় নষ্ট

করে? কেবল কে কার ঘটি চুরী করলো—কাকে ধরে জেল্ দিলো—কোন্ গ্রামে কে মলো—কার বৌকে ধ'রে কোন্ শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদে, স্বামীতে মারলো (সে সময়ে "নারী নির্য্যাতন" শীর্ষক প্যারাগ্রাফে বঙ্গবধূদিগের এই সংবাদই বাংলা খবরের কাগজে বেশীর ভাগ প্রকাশ পাইতেছিল। এখনকার হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সঙ্গে জড়িত হইয়া ইহার বীভৎসতা তখনো এতটা বৃদ্ধি পায় নাই।) যত সব বাজে আর মিথ্যে গুজবে কাগজওলাদের দিন গুজরাণ করা বইতো না"—বলিতে বলিতে তিনি কাগজখানির মালিকের কোলে সেখানি প্রায় ছুঁড়িয়াই ফেরত দিলেন।

মহিলাটি একটু হাসিয়া বলিলেন—"না মা, এগুলো যে সত্যি কথা, আমাদেরই ঘরের কথা। এসব না জেনে, যে সব বইয়ের কথা বলছ, সেই সব মিথ্যা গল্পে দিন কাটানোই কি ঠিক্?"

"ঐ সব বানানো কথা সত্যি? কে বল্‌লে আপনাকে? আর সত্যি হলেও, ওতে তো কেবল মন খারাপই হয়। নভেল পড়্‌লে মন কত ভাল হয়! আপনি উপন্যাস কখনো পড়েন নি বুঝি? এখন যে কত সস্তায় কি সুন্দর সুন্দর বই সব পাওয়া যায়, পড়ে দেখবেন দেখি। 'চাঁদের আলো' বলে একখানা—"

"হ্যাঁ মা, তা এই 'চাঁদের আলো' 'রূপের হাসি' এইসব বই-ই কি কেবল পড়? বাংলায় ভাল নভেলেরও তো অভাব নেই! কত বড় বড় লেখকের ভাল ভাল বই আছে—সে সবের তো একখানারও নাম কর্‌ছ না! কেবল এই 'চাঁদের রেখা' 'রূপের লেখা'দেরই নাম কর্‌ছ? বঙ্কিম বাবুর, রবি বাবুর, কি শরৎ বাবুর বই পড় না কি? মেয়ে লেখিকাও এখন আমাদের কিছু কিছু হয়েছেন, —তাঁদের বই—"

"সব পড়েছি আমি—সববারি সব—কিছু আমার পড়তে বাকি নেই।"

"এক-আধখানার নাম করতো বাছা—রবি বাবুর কি অন্য কারো—"

"সে কি বলা যায়? দু'চারখানা প'ড়লে তবে মনে থাকে। বই পাচ্চি আর পড়্‌ছি।" বলিয়া সঙ্গিনীদের পানে সগর্ব্বে চাহিয়া তিনি একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিলেন।

মহিলাটি তবুও ক্ষান্ত হইলেন না; বলিলেন, "এমন অনেক বই আছে, যা যত বই-ই পড় মা, কিছুতেই তাদের ভুল্‌তে পার্‌বে না। যে বই পড়ে ভুলেই যেতে হয়, সে সব বই পড়ার নামই সময় নষ্ট। যা মনে কোন দাগ দিতে বা ভাব জন্মাতে পারে না, তার নাম কি বই? এ সব না প'ড়ে অন্ততঃ খবরের কাগজ পড়লেই ভাল হয়! তাতে—"

এইবার তরুণী খুব উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"খবরের কাগজে থাকে কি পড়ার মত বলুন দেখি। যত সব মিথ্যে কথা আর তিলকে তাল ক'রে বানিয়ে বানিয়ে লেখা" বলিয়া তিনি সদম্ভে সঙ্গিনীদের পানে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মজা শোন ভাই! তাদের মিথ্যে কথার প্রমাণের একটা গল্প বলি শোন! আমার স্বামীর এক বন্ধু—তার বৌটী ভাই ভারি বজ্জাত। তার বজ্জাতির দায়ে স্বামীটীকে মাঝে মাঝে তাকে শাসন কর্‌তে হ'তো! তা কর্‌বে না ভাই? স্বামী যে রকম ভালবাসে, তেমনি তো হ'তে হবে? তা সে মোটেই মানবে না। স্বামী বলবে দক্ষিণ তো সে উত্তরে হাঁট্‌বে। তাই তার বর এক দিন তাকে মার্‌ছে, আর সেই সময়ে তার বাপ না ভাই কে এসে পড়েছিল—এই সে তখুনি গিয়ে পুলিশে জানালে! বাড়ীতে পুলিশ এল। কাগজে এই নিয়ে কত কেলেঙ্কারী বেরুলো। শেষে প্রমাণ হল বৌটারই দোষ! বৌটীকে সেই স্বামীর কাছেই 'থোঁতা মুখ ভোঁতা' ক'রে পড়ে থাক্‌তে হ'ল। বাপ মোকর্দ্দমায় হেরে মুখ চুণ ক'রে ফিরে গেলেন। সে বৌকে কি কেউ ভাল চক্ষে দেখ্‌তে পারে? এখন মার খাচ্চেন, আর প'ড়ে আছেন সেই বরেরই দুয়োরে। সব চেয়ে রাগ ধরে কাগজওলাদের ওপরে—ঘরে লোকের কত কি হয়, তোদের বাবু এত মাথাব্যথা কিসের? তোরা কেন—"

মহিলাটি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"কাগজওলাদের মিথ্যে বলাটা এতে তো প্রমাণ হচ্চে না মা!"

"হচ্চে না? আপনি সব জানেন কি না! সে যে কত বাড়িয়ে কত কি-ই তারা লিখেছিল। শ্বাশুড়ীতে সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, ননদে চুল কেটে নিয়েছে—স্বামী—"

"হ'তে পারে, কথা কিছু বেড়ে গিয়েছিল—কিন্তু মূল কথা তো সত্যি!"

"সত্যি? তিলকে তাল্ করার নাম সত্যি বলেন আপনি?"

বেঞ্চের কোণে আর একটি বিধবা মধ্যবয়সী মহিলা বসিয়া ছিলেন। তিনি এতক্ষণ ইঁহাদের এই বাদানুবাদ একমনে শুনিতেছিলেন। তিনি এইবার উত্তর দিলেন—"বাছা! তিল তাল হয়েছে বলে রাগ করছ—কত জায়গায় যে তাল তিলের মত অস্তিত্বও জগৎকে জানাতে পারে না! জগতে এমন কত অবিচার অত্যাচার যে লোকে নিঃশব্দে সয়ে যাচ্চে, লোকলজ্জার ভয়ে ওষ্ঠাগ্রে আন্‌ছে না, তা কি জান মা? কারো কথা হয় ত একটু বেশী হ'য়ে গেছে,—তেমনি কত মেয়ের দুঃখ যে জগৎ জানেই না। তাদের কথা মনে করে এটুকুতে রাগ কর্‌তে নেই। বিশেষ তোমাদেরই কথা এ যে, তোমরা যদি নিজেদের জাতের দুঃখের কথায় এমন উদাসীন হবে, তবে অন্যেরা হবে না কেন?"

বিরুদ্ধবাদিনী মেয়েটি এইবার যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া "ও বাপু আমরা বিশ্বাস করি না। অত কষ্ট স্বামীতে যে দিতে পারে—"

"হতে পারে মা তুমি সৌভাগ্যবতী, তোমার আত্মীয়ারাও ভাগ্যবতী। কিন্তু জগতে ভাগ্যহীনা কেউ নেই এমন কথা বল্‌তে পার কি?"

তরুণী তখন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "না, তাই বল্‌ছি, যা জানি না—যা দেখি নি, তা কি করে—"

"কেন মা, ঐ যে সব বই পড়্‌ছ, তাতেও তো এ রকম গল্প ঢের পাও। সেগুলো সত্যি ব'লে চোখের জল ফেল, আর কাগজওলারা যা লেখে তাকে মিথ্যে ভাব। মা, জগতে এমন সত্যও আছে যে, বই বা কাগজওলারা তার সন্ধানও জানে না,—অনেকে কল্পনাও করতে পারে না!"

এ তর্কের এইখানেই এইবারে শেষ হইল। এ প্রসঙ্গ লইয়া আর কেহ বাদানুবাদে অগ্রসর হইল না। কেবল সেই মধ্যবয়সী মহিলা দুইটিই ক্রমে ক্রমে উভয়ের নিকটস্থ হইয়া মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। প্রথমার নিকটে আন্তরিক সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্বিতীয়া বিধবা মহিলাটি ধীরে ধীরে যে কাহিনী আরম্ভ করিলেন, তাহার কিয়দংশ আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

ঐ একটী মেয়ে নিয়েই বিধবা হয়েছিলাম। সেই মেয়ের এমন দুরবস্থার খবরে কি যে কর্‌ব দিদি—যেন ভেবেই কূল পাচ্ছিলাম না। বড় সাধ করে বারো বছরে পড়তেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। জামাইটিও রূপে ধনে কুলে সব তাতেই মনের মত হয়েছিল। সেই সাধে এমন বাদ বিধাতা সাধ্‌লেন! মোটে চৌদ্দ বছরের মেয়ে—তাকে এই নির্য্যাতন—এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

বিধবার মেয়ে, ছোট থেকে পরের অনুগ্রহেই প্রতিপালিত। যে মেয়ে আমার মুখ তুলে কখনো কারও অন্যায়ের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত কর্‌তে জানত না,—দূর সম্পর্কের দেওরের ঘরে থাকি,—তারা পর্য্যন্ত যে মেয়ের গুণে তাকে নিজেদের মেয়ের মত করেই যথেষ্ট দিয়ে-থুয়ে ভাল পাত্রে বিয়ে দিয়েছে। সে মেয়ে যে কোন অন্যায় করে এই অবস্থায় পড়েছে, এও কারুরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। দেওর, দেওরপো—তাঁরা বলেন, এখনি গিয়ে নিয়ে আসি, অনিকে কি আমরা দুটো খেতে দিতে পারব না? আমিই কিছুদিন তাঁদের হাতে পায়ে ধরে থামাতে লাগলাম যে একটা কিছু ক'রে ফেল্‌লে সে আর জন্মে মুছ্‌বে না! বিধবার মেয়ে একটু কষ্ট সহ্য করতে শিখুক—সইলেই তাদের দয়া হবে। পরে হয় ত বাড়িয়ে লিখেছে,—মেয়ে তো এ পর্য্যন্ত এক কলমও লেখে নি। তখন কি জানি দিদি, যে, তার এক কলম লেখারও উপায় নেই! আর মেয়েও আমার সয়েই দেখ্‌ছিল দিদি, যে, মানুষের মন থেকে কি দয়া মায়া একেবারেই মুছে যেতে পারে? মানুষ যে বাঘ-সিংহের চেয়েও ভয়ানক তা পরে দেখ্‌লাম। বাঘ-সিংহ তো পশু, তারা আহারের চেষ্টায় প্রাণী-হত্যা করে। আর মানুষ যে বিনা কারণে মাত্র একটা খেয়ালে এমন ক'রে একটা শিশুহত্যা করতে পারে, এ আমারই জানা ছিল না,—তা সে তো একটা কচি মেয়ে, সে সংসারের কিই বা দেখেছে।

শেষে সেই চিঠিও এল। মেয়েই শেষে লিখ্‌লো "মাগো, তোমায় হয় ত আর দেখ্‌তে পাব না,—পার তো আমায় নিয়ে যাও!" এ চিঠি পেয়ে দেওর আর একদণ্ডও আমায় ভাব্‌তে দিলেন না—ছেলে সঙ্গে দিয়ে আমাকেই মেয়েকে আন্‌তে পাঠিয়ে দিলেন। এর আগে দুবার আন্‌তে গিয়েও সে ছেলে ফিরে এসেছিল। আমার মুখ চেয়ে চল্ল আবার আমার সঙ্গে। আমি যেতে

তাদের কিন্তু খুব অবাক্ বোধ হল না,—তারাও যেন এই রকম প্রতীক্ষা করছিল! প্রথম দিন তো মেয়ে কোথায় জান্‌তেই পার্‌লাম না! জমীদার-বাড়ীর চাকর-দাসীরা তো কথাই কয় না। শেখানো কি না জানি না,—মেয়ের কথায় বলে আমরা জানি না। বেহান্, যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে খানিক ভদ্রতার ভাষায় "কি সৌভাগ্য আমাদের—আপনি পায়ের ধূলো দিয়েছেন" ইত্যাদি ব'লেই অন্তর্ধান কর্‌লেন! কেউ জল খেতে দিতে আসে, কেউ "স্নান কর" বলে,—মেয়ের কথা কেউ বলে না! মেয়ে কি তবে আমার নেই? শেষে গিন্নির একটা মেয়ের হাত জড়িয়ে ধর্‌তে, সে বল্‌লে "বৌ তো এখানে নেই, আমার দিদির বাড়ীতে আছে!" "সে কতদূর? আমাদের ঠিকানা দাও, আমরা যাই। না যদি বল, আমরা জল গ্রহণও কর্‌ব না, তোমাদের বাড়ী ধন্না দিয়ে বসে থাক্‌ব।" তখন বল্লে "আন্‌তে লোক গেছে, কাল আস্‌বে।"

সেই 'কাল' এল, তবু মেয়ের খোঁজ পাই নে। শেষে বাড়ীর অন্য একটী বৌ, আমার অবস্থা দেখে, নিঃশব্দে এসে আমায় হাতছানি দিয়ে একটী মহলে ডেকে নিয়ে গিয়ে, একটী ঘর দেখিয়ে দিয়ে তেমনি নিঃশব্দে পালালো। সেই ঘরের দিকে যেতেই শুন্‌তে পেলাম, ঘরের ভেতর কার ওপর কে যেন তর্জ্জন কর্‌ছে, আর অতি ক্ষীণ শব্দে কে যেন গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌ছে। প্রাণ আমার বুকের ভেতর যেন ধড়ফড় ক'রে উঠল—এই কি আমার বিধবার একমাত্র ধন, অনির গলা?

জোরে দুয়ারে ধাক্কা দিতেই দরজা হাট্ হ'য়ে খুলে গেল—সামনেই বেয়ান! "তুমি এখানে কেন—এখানে কেন" বলে সে যেমন দুয়োর আটকাতে আস্‌বে, আমি অমনি পাগলের মত একছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়্‌লাম! দেখি একটী মরঘাটিতে প'ড়ে থাকার মত বিছানায় তেমনি কালো কাপড়ে ঢাকা আমার অনিলা পড়ে কাঁদছে! তার কাছে আমি বসে পড়তেই—আর আমার মুখ দিয়ে বাক্ সর্‌লো না। এই কি আমার অনি? দুঃস্বপনেও তার এমন চেহারা যে কল্পনা করতে পারি না। আর কপালে গালে মুখে সর্ব্বাঙ্গে সে কি কালো কালো দাগ—যেন কাল্‌শিরে পড়ে গেছে। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে আমিও নির্ব্বাক্—আর মেয়েও যেন অজ্ঞান হয়েই গেল। মাগী তো আর কথা না ক'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত দিন মেয়ে কোলে ক'রে বসে রইলাম। শেষে আমার ওপর হুকুম এল—"গেরস্ত বাড়ী, খাবে তো খাও; নৈলে মেয়ে নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে।" মনে হ'ল, একেবারে নিয়েই বেরিয়ে যাব। মেয়ের মুখে শুন্‌ছি—জামাই এর মধ্যে নেই। সে একেবারে যাকে বলে 'ভাল ছেলে'! মার কাজের ওপর, কথার ওপর কথা কইবে, তেমন "স্ত্রী-বশ" নয়! এ শুনেও একবার মনে হ'ল, হয় ত সে এত কাণ্ড জানেও না—জমীদারের ছেলে,—বাইরে থাকাই দেখছি এদের রীতি। যদি তাকে সব জানিয়ে বুঝিয়ে মেয়ের অবস্থা একটুও ফেরাতে পারি। নিয়ে গেলে যদি জামাই জন্মের মতনই ত্যাগ করেন! মেয়ের মা আমি—এতে যে মেয়ের মরণ সমান অবস্থা করেই নিয়ে যাব! মান-অপমান দূরে রেখে সেই চণ্ডালের অধমদের বাড়ী জলগ্রহণও কর্‌লাম দেওরপোর অমতে! তার পরে দুদিন ধরে জামায়ের সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য, একটি কথা কবার জন্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম। যারা মেয়ের এই অবস্থা আমাদের জানিয়েছিল, তাদের হাতে পায়ে ধর্‌তে লাগ্‌লাম,—তারা এ সাহস কিছুতে কর্‌তে পার্‌লে না! বল্লে, "নিতান্ত মেয়েটি ম'রে যায়, তাই কোন রকমে তোমাদের জানিয়েছি। নিজের সন্তান চাও তো নিয়ে পালাও, ঘর-বরের আশা ক'র না। গিন্নি জানতে পার্‌লে আমাদের জ্যান্তে পুত্‌বে।"

মেয়ের অপরাধের মধ্যে মেয়ের রং একটু শ্যামলা—তা তারা দেখেই তো নিয়ে গিয়েছিল! গিন্নি সুন্দর বৌ আন্‌বেন বলেই না কি এই পীড়ন ধরেছেন। কর্ত্তাও আগে এর মধ্যে ছিলেন না, এখন ক্রমে গিন্নির পরামর্শে এই মতেই এসেছেন। শেষে যেদিন প্রকাশ্যে আমি জামাইকে ডেকে দেবার জন্য একজনকে বল্লাম, তখনি হুকুম এল, আপনারা আপনাদের মেয়ে নিয়ে চলে যেতে পারেন। মেয়ে সেই দুদিনে মায়ের কোল্ পেয়েই বোধ হয় একটু সাম্‌লেছিল। তখন দুরন্ত বর্ষা,—মেয়ের ওপর হুকুম হয়েছিল, নীচে থেকে জল তুলে ওপরের জালা ভর্‌তে! মেয়ে ভিজে কাপড়ে ভিজে মাথায় তাইই কর্‌ছিল! আঁচলে মুখ ঢেকে বল্‌লে 'মা, তুমি চ'লে যাও, আমি যাব না।' আমিও "তাই ভাল" ব'লে চোখ্

ঢেকে সেখান থেকে স'রে এসে দেওরপোকে গাড়ী আন্‌তে বল্লাম।

গাড়ী এলে উঠতে যাচ্ছি—এমন সময় দেখি, দুটো দাসী দুহাত ধরে অনিকে প্রায় টেনেই এনে আমার কোলে ফেলে দিল। প'ড়ে গিয়ে ঠোঁট মুখ কপাল সব কেটে গেছে—রক্তে কাপড় মাখামাখি! ওপর থেকে গিন্নির গর্জ্জন কানে আস্‌ছে—মাকে দেখে সোহাগ ক'রে পড়া হ'ল! নিয়ে যাক্, এক্ষুনি বিদেয় হোক ও কাল্ পেত্‌নি! দাও ওকে গাড়ীতে তুলিয়ে,—খবর্দ্দার যেন আমার বাড়ীতে আর মুখ না দেখায়। মেয়ের মুখে হাত দিয়ে দেখি—ঠিক যেন অজ্ঞান। আমার ইচ্ছে যে একটু জ্ঞান করে রেখে তবে আসি। দেওরপো বল্লে "হয় অনিকে নিয়ে চল, নয় ত এখনি গাড়ীতে ওঠ,—এ যন্ত্রণা আর দেখ্‌তে পারি না।" অগত্যা কোল থেকে তার মাথা নামিয়ে ওপরের দিকে বেহানের উদ্দেশে যোড় হাত করে বল্লাম—"মারতে হয় রাখ্‌তে হয় তোমার জিনিষ তুমিই রাখ" বলে গাড়ীতে উঠ্‌লাম। তখনো দেখছি—ঝি দুটো গিন্নির হুকুম মত অনিকে ছেঁচ্‌ড়াতে ছেঁচ্‌ড়াতে গাড়ীতে তুলে দিতে আস্‌ছে; আর মেয়ে তাদের পা চেপে ধর্‌ছে আর বল্‌ছে "আমি যাব না, আমি যাব না।"

আমি গাড়ীর বার্ বন্ধ করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখি জামাই, বোধ হয় তার মায়েরই আদেশ মত, আমার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে এসে, নিতান্ত ভাল-মানুষটির মত গাড়ীর বার্ ধরে দাঁড়িয়ে "আপনি যাচ্চেন! আমার প্রণাম করা হয়নি!" বলে আমায় প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিতে হেঁট হচ্চে! আমি তখন একেবারে পাগলের মতই "নরেশ, নরেশ—এতক্ষণে তোমার আমার সঙ্গে দেখা করার কথা মনে হ'ল? একেবারে সম্বন্ধ শেষ হবার সঙ্গে? তোমারই হাতে যে আমার বিধবার একমাত্র ধনকে দিয়েছি। তুমি তাকে রাখ—তাকে ত্যাগ কর না—বল তোমার মাকে—"ব'লে চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লাম! আর আমার বুকে যে যন্ত্রণা ধর্‌ছিল' না!

দেওরপো আমার মুখ চেপে ধ'রে চুপ্ চুপ্ করতে লাগল। 'আর জামাই, একবার আমার দিকে, একবার 'হাড়কাঠে পড়া পাঁঠার মত' অনির দিকে তাকিয়েই ছিট্‌কে কোন্ দিকে যে পালিয়ে গেল, আর তাকে দেখতে পেলাম না। তার পরে তারা ধরাধরি করে কখন্ যে অনিকে গাড়ীতে আমার কাছে তুলে দিয়েছে, তা জানি না। গাড়ী থেকে যখন ট্রেণে উঠ্‌ছি, বেহাইয়ের একটা লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে বল্‌লে, "বৌয়ের হাতে আমাদের দেওয়া চুড়ি আছে, সেগুলো খুলে দেন্।" দেওরপো গাড়োয়ানের হাতের চাবুক কেড়ে নিয়ে তাকে ক' ঘা চাবুক কস্‌তেই সে ছুটে পালালো। আমি বল্লাম, "দিলে না কেন চুরি ক'গাছা।" দেওরপো ধমক্ দিয়ে বল্লে, "সে আমি বুঝ্‌ব!"

বাড়ীতে পৌছুলে দেওর বল্লেন "মোকর্দ্দমা আন্‌ব।" আমি বলি "না না, আমরা তো কিছু করি নি, তারাই জোর করে তুলে দিয়েছে। জামাই এখন স্বাধীন নয়,—যদিই ভবিষ্যতে সে স্ত্রীকে মনে করে—মোকর্দ্দমা কর্‌লে আর তো তা সম্ভব হবে না,—মোকর্দ্দমায় কাজ নেই।" এই গোল্‌মালে কদিন গেল। ওমা দেখি, তারাই উল্টো চার্জ্জ এনেছে, "মেয়ে জোর্ করে উঠিয়ে আনা, মায় তাদের দেওয়া গয়না সুদ্ধ।" দেওর বল্লেন "দেখ্‌লেন বৌঠাক্‌রণ, আপনার বুদ্ধিতে অনিকে আমরা যে দুহাজার টাকার গয়না দিয়েছি, তা, আর তার খোর্‌পোষের দাবীর আশাও গেল।"

মোকর্দ্দমায় আমাদের বড় কিছু করতে পারলে না; তবে তাদের সেই চুড়ি ক'টা ফেরৎ দিতে হল—আর আমাদের মোকর্দ্দমা করারও উপায় রইল না। মেয়ের সর্ব্বস্বই যখন গেল, তখন ক'টী চুড়ি আর এমন কি—আর তা আমার বিষের মতই লাগ্‌ছিলো—স্বচ্ছন্দে খুলে তা ফেলে দিলাম। কিন্তু সে চামাররা তখন বল্‌লো কি—মেয়ের হাতে সোনা-বাঁধানো লোহা আছে, সে গাছিও দিতে হবে—নরেশের নতুন বৌয়ের হাতে পরাতে হবে।

অনি হঠাৎ জেদ্ ধরে বস্‌লো—"লোহাটা আমি কিছুতেই দেব না—এর বদলে আমার দু হাজার টাকার গয়না দিয়ে দিলাম।" এত ব্যাপারে যে মেয়ে মরার মতই এক ধারে পড়ে ছিল—একটি কথাও যে কয় নি, সে এই লোহা দেবার কথায় বাঘের মতন গর্জ্জন করে উঠ্‌লো! কিছুতেই তাকে লোহাগাছ খোলাতে পারি না। অন্য লোহা এনে সাম্‌নে ধরি—সে নিজের হাত বুকের মধ্যে চেপে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে!

তার এই কাণ্ড দেখে বাড়ী সুদ্ধ লোক কেঁদে আকুল। কিন্তু সে পাষাণদের প্রাণ গল্‌লো না! তারা কেবলই দেওরকে উত্যক্ত কর্‌তে লাগ্‌লো। দেওর খুব কঠিন ধাতের পুরুষ। তিনি শেষে জোড়হাত ক'রে তাদের বল্লেন "আপনারা ঐ সোনার দাম নিয়ে আমায় ওগাছি ভিক্ষে দেন্—মেয়েটা আমাদের মরেই যাবে দেখ্‌ছি। এই দয়াটুকু করুন।" শেষে তারা এমন অপমান তাঁকে করতে লাগ্‌লো যে, দেওর তখন ছুটে এসে বল্লেন "অনি—ছি—তোর ঘেন্না হচ্চে না? এই চামারদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে তুই এমন করছিস্? জানিস্ সীতার মত সতীও এত অপমান স'ন্ নি? তুই কি সতীর মেয়ে সতী নস্?"

অনি এইবার আস্তে আস্তে উঠে বসে তার হাতের লোহা গাছটা খুলে তার কাকার হাতে দিলে। তার পরে আস্তে আস্তে আঁচল দিয়ে সিঁদুর ঘ'ষে তুলে ফেললে। আমি হাত ধরতে যাচ্চি—এমন ভাবে হেসে সে আমার মুখপানে চাইলে—উঃ দিদি, সে মুখ বুঝি জন্মে ভুল্‌ব না! বল্লে "কেন মা আবার হাত ধর্‌ছ? তাদের সম্বন্ধ যখন তারা খুলেই নিয়ে গেল, তখন কেন আর এ চিহ্ন?"—তার পর আমার বুকে প'ড়ে বল্‌লে "কেন মা কাঁদছ? আমি তোমার সেই দুবছর আগের অনি! আইবড় অনি। সেই হতে আর সে সিঁদুর পরে না—আল্‌তা পরে না—চুল বাঁধে না—পাণ খায় না। তার কাকিমা যদি বলে "আইবুড় মেয়ে কি এসব করে না?" সে কেবল একটু হাসে।

শোকবিধুরা মাতা একটু থামিয়া যেন দম লইলেন। যিনি শুনিতেছিলেন, তিনি অনুভূতির অশ্রু মুছিয়া বলিলেন "মেয়ে এখন কোথায় দিদি?"

"আমাদেরই কাছে। তার কাকা আর দাদা তাকে পরের অনুগ্রহে চিরজীবন কাটাতে দেবেন না বলে' নিজেরাই ঘরে ম্যাট্রিক্ পর্য্যন্ত পড়িয়ে পাশ দিইয়ে বি-টি পাশও করিয়েছেন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় হ'তে। সে পাশ্ দিয়েই বেশ ভাল কাজও পেয়েছিল;—আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ২।৩ যায়গায় মেয়ে স্কুলের মাষ্টারীও সে কর্‌লে। কিন্তু তার শরীর ভাল নয়। কি যে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে তার, এই বারো বছরেও তার আর সংশোধন হ'ল না। আর আমারও এখন তীর্থস্থানে থাক্‌তেই মন চায়। অনিও টিচারীতে সুখ পেল না। বলে "মা এতেও যায়গায় যায়গায় বিব্রতে পড়্‌তে হয়। আমরা হিন্দু-সমাজের ভেতরই আছি, অথচ এরকম স্বাধীন জীবিকা নিয়েছি—এ যেন আমাদের দেশের লোক এখনো বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারে না! সমালোচনার বক্র ইঙ্গিত দাঁড়াও, পুরুষরা যেন বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে আসেন। যাঁদের সমাজে এটি চলেছে—যেমন ব্রাহ্ম বা কৃশ্চান মেয়েদের—তাঁদের বোধ হয় এ ভোগ ভুগতে হয় না। তোমায় নিয়ে কাশীতেই থাকি চল। সেখানেও এ কাজ করতে পার্‌ব। না হয় আমাদের যা আছে তাতেই মায়ে ঝিয়ের চ'লে যাবে। বেশী টাকার দরকার কি আমাদের?" তাই আজ দুবৎসর কাশীতেই আছি। পশ্চিমে গিয়ে মেয়ের শরীরটাও একটু ভাল হয়েছে; আর তার বিদ্যেও অসার্থক হয় নি। কাশীর থিয়জফি সোসাইটিতে যে মেয়ে-ইস্কুল আছে, তার কর্ত্রী মিস্ আরেণ্ডলের সঙ্গে কলকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্রীর খুব পরিচয়। তিনি অনিকে খুবই ভালবাসতেন। মিস্ আরেণ্ডল্‌কে লিখে তিনিই অনির সেখানে শিক্ষকতা জুটিয়ে দিয়েছেন। সোসাইটীর গাড়ীতে মেয়েদের মধ্যেই অনি যায় ও আসে। সেখানের বন্দোবস্তও খুব ভাল। দু একজন ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের মেয়েরা পর্য্যন্ত ইচ্ছে করে সেখানে বাংলা সংস্কৃত এসব পড়ান। আমার খুড়শাশুড়ী—দেওরের মা—তিনিও আমার কাছে কাশী বাস করছেন; আমরা তিনজনে বেশ শান্তিতেই ছিলাম দিদি—কিন্তু এটুকুও আমরা বোধ হয় পাবার যোগ্য নই—তাই ভগবান তাতেও অশান্তি ঘটালেন।"

"কেন দিদি, সেখানে আবার কে তোমাদের এ স্বস্তিটুকুও নষ্ট করলো?"

"যারা আমার আর অনির জীবনের ধূমকেতু—তারাই। সেও এক বিধির আশ্চর্য্য যোগাযোগ। নিজের মেয়ের কথা নিজের মুখে কি বল্‌ব দিদি—সকলের সেবা করে তার যেন তৃপ্তি হয় না! আমি, আমার খুড়শাশুড়ী—আমাদের কথাও যদি ছেড়ে দিই,—যারা ওর কাছাকাছি থাক্‌বে, তাদেরই সে এত যত্ন আর নানারকমে সেবা কর্‌বে যে, সকলে অনিলা বল্‌তে অস্থির হয়ে উঠ্‌বে। আমাদের পল্লীটায় যত বাড়ী আছে—সবারি সঙ্গে অনির কি যে ভালবাসা—তার আর ছোট বড় নেই। কাশীবাসিনী কত বুড়ী যে এই দুবছরে অনির চেনা হয়ে গেছে, কত ছেলে মেয়েরই যে সে মাসি

পিসি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে পাড়াখানির তা কি বল্‌ব! অনিকে দুদিন না দেখতে পেলে তারা বার বার খোঁজ নিতে আস্‌বে। ইস্কুলের মেয়েদের, আর অনির সহকর্ম্মী যাঁরা তাঁদের, তো কথাই নেই। মেম্‌রা পর্য্যন্ত কি যে ভালবাসেন! যাক্' এসব বলে আর কথা বাড়াব না দিদি—আসল কথাটা বলি।

একদিন রবিবারে অনি খুড়িমার সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গেছে, এমন সময়ে মোটা থপ্‌থপে মতন একটী বিধবা মেয়েমানুষ সিঁড়ি থেকে গড়াতে গড়াতে অনির সামনেই আর একটু হলেই জলে পড়ে যাচ্ছিল। আপনার প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে সে মেয়ে কি করে যে তাকে সাপটে ধরে তাকে জলে ডুবে মর্‌তে দেয় নি—সে কথা বল্‌তে গিয়েও খুড়িমা শিউরে ওঠেন। অনি সুদ্ধ আর এক চুলের জন্য জলে পড়ে নি। ঘাট সুদ্ধ লোক হাঁ হাঁ করে উঠ্‌লো,—এমন কাজও করে!—ঐ পড়ন্ত অত বড় লাশকে আটকাতে গিয়ে, একফোঁটা মেয়ে—তুমি যে বাছা কুটোটির মতই পিষে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুবতে! কিন্তু মেয়ে সে সব কথা, কি নিজের আঘাতের দিকে নজরও না করে (মেয়েরও বড় কম লাগে নি ত! সর্ব্বাঙ্গে কালশিরে পড়ে গিয়েছিল সেই লাশকে আটকাতে গিয়ে, আর তার পড়ার বেগের সঙ্গে নিজেও দু তিন উল্টান খেয়ে।), সেই মেয়েমানুষটিকে নিয়েই একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লো! তার মাথা কোলের মধ্যে নিয়ে "ভয় কি মা, আর ভয় নেই" বলে ভরসা দেয়, আর মুখে-চোখে জল দেয়—ঘাটোয়ালের কাছ থেকে পাখা চেয়ে নিয়ে বাতাস করে। ঘাটের লোকও তখন অনির সাহায্য করে। শেষে ডুলি আনিয়ে কত কাণ্ড ক'রে তাকে বাসায় পৌঁছিয়ে দেয়। মাগীর পুণ্যি এই ছিল যে, হাত পা মাজা ভাঙেনি। কিন্তু মাথায়ও আঘাত লেগেছিল খুব, আর গতর চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

বাসাতেও তার আপনার লোক কেউ নেই, কেবল ঝি চাকর আছে দেখে, অনি তখনি সেইখানে বসে ডাক্তার আনিয়ে তার সেবা শুশ্রূষার, চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তো মাগীর তেমনি জ্বর এসে তাকে যেন অজ্ঞানই করে দিল। তার মধ্যেই সে অনির গলা ধরে "মা আমার অন্নপূর্ণা—আমায় ছেড়ে তুমি যেয়ো না—আমায় খ্রিষ্টানের জল খাইও না—যদি বাঁচালে তবে এটুকুও বাঁচাও" বলতে লাগ্‌লো। মাগীর পয়সা আছে বুঝে নার্সের ব্যবস্থা হচ্ছিল; কিন্তু তার কাতরোক্তির দায়ে অনিই দু চারদিন দেখ্‌তে রাজী হ'ল। ডাক্তার এই বলে ভরসা দিচ্ছিল যে, "বিপদের আশঙ্কা নেই—এ একটা শক্।"

অনি তো তার মাথার কাছে দিব্যি আসন গেড়ে নার্স হ'য়ে বস্‌লো! খুড়িমা তখন তার ঝি চাকরের কাছে তার পরিচয় শুনে, কাঁপতে কাঁপতে এসেই আমায় বল্লেন, "ও বৌমা, এ কাকে অনি বাঁচিয়েছে? যে তার সর্ব্বনাশের মূল, তাকেই! এ যে অনির শাশুড়ী!" বারো বছর দেখা নেই—আর অনিও তখন ছেলেমানুষ—মাগীরও তখন সধবার অন্য রকম ছিরি ছিল,—অনি চিন্‌তে পারে নি। সন্ধ্যাবেলা তাঁর সঙ্গে আমিও গিয়ে তাকে দেখে চেহারায় তেমন কিছু চিন্‌তে পার্‌লাম না! পারবই বা কেন? যেদিন তার সঙ্গে আমার দেখা, সেদিনের দেখা যেমন বাঘের আর ছাগলের দেখা! ছাগল কি তখন তার চেহারার দিকে কোন লক্ষ্য রাখ্‌তে পারে? আমার তখন এই দ্বন্দ্ব মনে চল্‌তে লাগ্‌লো যে, অনিকে চিনিয়ে দিই কি না! শতবার মনে হচ্ছিল তাকে হাতে ধরে উঠিয়ে নিয়ে আসি,—থাক্ মাগী অমনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে! আবার ভাবি, বিশ্বনাথের ধামে এসে এমন হীন কাজ কর্‌লে তাঁকে কি জবাব দেব?

রাত্রিটা তো অনির জন্য আমারও থাক্‌তে হ'ল সেখানে। সেই বারো বছর আগে তার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ক'রাত্তির থাকার কথা মনে পড়ে রাত্রে ঘুম আর হল না! সমস্ত রাতই মাগী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আর অনিকে দেখে—"মা অন্নপূর্ণা মা আছে আমার শিয়রে বসে! মা জল দাও" এমনি করে। সকালে ডাক্তার এসে যখন বল্‌লে—"এঁর আপনার লোক কেউ থাকে তো খবর দিতে হয়,—ব্যাপারটা সহজে কাট্‌বে ব'লে মনে হয় না।" তখন অনি "আপনার কে আছে" জিজ্ঞাসা করায়, সে তো "আমার কেউ নেই, আমার বিশ্বনাথ আছেন, আর অন্নপূর্ণা মা এই যে তুমি আছ" এই রকম আধ বেঠিক রকমের কথা কইতে লাগ্‌লা। ঝি চাকরকে ডেকে তখন অনি পরিচয় নিতে বসলো! আমি উঠে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে বস্‌লাম! পরিচয় শুনে অনির কি রকম মুখ হবে, সে আমি যে চোখে দেখ্‌তে পারবো না! খানিকক্ষণ পরে শুন্‌লাম, অনি চাকরের হাতে টেলিগ্রাম লিখে পাঠালো। আর যা যা

করবার—বেশ সহজ ভাবেই ক'রে যেতে লাগ্‌লো! আমার ক্রমে তখন কেমন একটা অসহ্য ভাব আসায় ঘরে গিয়ে বল্লাম—"ইস্কুল কামাইও কর্‌তে হবে না কি এঁর জন্যে?" অচলস্বরে অনি বল্‌লো "হ্যাঁ, যতক্ষণ না এঁর আপনার লোক কেউ আসে। একখানা চিঠি লিখে দিচ্চি মা, ঝিকে দিয়ে ইস্কুলের গাড়ীর কোচ্‌ম্যানকে দিইও,—আর দুপুরে তাকে পাঠিও, তাঁর সঙ্গে গিয়ে খেয়ে আস্‌ব।"

আরও দিন-দুই দিনরাত আমাদের এই রকম ভোগেই কাট্‌লো। গিন্নির অবস্থা একই রকম। সেদিন সকালে খুড়িমা অনিকে রাত্রে আগ্‌লে চলে আসার খানিক পরেই দেখি, অসময়ে অনি চলে এসেছে।

"এখনি এলি যে! রোগী কেমন আছে?"

"আজ তো একটু ভালই দেখাচ্চে, ডাক্তারও তাই বল্লে।"

অনিকে ইস্কুলে যাবার জোগাড় করতে দেখে বল্লাম—"আজ ইস্কুলেও যেতে পার্‌বি না কি? ওখানে কে থাক্‌বে?"

"রোগিনীর ছেলে বৌ এসে পৌঁছেচেন!" আর আমি কথা কইতে পার্‌লাম না। অনি কিন্তু অবিকৃত মুখে খেয়ে-দেয়ে স্কুলে চলে গেল। বিকেলে দেখি, তাদের ঝিয়ের সঙ্গে একটি গয়না-গাঁটি, কাপড়-চোপড়-পরা বৌ এসে দাঁড়াল। আমরা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছি দেখে ঝিই বল্‌লে—"গিন্নিমা যে আপনার জন্যে ভারী অস্থির কর্‌ছেন দিদিমণি- সবাইকে বল্‌ছেন খিরিশ্চান্। অন্নপূর্ণো মার হাতে নৈলে দুধ খাব না, জল খাব না—এই বলে জেদ্ ধরে মুখ টিপে আছেন। আপুনি না গেলে তো গিন্নিমা মারা পড়েন। দাদাবাবু তাই বৌ ঠাক্‌রুণকে আপনাকে ডাক্‌তে পেঠিয়ে দিলেন। বল্লেন এত করে যখন আপুনি বাঁচিয়েছেন তখন আরও দুদিন দেখে তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে যান। গিন্নিমাকে কিছুতেই খাওয়াতে পারা যাচ্চে না, সেই আপুনি আসার পর থেকে দাঁতে দড়ি দিয়ে আছেন।"

রাগে তখন আমাদের শরীর জ্বলে উঠ্‌ল। মনে হল বলি দুকথা। কিন্তু তখনি মনে পড়্‌ল, তাহলে আমরা কে, তা যে এখনি ধরা পড়্‌বে। সে যেন আমাদের পক্ষে বড়ই ঘৃণার, বড়ই লজ্জার কথা—এমনি মনে হল। কি বলি কি করি ভাব্‌ছি—এমন সময়ে দেখি, দিব্যি অম্লান মুখে অনি সেই ইস্কুলের ফেরত্ একটু জলও মুখে না দিয়ে তাদের সঙ্গে উঠে চল্‌লো। খুড়িমা গোঁ গোঁ করে বলে উঠ্‌লেন "মলো হতভাগী—মুখে একটু জল দে।" অনি—তাঁর কথা পাছে তাদের কানে যায়—এমনি ভাবে জোরে বলে উঠলো—"ঘণ্টা খানেক পরেই ঝিকে পাঠিও মা! ওঁকে খাইয়েই ফিরে আস্‌ছি।"

ঘণ্টা দুই পরে অনি ফিরে এলো। এসেই মুখ হাত ধুয়ে "শীগ্‌গির খেতে দাও মা, উঃ, যে ক্ষিদে"—বলে শুয়েই পড়্‌লো প্রায়। খুড়িমা গজ্‌গজ্ কর্‌তে কর্‌তে খাবার দিতেই শুয়ে শুয়েই সে খেতে লাগ্‌লো। আমি কেবল তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম! খুড়িমা বলে উঠ্‌লেন "এইবারে এ দেবসেবায় ইতি দাও—বুঝেছ গো সেবাব্রতা? লজ্জা কর্‌ছে না, ঘেন্না হচ্চে না তোর?" "ঘেন্না হবে? কেন?" খেতে খেতে অনি উত্তর কর্‌লো। "কেন?" "তা না তো কি! দেবসেবা না হোক্ নরসেবা তো বটে।" "খিশ্চানের সেবা! পেত্‌নির সেবা!" "আহা কেন মিছে বক ঠাকুমা,—আজ দুদিন পা টিপে দিতে পাই নি,—সন্ধ্যে করা হয়েছে—এইবার ছুঁতে পারি তো? চল তোমার পদসেবার ছলে তোমার বিছানায় গড়িয়ে নিইগে ঠাকুমা!"

খুড়িমা যত রেগে রেগে ওঠেন। অনি এমনি করে সব উড়িয়ে দেয়। শেষে তিনি তাকে আঁটতে না পেরে, উঠে যেতেই, অনি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি একটিও কথা কইতে পার্‌ছি না—অনি বুঝেছিল। প্রথমটা সহজ সুরে বল্লে "মা, ঠাকুমা আর তোমার ফলটল আনানো আছে? এ দু' তিন দিন আমি তো কিছুই খোঁজ রাখি নি। কাপড় ছেড়ে এসে ঠাকুমার জলখাবার জোগাড় কর্‌ছি, তুমি সন্ধ্যা সেরে নাও।" তবুও আমি উত্তর দিতে পারি না দেখে তখন আমার কাছে বসে পড়ে অনুনয়ের সুরে অনি বল্‌লো—"মা, তুমিও ঠাকুমার মত অবুঝ হয়ো না। এসব মানুষের কোথায় মনে আসে? যেখানে কোন সম্বন্ধ থাকে! একটা মানুষ আমার সাম্‌নে পড়ে মারা যাচ্ছিল—আমার হাত দিয়ে ভগবান তাকে বাঁচিয়েছেন! সে রোগী বিকারের ঘোরে আমার একটু সেবা চাচ্ছে—আমি সেটুকু দিতে তাকে বাধ্য। সকালে বিকেলে এই রকম আরও দু চারদিন আমায় যেতে হবে। এর জন্য কেন মন খারাপ কর্‌তে হবে? ছিঃ!"

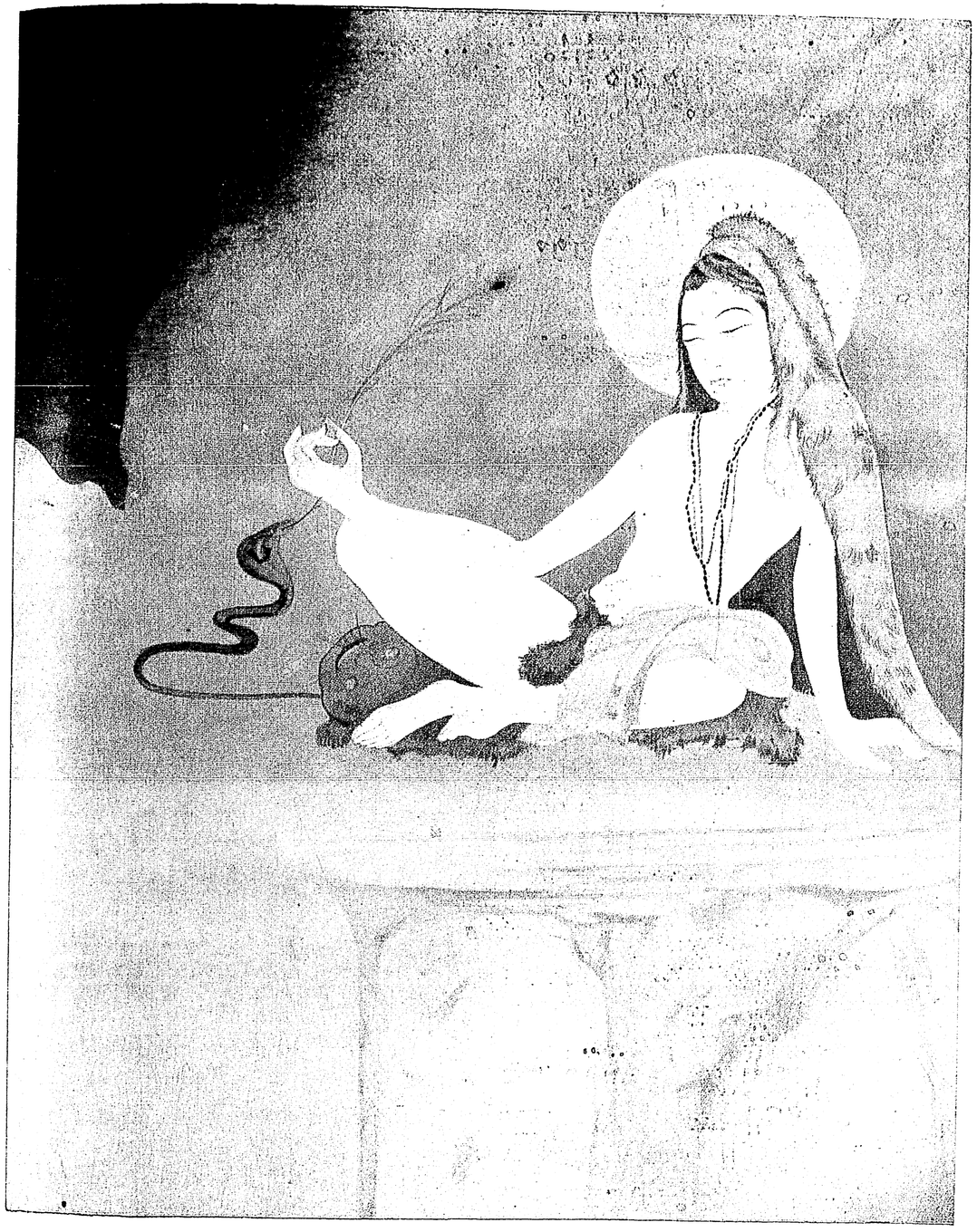

বিরহী শিব

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

একটু পরে বল্লাম—"অনি, তুই এ কথা বল্‌তে পারিস্—কিন্তু আমি যে পারছি না।" "ওকথা বলো না মা, শুন্‌তেও আমার কষ্ট হবে। আর ওদের ঝিটি মাঝে মাঝে আস্‌বে। যদি আমাদের পরিচয় টের পায়, সেই হবে বড় লজ্জার কথা! মন থেকে ও-কথাটি এতদিনে কেন মুছ্‌তে পার নি মা? ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? ভুলে গেছ কি সব? যাক্—আমি দিনকতক গিন্নিকে না দেখ্‌লে অমনুষ্যত্ব হবে মা। বিশেষ সত্যিই উনি আমার হাতে ছাড়া খাচ্ছেন না।" "অনি—অনি! অথচ ওই যে তোর শনি? ওই যে—ভগবানের এ কি খেলা!" "তাই-ই না হয় মনে কর মা! উনি একটা নিরপরাধ প্রাণীকে যন্ত্রণা দিয়েছিলেন—ভগবান তাই এইটা ঘটিয়েছেন। শুধু তাই না। সেই বৌ নিয়েও ওঁর সুখ নেই। ছেলে-বৌর ওপর রাগ করেই উনি এভাবে একা তীর্থবাস কর্‌ছেন! প্রায়শ্চিত্ত মনে কর তো অনেকটা তাঁর হয়েছে বৈ কি। তবে আমাদের এ সব কিছুই মনে না করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব মা।" আমি থাকতে পার্‌লাম না—"এইটুকু-মাত্র ওর প্রায়শ্চিত্ত অনি? কখনই নয়! একটা জীবনকে শুধু যন্ত্রণা দিয়েছে মাত্র ও? একেবারে নিষ্ফল করে হত্যা করে দিয়েছে যে! অকারণে শিশুর মত নির্দ্দোষ প্রাণকে হত্যা করার পাপের ওর এইমাত্র প্রায়শ্চিত্ত?"

"একেবারে অজ্ঞান, একেবারে শিক্ষাহীন আমাদের দেশের মেয়েরা মা! তাই তাদের দ্বারা এ-রকম ঘটে! তাদের এ জ্ঞানের অভাব আমাদেরই কলঙ্কের কথা মা! এর কুফলের অংশ এমনি করেই আমাদের কারও ভাগ্যে পড়ায় তাকে তা বহন করতে হচ্ছে। জীবন বিফল কি বলছ? ভগবানের করুণা থাকলে মানুষের শত অত্যাচারেও সে জীবনের সার্থকতা কেউ নষ্ট করতে পারে না। ওঠ মা তুমি, আমরা মানুষের মত হই যেন। এ আলোচনা আর না।"

দু তিন দিন পরেই শুন্‌লাম, গিন্নি এ যাত্রা বেঁচে গেল। তার ছেলে-বৌ তখন বোধ হয় দেশে যাবার জন্য ব্যস্ত;—মতলব, অনি তার মার কাছে থেকে তাকে দেখে-শুনে। তারা শুনেছে—অনি ইস্কুলে পড়ায়। নিশ্চয় আমাদের অভাব আছে—অতএব এমন স্থলে এ কথাটা পাড়া শক্ত কি? আমাদের সমাজের এমনি ধারণা, এমনি শিক্ষাদীক্ষা। তাই এক দিন—অনি তখন ইস্কুলে—গিন্নির ছেলে সেই—কি বল্‌ব, তার নাম ধর্‌তেও ইচ্ছে করে না যে—এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে অনির তো শত সুখ্যাতি,—"তিনি দেবী, নৈলে নিজের প্রাণের পর্য্যন্ত আশঙ্কা না রেখে এমন করে পরকে বাঁচান্। আর তাঁর সেবারই কি সুন্দর ক্ষমতা—কোন নার্সকেও এমন সেবা করতে দেখি নি। আমার মা যে তাঁর 'অন্নপূর্ণা' নাম দিয়েছেন—এ একেবারে জ্বলন্ত সত্য! আমার মা, যিনি নিজের ছেলে-বৌর হাতেও আচারের জন্যে জলগ্রহণ করতে চান্ না, সেই মা ওঁর হাতের পথ্য ভিন্ন কিছু মুখে কর্‌ছেন না—এমনি দেবীর মতই পবিত্র ওঁর চেহারা। সেই জন্যই বল্‌ছিলাম কি এত দয়া যখন আপনারা করেছেন"—ইত্যাদি অনর্গল যখন বলে চলেছে,—আমি তো ঘরের ভেতরে কাঠের মত হ'য়েই অনির জীবনের পরম দুর্ভাগ্যের মুখে এই সব কথা শুনে যাচ্চি—কিন্তু খুড়িমা আর সইতে পার্‌লেন না! সাপের মত ফণা তুলে বলে উঠ্‌লেন "কি বলছ তুমি নরেশ? কাকে এ কথা বল্‌ছ? তার ইস্কুলের কাজে দুমাস ছুটি নিয়ে তোমার মাকে দেখ্‌বে,—আর সে ক্ষতি তুমি ডবল করে পুষিয়ে দেবে? তার ক্ষতি তোমরা পুষিয়ে দিতে পারবে? এমন ক্ষমতা আছে কি তোমাদের? জানো সে কে? কে তোমার মাকে সেদিন বাঁচিয়েছে? তারপর পরিচয় জেনেও সত্যিই দেবতার মতই কর্ত্তব্যই সে করে যাচ্চে? কোন দেবতাও কি এমন করে তার পরম শত্রুকে দেখ্‌তে পেরেছে? কোন পুরাণ-ইতিহাসেও এমন কথা নেই বোধ হয়। তাকেই তুমি পারিশ্রমিক দিয়ে মাইনে দিয়ে তোমার মার সেবা করাতে চাও? জানো সে কে?"

আমি তো একেবারে জমে যেন পাথর হয়ে গেলাম। খুড়িমা কর্‌লেন কি! অনির এ কি লজ্জা ঘটালেন তিনি? নরেশ কিন্তু একেবারে যেন স্তম্ভিত হয়েই তাঁর কথাগুলো শুনে গেল। তার পরে খুব ব্যগ্রভাবে বারে বারে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগল—"কে তিনি? বলুন কে তিনি?" খুড়িমা দ্বিগুণ গর্জ্জন করে বলে উঠ্‌লেন—"কে তিনি? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর গে যাও! জগতে সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ কারও যদি তোমরা মায়ে-বেটায় ক'রে থাক, তো তার কথা মনে ক'রে দেখগে। যাও, তুমি শীগ্‌গির চলে যাও, অনির আস্‌বার সময় হয়েছে। তোমাদের পরিচয় দেওয়া হ'য়ে গেছে—সে এ কথা শুন্‌লে হয় ত এখনি আমাদের

কাশীবাসের শাস্তিটুকুও ঘুচে যাবে। যা হয়েছে—এত দিন অজান্‌তে যা করেছ, করেছ—এখন তো জান্‌লে—অনি কে! এখন যাও, আর এসো না।"

নরেশ তো নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। খানিক পরেই অনি এলো। আমি চাপ্‌তে পার্‌লাম না, বলে ফেল্লাম সব কথা। সে শুনে খানিক চুপ ক'রে থাক্‌লো মাত্র, বাঙ্‌-নিষ্পত্তি করলে না। তারপরে একটু জিরিয়েই সংসারের কাজে লেগে পড়্‌লো—যেন কিছুই হয় নি। আমি মা—আমারই আশ্চর্য্য লাগ্‌ছিলো তার অম্লান পরিবর্ত্তনহীন মুখের ভাব দেখে।

দিন দুই পরে—অনি তখন ইস্কুল থেকে এসে মুখ-হাত ধুচ্চে,—দেখি, নরেশ এসে একেবারে খুড়িমার পায়ের কাছে আছড়েই পড়্‌লো—"আমাদের মত কাজ আমরা করেছি! এখন আপনাদের মত কাজ আপনারা করুন। কাল মা আমার কাছে এই কথা শোনার পর থেকে সেই যে দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে অছেন—কেউ একবিন্দু জলও খাওয়াতে পার্‌ছি না। এই সবে ভাল হয়ে উঠ্‌ছেন—এই চব্বিশ ঘণ্টার অনাহারে কতক্ষণ বাঁচ্‌বেন! আমায় মাতৃহত্যার পাপ থেকে বাঁচান্।" খুড়িমা তাকে দেখে আবার চটে উঠে বল্লেন—"তোমার এ কথা বল্‌তে লজ্জা কর্‌ছে না?" সে আবার বল্লে—"না। তবে আমায় পাপ থেকে বাঁচান—এ কথাটা বলা আমার অন্যায় হয়েছে। আপনারা যে প্রাণী এক-বার বাঁচিয়েছেন, তাকে আবারও বাঁচান্—এই কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।" খুড়িমা তখন একটু নরম হ'য়ে বল্লেন—"এ কথা তুমি তাকে বল্‌তে গেলে কেন?" "ইচ্ছে করে বলি নি—তাঁর জিদে বাধ্য হয়েই বল্‌তে হয়েছে। তিনি—"

এই সময়ে অনি তাকে আর কথা কইতে না দিয়ে বলে উঠ্‌লো "আপনি যান্,—আমরা যাচ্ছি একটু পরে।" নরেশ তো মাথা গুঁজে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে চলে গেলো। আর আমরা আবারও একটু অবাক্‌ই হলাম। সত্যই কি অনি জীবন থেকে ওদের কথা এমনি ক'রে মুছে ফেল্‌তে পেরেছে? নরেশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ-বোধটাও কি তার মনে আসে না একবার? সে তো মাথায় কাপড়ও তুল্‌লো না,—একটু সঙ্কোচ কি বেদনার একটু আভাসও তো তার মুখে বা ব্যবহারে প্রকাশ পেল না? অথচ আমাদের এই হিন্দু ধর্ম্মের বিয়ে—এ তো 'নয়' ব'ল্লেই 'না' হয়ে কিছুতেই তো যায় না! সমাজে আইনে কোথাও তো এর ছেদ নেই,—ধর্ম্মে তো নেই-ই! আমরা রাগ ক'রে স্বীকার না কর্‌লেও,—নরেশ তো অনির স্বামী,—এর তো নড়চড় নেই, অনি কি তা জানে না? তবে সে এমন উদাসীন হ'ল কি করে? সত্যি দিদি, আমি যেন এতেও সুখী হচ্ছিলাম না। অনিকে একটু বিষণ্ণ বা বিমনা দেখ্‌লেই যেন ব্যাপারটা সঙ্গত বলে আমার মনে হ'ত! তার এ অস্বাভাবিক ভাব আমারও কোথায় যেন বাধ্‌ছিল। যে মেয়েকে আমার মায়ের মনও আদর্শ মেয়ে বলে বুকে ধরে, সেই বুকে যেন কোথায় কি বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল। অনি ঠিক হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে, খুড়িমা রেগে উঠে গিয়ে তাঁর আহ্নিকের আসনে বস্‌লেন। "ঝির সঙ্গে কি গেলে কি ভাল দেখাবে মা?" আমি নিঃশব্দে তার সঙ্গে বেরুচ্ছি—দেখি, খুড়িমা তখন মুখ ভার করে উঠে চাদর গায়ে দিলেন। আমিও বেঁচে গিয়ে ঘরে এসে ঢুক্‌লাম।

ঘণ্টা খানেক পরেই দুজনে ফিরে এসে নিজের নিজের যায়গায় ঢুকলো। আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তেও ভাল লাগ্‌ছিলো না; কিন্তু খুড়িমা যেন হজম কর্‌তে পাচ্ছিলেন না। নিজেই খানিক খানিক ক'রে বলে যেতে লাগলেন "কি কাণ্ড—ওঃ! সত্যি মাগী যেন মর্‌বে বলে সঙ্কল্প করেছে! কিছুতেই খাবে না, অনিও ছাড়্‌বে না! বলে—'তাহ'লে ডাক্তার আর নার্স আনিয়ে জোর ক'রে নল্ দিয়ে আপনাকে খাওয়াবো। কিছুতেই আপনি আত্মহত্যা কর্‌তে পাবেন না।' এই যে তখন মাগীর কান্না! 'কেন মা আমায় বাঁচাচ্ছো? আমি যে তোমার পরম শত্রুরও বেশী! ভগবান তোমারি হাতে আমায় এমনি ক'রে বাঁচিয়ে শেষ প্রায়শ্চিত্তও করাচ্ছেন! তোমাকে তাড়িয়ে নতুন বৌ ঘরে এনে, সে পাপের ফলও হাতে হাতে ফলেছে। পাঁচ বছর না যেতে স্বামী গেল,সোণার প্রতিমা মেয়ে বিধবা হল—বছর না ঘুর্‌তে সেও গেল। তার পরে, এই বারো বছরের মধ্যে, সাজানো ঘরকন্না, ছেলে, বৌ, নাতি, নাতনি—সব থাকতেও অনাথার মত কাশীতে পড়ে আছি। সেই ছেলে পর হ'য়ে গিয়েছে। শেষে, যার আমি সর্ব্বনাশ করেছি, সেই তুমিই কি না কাশীতে অন্নপূর্ণা হয়ে আমারই জন্যে বসেছিলে? এ মুখ আমি আর কারুকে দেখাব না মা,—আমায় কেন খেতে জোর কর্‌ছ? বিশ্বনাথ কেন আমার জ্ঞান করালেন? কেন

আমি সেই সিঁড়ি থেকেই পতিত-উদ্ধারিণী মা গঙ্গার কোলে লুকুতে পেলাম না? তোমার কাছে—তোমার মা-ঠাকুমার কাছে—আমায় মুখ দেখাতে হ'ল?' মাগী যত কাঁদে, আমি তত মনে মনে বলি, বৌমা—'বেশ হয়েছে! তোমার এটুকুও বিশ্বনাথ কর্‌বেন না? এ তো লঘু দণ্ডই হয়েছে।' কিন্তু অনি তাকে কি বল্‌তেই দেয়? বল্লে 'হয় আপনি খান, নয় আমি নার্স আর ডাক্তার আন্‌তে পাঠাই!' মাগী তখন আর কি করে—ঐ-সব ব'লে ব'লে কাঁদে, আর ঢক্ ঢক্ ক'রে অনির হাতে দুধ খায়! জল খায়! অনি তার এত কথায় না রাম না গঙ্গা একটী উত্তরও দিলে না,—যেমন খাওয়া শেষ হল, আর অমনি উঠে বল্‌লো 'আমি সমস্ত দিন মেয়ে ইস্কুলে পড়াই, সময় আমার বড্ড কম। আপনি যদি নিজে না খান্, তাহলে রোজ আমায় ইস্কুল থেকে ফিরে কি ইস্কুল যাবার আগে এমনি ক'রে এসে আপনাকে খাইয়ে যেতে হবে। এতে আপনারও কষ্ট, আমারও কষ্ট! এ-রকম আর করবেন না দয়া করে, বুঝ্‌লেন? আমি এখন আসি।' এই বলে অনি মাগীর হাউ হাউ কান্নার মধ্যেই উঠে এসে আমায় বল্লে 'চল ঠাকুমা।' আর জানো বৌমা—বাড়ীতে তার ছেলে কি বৌ কাউকে দেখ্‌তে পেলাম না। ঝি চাকর সবাই জেনেছে দেখ্‌ছি। বুড়ো ঝিটা হাত দিয়ে ইসারা ক'রে দেখালে—বৌ ঐ ঘরে দুয়োর বন্ধ করে আছে সমস্ত দিন না কি। মাগী ইসারা ক'রে আরও কি বল্‌লে বুঝ্‌তে পারলাম না ঠিক,—বরের সঙ্গে রাগারাগি কাঁদাকাটিও চল্‌ছে বুঝি—"

আমি আর সইতে পার্‌লাম না—"চুপ করুন খুড়িমা, অনি শুন্‌তে পেলে রাগ কর্‌বে।" বলে তাঁকে বাধা দিলেও, তিনি আরও একটু না বলে উপসংহার কর্‌লেন না—"মানুষ এমন অমনিষ্যিও হয়! তা যেমন সংসারে পড়েছে! এই নিয়েও তোর হিংসা কর্‌তে লজ্জা কর্‌লে না? আমরা বেরিয়ে চলে আস্‌ছি—তখন দেখি, তোমার জামাই বাড়ী ঢুক্‌ছে।" আমার জামাই! খুড়িমা এ কি বল্‌ছেন? অনি সম্বন্ধ স্বীকার করছে না ব'লে মনে লাগ্‌ছিলো; কিন্তু খুড়িমার এ কথাটা কাণে তপ্ত শূলের মত বিঁধবামাত্র, অনির কথাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন অনুভব কর্‌তে পার্‌লাম।

যাক্—মাস খানেক্ আমাদের আবার নিরুপদ্রবেই কাট্‌লো। আকস্মিকের এই অশান্তিকর ঘটনাকে আবার আমরা আস্তে আস্তে ভুল্‌তে আরম্ভ করেছি—এমন সময়ে মনে আছে, একটা রবিবারে একখানা পাল্কী এসে আমাদের দুয়ারে থাম্‌লো। তার মধ্য হ'তে নরেশের মা একটী ঝিয়ের কাঁধে ভর দিয়ে নাম্‌লেন। আমরা কি যে কর্‌ব, ভেবে পাই না। বাড়ীতে যে মানুষ এসেছে, তার সঙ্গে অমানুষের ব্যবহারও করা যায় না। আবার কি ক'রে যে তাকে আগ্রহ করে হাত ধরে এনে বসাই—সে যেন মহা সমস্যাই হ'ল আমাদের। তবুও তা কর্‌তেই হ'ল; কেন না, মানুষটা ঝির কাঁধে ভর দিয়েও টল্‌ছিলো। তখনো সে যে সম্পূর্ণ সবল হয় নি, তা বেশ বুঝা গেলো। কিন্তু যার জন্য তাঁর সঙ্গে আমার এ সম্পর্ক—সে'ই সব সমস্যার সমাধান ক'রে দিলে। অনি তাকে 'আসুন' বলে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে আসন পেতে বসালো।

"এখনো সম্পূর্ণ সারেন নি দেখ্‌ছি, এখনি কেন বেরিয়েছেন" বলে তাকে অনুযোগ করতেই, অনির হাত ধরে মাগীর যে কান্না, সে একেবারে পাগলের মতই। অনেক করে অনি তাকে থামাতে লাগ্‌লো। আর আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিলাম যে, একটী পথের পথিক এমন ক'রে কাঁদ্‌লে অনির চোখে জল ধর্‌তো না—আর এই মানুষটার এত কান্নায়ও যে পাষাণ মেয়ের চোখে এক-ফোঁটা জলও এল না? সত্যি কথা যদি বলি—আমাদেরও মুস্কিল লাগ্‌ছিলো তার দুঃখে চোখে জল আসায়। তবু জল না এসে কি থাকে? সে যা'-ই করে থাক,—মানুষ তো? মানুষের কান্নাটা তো মিথ্যা নয়!

যাক্—তার পরে সে অনিকে একেবারে কোলে টেনে নিয়ে এই জেদ্ ধর্‌লো—"মা আমার কাছে চল! আমি যা করেছি তার তো সব প্রায়শ্চিত্ত করা আর আমার হাতের মধ্যে নেই,—তবু আমার সেই মরা মেয়ে রাণী হয়ে তুমি আমার কোলে থাক্‌বে চল। আমি নরেশকে আবার আনিয়ে আমার যত স্ত্রী-ধন সব লেখাপড়া কর্‌লাম তোমার নামে। কর্ত্তা আমায় পয়সার অভাব তো দিয়ে যান্ নি। তোমার মত দেবতা মেয়েকে যেমন আমি বধ করেছি, তেমনি ভগবান আমায় সাজা দিয়েছেন। এবার যাকে এনেছি, সে আমার উপযুক্ত বৌই এসেছে। আর সেই ছেলে কি না বৌয়ের পক্ষ হয়ে আমায় বলে—"এটাকেও

কি তেমনি কর্‌তে চাও না কি? এবার আর তা হবে না।" সেই রাগে আমি আমার সোণার রাজত্ব ফেলে একা কাশীতে এসে আছি। আজ আমার মনে হচ্ছে ছেলে কিছু অন্যায় কথা বলে নি। যখন এ বৌর সঙ্গেও বন্‌লো না, তখন এবার আমারই সরা উচিত বৈ কি। তোমাকে এমন করার দুঃখ ছেলের মনে নিশ্চয়ই আছে,—নৈলে ও-কথা বল্‌বে কেন। উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে—মাথার ওপরে আমাদের মত ডাকাত মা বাপ,—তাই বোধ হয় ভয়ে ভয়ে আবার বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছিল। এখন আমার মনে পড়ছে—সে বিয়ের সময় ছেলের একটুও ফুর্ত্তি দেখি নি। কিন্তু তখন—রাক্ষুসী আমি তাকে চেয়েও দেখেছিলাম! এখন আমি ডাক্‌তেই ছুটে এসে হাসিমুখে সব ঠিক্ করে দিলে! সঙ্গের পুরোনো চাকরটীর মুখে শুন্‌লাম—বৌ এটুকুতেও না কি—"

রেলের মতই গিন্নির কথার আর এতক্ষণ শেষ হচ্ছিল না,—এইবার গলার স্বরের একটু মন্দা প'ড়ে আস্‌তেই আমি এতক্ষণে কথা ক'য়ে বললাম "আপনি এ-সব এখন আর কেন কর্‌ছেন? আমার মেয়েকে আপনারা চেনেন্ না। সে মানুষের কর্ত্তব্যটুকুই মাত্র করেছে,—আপনার বিষয়ের জন্যও নয়,—কিম্বা আপনারা বলেও নয়! আপনাকে সে চিন্‌তোও না। একটী পথের পথিক এমন অবস্থায় পড়লে সে যা কর্‌তো তাহাই মাত্র করেছে।"

গিন্নি আবার হাউ হাউ করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে "তা কি আমি বুঝি নি বেয়ান্, না, নরেশই বোঝে নি? আমরাও কি ঐ হাড়হাবাতের মেয়ের মত ভাব্‌বো, যে, এ সব জেনেশুনে মন ভোলাবার জন্যই বৌমা করেছেন? উড়ে এসে জুড়ে বসে সর্ব্বস্বের মালিক হয়েও তার এমনি হিংসুক আর নীচ স্বভাব। বৌমা যদি আমায় চিন্‌তে পারতো তাহলে বোধ হয় আমায় তখন হাত দিয়েও ছুঁতো না, আমি জলে পড়েই মর্‌তাম!"

খুড়িমা এ কথাও সইতে পারলেন না; বল্লেন, "তাও মনে ক'র না,—অনি তেমন ধাতের মেয়েও নয়। তাহলে কি তোমার পরিচয় জেনেও তোমার কাছে দু তিন দিন রাত কাটিয়ে তোমার ছেলেকে টেলিগ্রাম করিয়ে আনিয়ে তবে তোমার বিছানা থেকে ওঠে! একটী পরের জন্যও সে যা করতো, এখানেও তাই করেছে।"

"কিন্তু মা পরে তো তার এমন সর্ব্বনাশ করে নি, তাদের উপকার সে কর্‌তে পারে। কিন্তু আমি যে তার পরম শত্রু। আমায় কেন সে তখনি ফেলে রেখে উঠে এল না? কেন আমার ছেলেকে খবর দিয়ে, সেবা-যত্নের সব ব্যবস্থা করে তবে এলো? কেন আমায় অনাথার মত মর্‌তে দিল না? আমি এখন তো আর ছাড়্‌ব না তাকে, আমার কাছে তাকে থাক্‌তেই হবে।"

অনি মাথা হেঁট করে একভাবেই চুপ করে বসে ছিল,—আমিও তার এখনকার মনের ভাব বুঝ্‌তে পারছিলাম না; তবু নিজের আত্মমর্য্যাদাতেই আমি বল্‌লাম "তা আর সম্ভব নয়।"

"তুমিও এ কথা বলো না বেয়ান্! আমার রাণী চলে গিয়েছে, আমার এখন আর কেউ নেই। আমায় অনাথ বলে দয়া কর।" বল্‌তে বল্‌তে মাগী আমার দুহাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো। আমারও আর তখন বাক্ সরলো না। মনে হল, দুঃখের আগুনে খাদ পুড়ে গিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব এমনি করেই সোণার মত খাঁটি হয়। অনি কিন্তু এক ভাবেই চুপ ক'রে মাথা হেঁট করে রইলো। শেষে গিন্নি একটু সাম্‌লে নিতে, বল্‌লে "আপনি আজ বাড়ী যান। আমার যা বলবার আছে কাল বল্‌ব।"

গিন্নি যেন একটু খুসি হ'য়ে বল্‌লো "কাল বল্‌বে কি মা, কাল আমি তোমায় কোলে করে নিয়ে যাব। বেয়ান্—মা, আপনারাও আমার ওপর একটু দয়া কর্‌বেন। আর বেশী কি বল্‌ব—বল্‌বার আমার মুখ কোথায়!" আর বেশী উত্তেজনা সে বেচারা বোধ হয় সইতেও পারছিলো না। উঠে পড়ে আমাদের আড়ালে ডেকে বল্‌লে "কাল নরেশই এসে নিয়ে যাবে। আপনারা আগে থাক্‌তে কিছু বল্‌বেন না যেন বৌমাকে!"

কি আর বল্‌ব! একবার ভাব্‌ছিলাম, অনিকে বলি, আমার মনে হচ্ছিল দুই বিয়ে তো আমাদের ধর্ম্মেও অচল নয়। যদি ওরা এমনি ধরপাকড় ক'রে অনিকে খানিকটা সংসারী করে করুক! আমরা কি চিরদিনই বেঁচে থাক্‌ব?

পরদিন সকালে অনেকটা বেলা হ'তেও অনি ঘর থেকে বেরুচ্ছে না দেখে ডাক্‌তে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখি নরেশ! আর আমায় অনিকে ঘর থেকে ডাক্‌তে যেতে হ'ল না। অনি আপনিই ঘর থেকে বেরিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো! এ কে? এই কি আমার অনি? একেবারে খালি হাত—

চুড়ি ক'গাছাও হাতে নেই! খান-পরা, মায় চুলগুলো পর্য্যন্ত ছেঁটে ফেলেছে। আমি "অনি এ কি রে?" ব'লে চেঁচিয়েই প্রায় কেঁদে উঠ্‌লাম। অনি এসে আমার মুখে হাত দিয়ে বল্‌লে "ছি মা, চুপ কর, এখনি লোক জমে যাবে। যে দিন ওঁরা আমার লোহাগাছি পর্য্যন্ত খুলে নিয়েছিলেন, সেই দিনই আমার এই রকম বেশ করা উচিত ছিল, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল আমি কুমারী! কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি—না, আমি বিধবা!" তার পরে নরেশের দিকে অকুণ্ঠিত মুখে চেয়ে বল্‌লে "আপনি গিয়ে আপনার মাকে বলুনগে। তিনি যেন বৃথা দুঃখ আর না করেন।" নরেশ একটী কথাও না ক'য়ে, খানিকক্ষণ ধরে অনির সেই বিধবার চেহারার দিকে চেয়ে থেকে, শেষে তেমনি ভাবেই চলে গেল। আমি তো অনিরই মা—তবু আমার প্রাণের ভেতরও নরেশের সেই মুখটা কিছুদিন ধ'রে যেন কিছুতেই মুছছিলো না।

যাক্। আমার যে নতুন করে কতখানি যন্ত্রণা বাড়্‌লো, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝ্‌বে। অনি যে স্বামী থাক্‌তেও বিধবা—এ দৃশ্য পর্য্যন্ত সে নতুন ক'রে আমার চোখের ওপর ধর্‌লো। আমার কষ্ট দেখে সে জোড় হাত ক'রে বললো—"মা, আমায় মাপ কর। তোমায় আমি অনুপায় হ'য়েই এ কষ্ট দিলাম। এ-ছাড়া এ অসম্মান আর অন্যায়ের হাত হ'তে আমার বাঁচার অন্য পথ দেখ্‌ছি না।" আমি একটু প্রতিবাদ কর্‌তে গেলাম। অমনি মেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লে "অন্যায় নয়? তাদের বৌয়ের কথা যেটুকু শুন্‌লে, বুঝ্‌লে না তাতে? আর এ তো অসম্ভব নয়, তার মনে এ তো হবারই কথা। আর আমার কি তোমাদের অন্যায় ও অসম্মান এতে তো আগাগোড়াই মা!"

আর আমি কিছু বল্‌লাম না; কিন্তু তবুও তারা নিবৃত্ত হল না। নরেশ আর এলো না বটে, কিন্তু তার মা তবুও হাল্ ছাড়্‌তে চায় না। বিরক্ত হ'য়ে তখন অনি বল্‌লে—"ভেবেছিলাম, যে মেয়ে বিধবার সাজ পরেছে, তাকে আর জীয়ন্ত ছেলের বৌ ভাব্‌তে ওঁর সাহস হবে না। কিন্তু উনি তাঁর সেই বিধবা মেয়ে রাণীর অনুকল্পের ইচ্ছা তবুও এখনো ছাড়্‌তে পারছেন না। মা, আমায় কাশী থেকে যেতে হলো তাহলে—অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও। আমি কাকা কাকিমার কাছে যাই—উনি তাহলেই এইবার ঠাণ্ডা হবেন।"

অনিকে ছেড়ে কাশীবাস আমাদের সাধ্য হল না। তিনজনেই দেশে চলে এলাম। কত যে কাঁদলে অনির জন্য পাড়ার লোকেরা—অনিও তাদের জন্য চোখের জল ফেল্‌ছে! আমি আশ্চর্য্য হয়েই তার সে চোখের জল দেখ্‌ছিলাম। এই তো অনির মধ্যে সবই আছে,—কেবল ওদের সম্পর্কেই সে এমন পাথর কি করে হল? আমার এমন মমতাময়ী মেয়ের এমন জীবনের প্রধান দিক্‌টাই এমন ক'রে শুকিয়ে কে দিলে? মানুষেই তো কর্‌ল! মানুষে শুধু তার অকারণ হিংসাবৃত্তির উত্তেজনায়ই তো এই কাণ্ডটি করেছে! শ্বাশুড়ী যে বৌকে দেখ্‌তে পারে না, এর কারণ কি সেই বৌই এক দিন শ্বাশুড়ীর আসনের অধিকারিণী হবে বলে? কিম্বা তাঁর প্রিয়তম পুত্রের সব চেয়ে সে প্রিয় হচ্চে বলে সেই হিংসায়? আবার অনেক স্থলে বৌ যে ক্ষমতা পেলেই শ্বাশুড়ীর প্রতি বিদ্বিষ্টা হয়, সেও কি তার বর্ত্তমান পদের তিনিই অতীত অধিকারিণী ছিলেন—এই ঈর্ষার বশে? কিন্তু এতে হিংসার কি আছে দিদি, তাই যে ভেবে পাই না! এই তো প্রাকৃতিক নিয়ম। পুরানো গাছ মরে যায়—নতুন চারা তার জায়গায় রাজত্ব করে। ওষধি গাছগুলো তো কেবল ফলের জন্যেই সৃষ্ট হয়। ছেলে মেয়ে বৌ এদের জীবন গঠন করা, তাদের আর সে সংসারের মূল যাঁরা—সেই অতীত কর্ত্তা বা কর্ত্রীর, শান্তির আর সুখের ব্যবস্থা করা—এরই তো নাম সংসার। এ অযথা হিংসা কেন শ্বাশুড়ীর মনে বা বৌয়ের মনে আসে দিদি? তবে নিজের ছেলেও নেই—বৌও হয় নি, আবার শ্বাশুড়ীও মায়ের বাড়া—সোণার শ্বাশুড়ী পেয়েছিলাম—তাই জগতের এ রহস্য আজ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।

এর পরে জামাই অনিকে একখানা চিঠিও লিখেছিল দিদি। লিখেছিল যে, তোমার স্বামী মরে গিয়েছে,—তুমি বিধবা, কুমারী নও—এটুকু যখন স্বীকার করেছ, তখন সেই মরা স্বামীর সম্পর্কের অধিকারে মৃত শ্বাশুড়ীর স্বেচ্ছায়-দেওয়া ধনে তোমার চির-অধিকার রইলো। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ যখন তোমায় দেব, তখন তুমি এ সম্পত্তির অধিকার নিও। তোমার সেই মরা স্বামীই তোমায় এইটুকু মিনতি জানাচ্চে।"

অনি এর একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না,—চিঠিখানা

পড়েই টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লে। তার কাকা পর্য্যন্ত এ নিয়ে তাকে দু এক কথা বল্‌লে অনি উত্তর দিলে, "কাকা, আপনিই না আমায় সতীর মেয়ে সতী হ'তে বলেছিলেন? সম্পূর্ণ পরের জিনিষে লোভ বা অধিকার নেওয়া কি ও-নামের সঙ্গে খাপ খায়? আপনিও ও-কথা আর আমায় বল্‌বেন না।"

ট্রেণ একটা ষ্টেশনে ঘটাং করিয়া থামিতেই উভয়ে দেখিলেন, কামরা প্রায় জনশূন্য। আপন আপন পথে সকলেই চলিয়া গিয়াছে এবং বক্তৃ মহিলাটির নামিবার স্থান একেবারে সম্মুখে। ট্রেণের গতি বিরামের সেই অবসরে তিনি জিনিষপত্র নামাইয়া নিজে নামিতে নামিতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইল কি না—শ্রোতৃ মহিলাটি এই পথের কাহিনীতে তাহার আভাষ না পাইয়া, বিমূঢ় ভাবে শুধু রেলপথের পার্শ্বস্থিত মাঠের মধ্যের দিগন্তে বিলীন পথের দিকেই চাহিয়া রহিলেন!

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর]

দিদি

দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌধুরী মশাই ছিলেন গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, গলকায় মাতব্বর,—ছ-আনি জমিদার। বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, শিবমন্দির, সটকার মাথায় অনির্ব্বাণ বাড়বানল,—সবই তাঁর ছিল। আর ছিল—তাস, পাশা, অহিফেন, আর সান্ধ্য মজ্‌লিস,—এই চতুর্ব্বেদ চর্চ্চা। অহিফেনটা তিনি আহার করতেন,—সাতসের দুধে দু'ভরি আফিং সুপক্ক হলে, তার সরখানি তিনি ভোগ লাগাতেন, দুগ্ধটা পার্ষদদের মধ্যে অধিকারী-মত বণ্টন হ'ত।

ভৃত্য নন্দার প্রধান কাজ ছিল,—গো সেবা, দুগ্ধ প্রস্তুত আর কল্‌কে বদ্‌লে দেওয়া। আর যে কাজটি ছিল সেটি সে দুধ জ্বাল দিতে দিতেই সেরে রাখতো। কথাবার্ত্তার জবাব সে চোখ বুজেই দিত। চৌধুরী মশায় কখনো কখনো আন্দাজে বল্‌তেন—"নন্দা, ঝিমুচ্চিস বুঝি! খবরদার বেটা, গেরস্তোর দোর-গোড়ায় বসে ঝিমুলে অকল্যাণ হয় জাননা পাজি—দূর করে দেব।" নন্দা চোখ বুজেই বলতো—"আপনি দেখলেন কখন হুজুর!"

কথাটা ঠিক! শুনে চৌধুরী মশাই খুসীই হতেন। বড়-লোকের, বিশেষ জমিদার লোকের, চোখ চেয়ে থাকাটা একেবারেই ভাল নয়,—লোকসেনে লক্ষণ।—প্রজা-বেটারা চোখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে—বাঁধি ব্যবস্থা বিগড়ে দেয়,—মতলব হাসিল করে নেয়। এটা ছিল তাঁর পিতৃ-বাক্য। চোখ চাওয়ার তরে রয়েছে ভস্মলোচনরা—নায়েব, গোমস্তা। থাক্।

চৌধুরী মশায়ের পেয়ারের নাতী ইন্দুভূষণ আজ বেজায় ব্যস্ত। সে লেখাপড়া ছেড়ে এখন লায়েক হয়েছে। এক-খানি নাটক লিখে ফেলেছে—"লক্ষ্মণের শক্তিশেল"। তার রিহার্সেলও চলেছে,—পূজায় নবমীতে অভিনয়। ইন্দু নিজেই ম্যানেজার আর লক্ষ্মণ—দুই। হনুমানের পার্ট সে খুব জমাটি করে লিখে ফেলেছে। সে বলে—কি করে যে এমন ফ্লো (Flow) বেরিয়ে গেছে, সে তা নিজেই জানে না। লেখক-দের নাকি ঝোঁকের মাথায় Feeling (ভাব) এসে ওরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অনেক ঘটিয়ে দেয়।

বীর রসের কথা এলে তার ধমনীগুলো একসঙ্গে ধড়্‌ফড়্‌ করতে থাকে, মনের ভাবগুলাকে ঠেলে বার করে দেয়। লেখাটা ভারি লাগ্‌সাফিক বেরিয়ে যাওয়ায় ইন্দুর মনে বড় একটা আপশোষও রয়ে গেছে—অমন পার্টটা সে নিজে নিতে পারলে না—কেবল হনুমান নামটার জন্যে। বাল্মীকি এত বড় কবি হয়ে একটা ভাল নামও খুঁজে পাননি!

নেপা হনুমানের পার্ট খুব উৎসাহে সখ করেই নিয়েছে,—করেও ভাল। তার ওপর সে ইস্কুলের খেলায় সে-বচর Long jump আর High jumpএ (লাফালাফিতে) পদক পুরস্কার পাওয়ায়—হনুমান সাজবার দাবীও তার এসে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা বিঘ্ন উপস্থিত হয়ে ইন্দুকে বড় বিচলিত করে দিয়েছে। নেপার বিধবা পিসি খড়দায় থাকেন; তাঁর সঙ্কট অসুখ শুনে নেপাকে সেথায় চলে যেতে হয়েছে। আবার—তাঁর শেষ না দেখে তার ফেরবারও জো নেই—হাবাতে মাগীর টাকা আছে। অভিনয়ের সবে আর সাতটি দিন বাকি,—এর মধ্যে কি মাগী সরবে! পাকা হাড়—শ্বাসই টানতে পারে সাতদিন! আপদ দেখ না!

ইন্দু দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। পড়বারই কথা। উত্তরপাড়া একটি উন্নত সমাজ-যায়গা,—সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে অভিনয়। এখনো প্রহসনের প্লটই সে ঠিক্ করতে পারে নি—সেই চিন্তায় মাথা ভরে রয়েছে, তার ওপর নেপার পিসির এই ব্যবহার! তাই সে দলের মাতব্বরদের ডেকে পিসি-সঙ্কট হতে উদ্ধারের একটা উপায় স্থির করবার জন্যে মিটিং কল্ (meeting call) করেছে।

২

চৌধুরী মশাই সপ্তাহকাল কস্ত করে, আজ মরিয়া হয়ে গা তুলে, নিকটস্থ জমিদারিতে দর্শন দিতে বেরিয়ে পড়েছেন—প্রজাদের কাছ থেকে পূজার পার্ব্বনী আদায়ের জন্যে।

ফিরতে—সন্ধ্যার পূর্ব্বে নয়। এই সুযোগ পেয়ে—মিটিংটা আজ তাঁর বৈঠকেই বসেছে;—প্রধান উদ্দেশ্য,—নেপার একজন ডুপ্‌লিকেট্ (duplicate) ঠিক্ করে ফেলা, যে, নেপার অনুপস্থিতিতে তার পার্ট যোগ্যতার সহিত করতে পারে। ভুবন পারে,—অন্তরায় কেবল ওই হনুমান নামটি।

নেপা সম্বন্ধে সন্দেহের কথা আলোচনার পর, সকলে একবাক্যে বললে—"ডুপ্‌লিকেট নিশ্চয়ই চাই।"

ইন্দু বললে—"চাই তো বটেই, কিন্তু ও-পার্ট করবার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে কয়জনের আছে! বইখানির মধ্যে ওই পার্টটিই আমার প্রাণ ঢেলে লেখা, কারণ হনুমানের মত অমন ভক্ত, অতবড় বীর, আর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ত্রেতায় কেউ জন্মাননি। মহাপুরুষের কৃপায় লেখাটাও বেরিয়ে গেছে তেমনি। নেপা সাগ্রহে লুফে নিলে, তাই তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারিনি। অবশ্য সে করেও মন্দ নয়। কিন্তু ও-পার্ট যখন অর্দ্ধেক লেখা হয়েছে, তখন থেকে আমার নজর ছিল ভুবনের ওপর। আমাদের মধ্যে ও-ই ছাত্রবৃত্তি পাস, আবৃত্তি করেও তেমনি, কারণ তার সঙ্গে অর্থবোধ থাকে কি না—পাখীর মত মুখস্থ বলা তো নয়। কিন্তু নেপাকে তখন ক্ষুণ্ণ করতে পারলুম না। এ-কথা সতীশকে privately (গোপনে) বলেও ছিলুম—মনে নেই সতীশ?

সতীশ বললে—"মনে খুবই আছে, আমি তখুনি তোমাকে বলেছিলুম—এটা তোমার দুর্ব্বলতা।"

"কি কোরব ভাই, আমাকে তোমরা ম্যানেজার করেছ,—সব দিক দেখতে হয়। ভুবন কিছু মনে করে তো—সামান্য ইঙ্গিতেই কারণটা সে বুঝতে পারবে। দেখলে না—তাই তাকে অন্য কোনো ছোটো পার্ট দিতেই পারলুম না, promptingএ রাখতে হ'ল, কারণ promptingএর ওপরই সাফল্য নির্ভর করে। আর ওর মত' motion দিয়ে accent ঠিক করে (ঝোঁক দিয়ে সরু মোটা খেলিয়ে) prompt করতে পারতই বা কে?"

নরেশ বললে—"কথা যখন ফাঁশ্ হয়েই গেল—আজ তবে বলি—এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কম মতভেদ হয়নি;—সকলেরি ইচ্ছা ভুবন ও-পার্টটি করে, তা হলে একাই মাৎ করে দেবে, আমাদের actingএর দোষটোস্ সব ঢাকা পড়ে যাবে। ইন্দুর লেখাটা ভুবন একাই সার্থক করে দেবে। কিন্তু ইন্দু যখন হাতজোড় করে বললে—"চক্ষু-লজ্জায় ভুলটা যখন হয়ে গেছে ভাই—এবারটি মাপ করো—দ্বিতীয় opening থেকে ও-পার্ট ভুবনেরই রইলো। এখন change করতে গেলেই একটা মনোমালিন্য ঘটাই সম্ভব।" কথাটাও ঠিক্। নেপা যে রকম মেতে রয়েছে, ও আর এ দিক মাড়াতো না। তাই আমরা চেপে গেলুম। যাক্—এখন দেখছতো বাবা—দশের ইচ্ছা কি বিফল হয়,—হুঁ হুঁ—যাদৃশী ভাবনা যস্য—"

শরৎ বললে—"আর ও-সব দুশ্চিন্তা কেন বাবা,—পিসি তো পথ করে দিয়েছে, এখন তিনি গুটি গুটি দশমীতে চোখ বুজুন, আর নেপা টাকার তোড়া নিয়ে এসে জোড়া পাঁটা ঝেড়ে আমাদের Garden party দিক,—এই প্রার্থনা করি। ভুবন—লেগে যাও ভাই,—তোমার তো সব পার্টই খাড়া মুখস্থ। আমাদের তো memory নয়—সব শক্তিগড়! বাংলায় বাপের নামটাও মনে রাখতে পারি না—পেছনে prompter চাই! যাক্—একেই বলে যোগ্য পাত্রে কন্যা দান। কি বল সব!"

সকলে সহাস্যে শরতের প্রস্তাব একবাক্যে অনুমোদন করলে। একটা আনন্দ-কলরোল পড়ে গেল। তিন পাক্ হুর্‌রে ঘুরে গেল! সকলের চক্ষু ভুবনের মুখের ওপর চম্‌কাতে লাগলো।

ভুবন হাতজোড় করে সবিনয়ে বললে—"আর যা বল, সব করতে রাজি আছি ভাই, কেবল ওই কাজটি ছাড়া। কারে পড়ে—নাপার্য্যমানে একজনের বদ্‌লী-খাটার বিড়ম্বনা আমায় দস্তর-মত ভোগা হয়ে গেছে! মাপ্ করো দাদা,—ওতে আমি আর নেই।"

শুনে সকলে সহসা যেন চোট্ খেয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলো। ইন্দু ব'সে পড়লো। শেষ—ক্ষুব্ধ রোষে বললে—"আমি এখনি 'হনুমান' নামটা কেটে 'মহাবীর' নাম বসিয়ে দিচ্ছি ভাই। যা হয়েছে হয়েছে, এই নাকে কাণে খৎ—রামায়ণ যদি আর ছুঁই। এবারটি মান রক্ষা করে দাও দাদা। ও-পার্ট আর কারুর দ্বারাই ঠিক্ ঠিক্ হবে না।"

"না ইন্দু, ও-কারণে নয় ভাই। আর নয়ই বা কেন,—গ্রামের যে-সব ছেলে তাদের কাছে তো চির-দিনই ওই নাম বাহাল থেকে যাবে। পরিবার থাকলে সেও মুখ পুড়িয়ে সত্যিকার হনুমান বানিয়ে দিতো। ছেলে থাকলে তার সঙ্গীরা তাকে মর্কট্ সাজাবার

দাবী রাখতো,—একপুরুষে মিট্‌তো না। যাক্—তার জন্যে বলছিনা। তোমরা তো জানো—পাশের গ্রামেই আমার মামার বাড়ী, সেইখানেই থাকতুম। সেখানেও সখের যাত্রার ভারি ধুম। দু'বচর আগেকার কথা,—তখন আমাদের রিহার্সেল্ খুব জোর চলেছে,—পালাটা "সীতা হরণ"। সীতা কি রাম লক্ষ্মণ সাজবার মত' চেহারা নয়,—গাইতেও পারি না, সুতরাং সেখানেও আমি ছিলুম "প্রম্‌টার্"। হরিদত্ত সাজবে হরিণ। অভিনয়ের দুদিন আগে—তার হ'ল জ্বর,—কথাটি তো সামান্য নয়—সে যেন রাজপুত্তুরের কলেরা। অবস্থা বুঝতেই পারছো,—সকলেই মহা চিন্তিত।

"ম্যানেজার এসে আমাকে ধরে বসলেন—"তোমাকে "স্বর্ণমৃগ" সাজতে হবে ভুবন।" কেউ আর তখন "হরিণ" বলে না,—সবাই শোনায় "স্বর্ণমৃগ"! অর্থাৎ—খুব সম্মানের পার্ট।

বললুম—"ও-পার্ট, তো যে-সে একবার ওই সোণালী বসানো খোল্‌টায় ঢুকে করে আস্‌তে পারে, ওতে তো আর কথাবার্ত্তা নেই।"

সবাই চক্ষু কপালে তুলে গাঢ়স্বরে বলে উঠলো,—কি বলচো ভুবন! কথাবার্ত্তা নেই অথচ সে অভাবকে ভাবে ভরে দিতে হবে,—সে কি যার তার কাজ—না হরিদত্তর কাজ। তোমার ওপর তাই বরাবরই আমাদের নজর,—intelligent লোক না হলে ও-পার্ট ঠিক্ ঠিক্ করা কি তামাশার কথা। পারেন এক মুস্তপি সায়েব,—আর গার' তুমি,—এ তোমার সামনে বলা নয়।"

ম্যানেজার বললেন—"হরি দত্ত দশ টাকা ঝাড়্‌লে, বললে—তার পরিবার দেখতে আসবে, তাকে একটা কিছু সাজা চাই-ই। কি করি, চক্ষুলজ্জায়ও বটে, আর হার-মোনিয়ামটা সারাবারও দরকার, তাই দিতে হয়েছিল।" ইত্যাদি।

"শেষ হরিদত্তর খোলোস্ আমার স্কন্ধেই চাপলো। বড়লোকের বাড়ী অভিনয়,—বনেদী ব্যবস্থা,—বিপুল আয়োজন। আলোয়, ছবিতে, ফুলের মালায় আসর হাসছে। সে পঞ্চবটী দেখলে রাজার ছেলেরও বনে যেতে সখ্ চাপে। আসরে—আতরদান, গোলাপপাস্, রূপোর থাল্ ভরা পান; ট্রে ভরা—বেদানা, মিছরির টুকরো, আদার কুচি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বচ প্রভৃতি, আর সুগন্ধ ছড়িয়ে সধুম চায়ের যাতায়াত, চামচের ঠুন্‌ঠান্ শব্দ। এতদ্দ্বারা অভিনেতা আর গাইয়েরা গলা বজায় রাখবেন,—আর বাড়ীওলার সম্মান বজায় থাকবে।

"ব্যবস্থা সবই সুন্দর; সকলে গালে দিচ্ছেনও সুন্দর—অর্থাৎ মুটো মুটো—এস্তোক বনবাসী রাম লক্ষ্মণ সীতা,—মায় কন্‌সার্ট পার্টি! অসুন্দর কেবল হরিণের সে-দিকে নজর দেওয়াটা! এক টুকরো মিছরি, দুটি বেদানা, এক কুচি আদা, একটা পান কি এক চুমুক চা, তার ছোঁবার জো নেই, কারণ—সে যে হরিণ! আর intelligent হবার মানেই—স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা, সেটা কেবল হরিণকেই রাখতে হবে। কিছুতে হাত বাড়ালেই—সবাই—হাঁ হাঁ করে ওঠে! তার কাজ কেবল—ছোটা, লাফানো, হাঁপানো, শেষ তেউড়ে পঞ্চত্ব পাওয়া! হোলোও তাই। হরিদত্ত জ্বর হয়ে বাঁচলো,—আর নীরোগ জলজ্যান্তো আমি তার খোলে ঢুকে—সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে মলুম!" Intelligent পশু সাজায় সেলাম্ বাবা!"

হাসির হাউই ছুটে গেল। সবাই বললে—"Bravo ভুবন, এমন বর্ণনা আর কে শোনাতে পারতো! ও পার্ট ভাই তোমাকেই করতে হবে—তা না তো প্লে একদম্ মাটি,—তা লিখে রাখো।"

শেষটা দলের সকলের একান্ত অনুরোধে, আর ইন্দুর কাতর অনুনয়ে ভুবনকে রাজি হতে হল। ইন্দুর দুশ্চিন্তা দূর হল। হুর্‌রের্ হল্লায় সভাও ভঙ্গ হল।

৩

চৌধুরী মশাই আজ বেলাবেলি জমিদারি থেকে ফিরেছেন,—মেজাজ্ খুব খুস্। পার্ব্বনী আদায় হয়েছে পূজার খরচের দেড়া। তাই কাপড় না ছেড়েই সর্ব্বাগ্রে—প্রতিষ্ঠিত শৈলেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম সেরে, বৈঠকে ঢুকেছেন। নন্দা সট্‌কা ধরিয়ে চট্‌কা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে গেল।

ইন্দুভূষণ পাশের কামরায় বসে—প্রহসনের প্লট্ ভাবছে। মাথায় বোমা মেরেও কিছু পাচ্ছেনা। মাঝে আর পাঁচটি দিন মাত্র। পিসির পাল্লা পেরিয়ে শেষ প্রহসন যে মাথায় হুতাশন জ্বেলে দিলে! অন্যমনস্কে পেন্‌সিলটে কামড়ে কামড়ে দাঁতনে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। প্লটের কিন্তু পাত্তা লাগছেনা।

চৌধুরী মশায় আজ মেজাজ "সরিফ্"। ইন্দু তাঁর পেয়ারের নাতী। চৌধুরী মশার মেজাজ মশ্‌গুল থাকলে ইন্দুকে ডেকে কিছুক্ষণ রহস্যানন্দ উপভোগ করতেন। আজো তার ডাক্ পড়লো।

ইন্দুকে উঠে আসতে হল,—কিন্তু বিরক্ত ভাবে।

চৌধুরী মশাই একবার মুখ তুলে চেয়েই—চোখ বুজে সহাস্যে বললেন—"বিকেল বেলা হাতে দাঁতন যে বড়,—রোজা রাখছিস নাকি!"

ইন্দু তাঁর কথাটা আগে বুঝতে পারেনি, পেনসিলটায় নজর পড়তেই বুঝলে। বললে—"আপনি যখন মুক্ত-কচ্ছ হয়েছেন, তখন আমাকে তো ধর্ম্মরক্ষা করতে হবে!"

চৌধুরী মশাই উপভোগের হাসি হেসে তাড়াতাড়ি ভুলটা সেরে নিয়ে,—"জিত" বলেই বালিশের তলা থেকে একখানা দশটাকার নোট বার করে ইন্দুর হাতে দিলেন।

* * * *

তখনকার ন্যাসানাল থিয়েটারে "দুর্গেশনন্দিনীর" প্রথম অভিনয় রজনী। আয়োজনের অন্ত নেই। জগৎসিংহ নাকি ঘোড়ায় চড়ে appear হবে। গ্রামের তালে তালে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, বাগানের ফটকে ফটকে—বড় বড় অক্ষরে সোনার জলে ছাপা "পোষ্টার",—তাতে লেখা—

কে না জানে বঙ্গে রঙ্গে বঙ্কিম লেখনী,
কে না জানে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী

ইত্যাদি।

যাতায়াতের সময়, উঁচু নীচু গ্রাম্য পথে গাড়ি যতবার টক্কর খেয়েছে—ততবারই চৌধুরী মশাই—"খেলে কচু পোড়া" বলেছেন আর চেয়েছেন। সেই সময় ঝক্‌ঝকে হরপের "পোষ্টার"গুলোও এক একবার নজরে পড়েছে,—এক একটা কথা পড়েও ফেলেছেন, সবটা সাপ্‌টাতে পারেননি। তবে—আন্দাজে আর বুদ্ধির জোরে ব্যাপারটা সমঝে নিয়েছেন।

ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"দুর্গেশনন্দী" লোকটা কে হে? দোকানটা কোথায়—বরানগরে বুঝি? বেজায় বেড়ে উঠেছে দেখছি। মেয়ের বিয়েতে সোনার জলে হেঁয়ালি ঝেড়েছে দেখলুম। তেল বেচে,—না? তা না তো এতো তেল!"

ইন্দু হেসে বললে—"নন্দী" কোথায় দেখলেন,—"দুর্গেশ নন্দিনী।"

"ঐ হোলো,—বাংলা বুঝিনারে শা—। না হয় দুগো-নন্দির মেয়ে,—এই তো?"

"না—না, ও একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের নাম। বঙ্কিমবাবুর লেখা। অমন বই পড়েন নি। তার একটু যদি দেখেন, নাওয়া খাওয়া ঘুরে যাবে,—সবটা না দেখে ছাড়তে পারবেন না, অবাক্ হয়ে যাবেন!"

"থাম্ থাম্—নন্দির মেয়ে দেখে ওঁর দাদামশার নাওয়া খাওয়া ঘুরে যাবে,—হ্যাংলার মত অবাক্ হবে দেখবে! ইষ্টুপিড্। সে বটে "গোলে বকালী", আলবৎ—কেতাব বটে।"

"কি বলচেন দাদা মশাই,—বইখানা যুগান্তর এনে ফেলেছে।"

"অ্যাঁঃ—কলি প্রবেশ হয়ে গেছে তাহলে!"

"না দাদামশাই, অমন সুন্দর বই বাংলা ভাষায় আর বেরয়নি। পড়বার তরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।"

"বলিস্ কি! "মজনুর" চেয়েও ভাল?"

"কিসে আর কিসে! সে না দেখলে আপনি আইডিয়াই করতে পারবেন না। অমন একটি আয়েসা দুনিয়া চুঁড়ে বার করতে পারবেন না।"

"এটা কি মাস র‍্যা?"

"কেন?—আশ্বিন?"

"কাত্তিকটেয় আর বাতিক বৃদ্ধি করে মাথা খারাপ করিস নি। কটা দিন কোনো রকমে কাটিয়ে দে ভাই। অঘ্রাণের তেরোটা দিন বাদ দিয়ে তোর মুখ বন্ধ করছি রোশ্।"

"আপনি তো শুনবেন না! কি ঘটনা-বিন্যাস,—সে না শুনলে—"

"বটে! লেখকের বাড়ী কোথায়,—যাত্রার দল আছে বুঝি?"

"না—না,—মস্ত বিদ্বান, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বাড়ী কাঁটালপাড়ায়।"

"বলিস কি—ডেপুটি? ওঃ—বুঝেছি, আইন আকবরির তর্জ্জমা করেছে! যাঃ আর জ্যাঠামী করতে হবে না। আগে দেখ, শোন, শেখ।—ওই জামতাড়া, নারকেলডাঙ্গা,

দুমুর-দ, বেলঘরে, বেলগেছে, কলাগেছে, কাঁটালপাড়া—ও সব জায়গার লোক ফলহরি ঠাকুরের ফলোয়ার (follower)—তারা আবার বই লিখবে! লিখলে,—আমলকী কি বয়ড়া বানিয়ে বসবে। আর কি ভারতচন্দ্র আছে,—এক কেতাবে খেতাব বেরিয়ে গেল; বুঝলি।"

শেষ বললেন—"আচ্ছা—আজ সন্ধ্যের পর শোনাস্ দিকি,—সে সময় পাঁচজন পাকা সমঝদারও থাকবে, বোঝা যাবে কেমন কেতাব।"

"আপনি তো তখন ঢোলেন।"

"অজ্ঞান তো হই না রে,—একটু চেঁচিয়ে পড়িস্;—আমি হুঁ দিলেই তো হ'ল।"

* * * *

সন্ধ্যার পর চৌধুরী মশার সমঝদার পারিষদেরা একে একে সব উপস্থিত হলেন। তাকিয়া ঠেশ দিয়ে তামাক চলতে লাগলো। ভৃত্য নন্দা—দোরের বাইরে আসন নিলে। তার কাজও ঢোলা, আর মাঝে মাঝে কল্‌কে বদলে দেওয়া।

ইন্দু বই হাতে করে উপস্থিত হতেই, চৌধুরী মশাই বললেন—"বুঝলে বিশ্বম্ভর—ইন্দু আজ আমাদের একখানা বই শোনাবে বলে বায়না ধরেছে। কাঁটালপাড়ার কে ডেপুটি টঙ্কনাথ বাবু নাকি লিখেছেন—"

"আজ্ঞে—বঙ্কিম বাবু।"

"ঐ হল,—আসল অক্ষর তো বাদ দিইনি, 'ঙ'য়ায় 'ক'য়ে তো বজায় রেখেছি রে। আচ্ছা—সুরু কর্"—

হরদেব খুড়ো তাস পেড়েছিলেন, অনিচ্ছায় তুলে রাখলেন। শম্ভু বাঁড়ুয্যে বেজার মুখে—একটা আকর্ণ-বিস্তৃত হাই তুলে, দেল ঠেশ দিলেন।

ইন্দু আরম্ভ করলে, চৌধুরী মশারও ঢুলুনি এল'।

ইন্দু যেই বলেছে—মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ—

চৌধুরী মশাই বেশ মশগুল মেরে আসছিলেন,—চোখ বুজেই বলে উঠলেন—"বাস্ করো—গলতি হায়। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কখনো হতেই পারেনা,—এই সব বই লেখা! মানসিংহ লোকটাই বা কে—কার পুত্র, কাদের দরোয়ান, এ পরিচয় কে দেবে। তিনি তো আর গঙ্গাগোবিন্দ সিং নন—যে, সবচিন লোক। আবি কেটে দাও। লেখো—ওল্‌সিংহের পুত্র মানসিংহ, তস্য পুত্র কচু সিংহ, তেকার পুত্র ঘেঁচু সিংহ, তবে না একটা ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাবে। ও-পাড়ার মেনকা ঠান্‌দি মেয়েমানুষ হলে কি হবে—সেটা তাঁর অদৃষ্টের দোষ, তাঁরও এ সব জ্ঞান আছে। মেয়ের নাম রেখেছেন দুর্গা, নাতনীর নাম লক্ষ্মী! খুঁট্ ধরলেই পটাপট্ তিনপুরুষ আপ্‌সে বেরিয়ে আসে। বই কি লিখলেই হল! কি বল' হরদেব?"

"বলবো আর কি,—আর কি দেবীবর আছেন। তিনি থাকলে এসব যথেচ্ছাচার ঘটতে পেতনা।" এই বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

কালীঞ্জয় রায় বললেন—"ছেড়ে দাওনা, ও-কথা আর বাড়িওনা। আমাদের মহাদেব খুড়োর ছেলের নামকরণ হয়েছে "মেঘনাদ"। সতী সাধ্বী বিন্দু খুড়ির কলঙ্কটা একবার বোঝো! তিনি লজ্জায় গঙ্গাস্নান ছেড়ে দিয়েছেন। যাক্—ও পাপ কথা ছেড়ে দাও।"

চৌধুরী মশার তে-ভাঁজ থুতনিটা তখন বুকে ঠেকে থেবড়ে ছিল। সেটা ঈষৎ চাগিয়ে বললেন—"ছেড়ে দাও কি রকম,—আমরা জিতা থাকতে জাতটা চোখের সামনে বর্ণসঙ্কর মেরে যাবে নাকি। কাল মহাদেবকে ডাক্ দাও। বুঝলে?"

যাক্, ইন্দুকে অনেক করে সে ধাক্কা সামলে সুরু করতে হল। চৌধুরী মশার থুতনি আবার তাঁর বুকের ওপর থেবড়ে বসলো। সটকার নলটা হাত থেকে খসে পড়লো। এক একবার চমক্ আসে আর বলেন—"হুঁ—তার পর।"

ইন্দু তখন এগিয়েছে;—"বিমলা আর তিলোত্তমা তখন শৈলেশ্বরের মন্দির মধ্যে; বাইরে—ভয়ঙ্কর ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাৎ"—

চৌধুরী মশাই চম্‌কে দুবার 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ করে ভৃত্যকে বলে উঠলেন—"নন্দা ঢুলছিস বুঝি,—দেখছিস না হারামজাদা, মাথার ওপর কী প্রলয়কাণ্ড! গরুগুলো বাইরে নেই তো,—শীগগির তুলে ফেল। উঠলি?"

ইন্দু থামেনি,—"রমণীদ্বয় ভয়ে জড়সড়।"

শুনেই চৌধুরী মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন—"কোনো ভয় নেই মা—এ ভদ্রলোকের বাড়ী। নন্দা—গিন্নিকে বল্—চট্ ওঁদের বাড়ীর মধ্যে নে' যান। গেলি?"

ইন্দু ছাড়েনি,—"এমন সময় জগৎসিংহ মন্দির-দ্বারে

করাঘাত ক'রে বললেন—"মন্দির মধ্যে কে আছ—দ্বার খোলো"—

চৌধুরী বেজায় চটে বলে উঠলেন—"খেলে কলা পোড়া, —মেয়েদের বলে দ্বার খুলতে! বেটার বাবার মন্দির! নন্দা—আবি গলাধাক্কা দেকে নিকালো। গিয়েছিস?"

ইন্দু শোনাবেই,—"দ্বার, উন্মুক্ত হওয়ায় দম্‌কা হাওয়া ঢুকে প্রদীপ নিবে গেল।"

"অ্যাঁ—ও বেটাও ঢুকলো নাকি? কি দেখচো হে হরদেব?"

ইন্দু—"শুনুন না,—'জগৎসিংহের মন্দির মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকালো, অম্‌নি তিলোত্তমার সঙ্গে তাঁর চারি চক্ষে মিলন।'"

"এই মাথা খেলে" বলেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে মুক্তকচ্ছ চৌধুরী ওঠবার উপক্রম করলেন। চীৎকার করে উঠলেন—"শিবের মন্দিরে বেল্‌কোমো,—পাহারাওলা—পাহারাওলা—। আচ্ছা হরদেব, মেয়েগুলোই বা কি রকম? —এই দুর্য্যোগের রাতে,—আমারি শিবমন্দিরে—অ্যাঁঃ! নন্দা—ছাতাটা দেতো। উঃ কি বিদ্যুৎ,—চোখ সামলাও হরদেব,—চোখে পড়তে পারে,—পোড়্—লো!"

এই বলে—বোজা-চোখ্ সজোরে বুজলেন।

উঠে পড়েন আর কি—"ওঃ কি দমকা!"

ইন্দু অনেক করে বুঝিয়ে বসালে। বললে—"আমি দেখছি দাদামশাই।"

"তুই কি দেখবি,—তোর যাওয়া হবে না,—ওরা কাটের পুতুল নয়। দেখলিনি পাজি—বিদ্যুতে শুভদৃষ্টি! কি হে হরদেব,—কিছু বলচো না যে"—

"কি বলবো বলুন। তাস খেললে আর এসব বিভ্রাট ঘটেনা। অমন নিরীহ জিনিসটি আর নেই। বিবিগুলো পর্য্যন্ত বাড়ীর চেয়ে ভালো—মুখে কথাটি নেই।"

"সে তো বুঝলুম,—এখন উপায়? মন্দিরের তো দফা—বুঝলে, শিবেরও মাথা খেলে। এখন শুদ্ধির উপায় করো।"

"আজ্ঞে—তারিণী পুরুতকে ডাক্‌তে পাঠান্। কাল প্রাতেই পঞ্চগব্য চড়াতে হবে, আর দ্বাদশটি,—সে তো জানেনই।"

"এই নন্দা, শুনলি! সারা রাতের বেবাক্ গোবর আর শ্রী চোনা—একরত্তি যেন নষ্ট না হয়। শোন্—সাতটা গরুরই—সরটা। ব্যাপারটি সোজা নয়,—বুঝলি।"—

—"দিন যায় তো ক্ষণ যায়না হে! হারামজাদাকে বলি—শীতল-আরতি হয়ে গেলেই তালা বন্ধ করতে; শুয়ার হরগিজ্ শুনবে না! দূর করে দোবো।"

চৌধুরী বলেই চললেন—"হ্যাঁ—কি নাম বললে—তিলের ধামা আর কি? কি বিদকুটে নাম রে বাবা! না ফ্যাণ্ডো, না লক্ষ্মী, না বিধু! ওরা কথ্‌খনো ভাল মেয়েমানুষ নয়। খবরদার ইন্দু—ওদিকে যেতে পাবিনি, ফের বিদ্যুৎ চম্‌কাতে পারে। তোর এতো ছট্‌ফটানি কেন রে রাস্‌কেল? বোস্ এখানে।"

এই বলে, ইন্দুর হাত মনে করে, সট্‌কার নলটা ধরে জোরে টান্ মারতেই—গড়্‌গড়িটা উল্‌টে পড়ে—লঙ্কাকাণ্ড।

এতক্ষণে চৌধুরী মশার ঘুমের ঘোরটা একেবারে কেটে গেল, চোখও খুলে গেল।

ইন্দু হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে বললে—"তারিণী পুরুত বললেন,—আপনাকে নেড়া হয়ে প্রাচিত্তির করতে হবে।"

চৌধুরী মশাই একদম্ অবাক্—"কেন? মুঙ্গ্‌লী মরেছে বুঝি,—গলায় দড়ি ছিল?"

এতক্ষণের ঘটনাটা তাঁর মাথায় ধোঁয়াটে মেরে ঘোলা ছিল, কিছু ঠিক্ করতে পারছিলেন না। ইন্দুর কথায় যেন কোয়াশা কেটে গেল;—তবে তো সত্যি! সহসা চটে উঠে "হারামজাদ্—মোশা মাছিতে মেঘ দেখতে পায় আর তুমি বেটা চোখ বুজে বসে আছ"—বলেই নন্দার পিটে পটাপট চটি প্রহার। সে হাসতে হাসতে ছুটে পালালো।

ইন্দু তাঁকে ধরে বসিয়ে বললে—"আজ্ঞে—শুধু তাই নয়,—শিবের মন্দিরে ঐ যে অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক কাণ্ডটা"—

"ওঃ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তারা কি এখনো"—

"না,—তাঁরা বোধ হয় বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন। আমি দেখে আসছি দাদামশাই,—এক মিনিটও লাগবে না,—এলুম বলে।"

"দাঁড়া বল্‌ছি ছুঁচো! তোর এতো দেখতে যাবার মাথা-ব্যথা কেন রে ইষ্টুপিড! শুনলে হরদেব,—আমার নীতিবোধ-পড়া নাতী কি বললেন—"তাঁরা বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন!" তাঁরা!! ওরে গাধা—তোর দাদামশাই জানে—তারা ঘরে থাকবার নয়! নন্দা দেখ্ দিকি, অমনি গোবরজল ছড়া দিয়ে আস্‌বি;—আর আমার জন্যেও একটু গঙ্গাজল আনিস —কান দুটো ধুয়ে ফেলি!"

* * * * *

ইন্দু তখন সদরবাড়ীর বাগানে আনন্দাতিশয্যে ছুটোছুটি করছে, আর আপনা-আপনি হো হো করে হাসছে, আর হাঁপাচ্ছে।

রিহার্সেল্ ঘরে না পেয়ে শরৎ তাকে খুঁজতে এসে তার অবস্থা দেখে অবাক্!

"কি হে—ব্যাপার কি? একা একাই সিদ্ধি চড়িয়েছ নাকি?"

ইন্দু—"সখি রে কি কহিব আনন্দ ওর
চড়াইনি—লাভ করেছি।"

"কি রকম?"

"ভাই সারা বিকেলটা প্রহসনের প্লটের জন্যে মাথায় পেরেক ঠুকেও একটা প বার করতে পারিনি,—পাগল হয়ে যাচ্ছিলুম। পিসি-পর্ব্ব পার হয়ে শেষ প্লটে ঠেকে গেলুম! এই অবস্থায়—

"স্বপ্নে কহি দিলা দেবী"।

"ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?"

"না হে,—ভূতাবিষ্ট দাদামশায় প্রমুখাৎ,—একদম, খাঁটি স্বপ্নাদ্য!"

সহর

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ধূম ও ধূলি-মলিন আকাশ,
পাখীর কল-কূজন নাই;
কোথায় বকুল-বকের কুঞ্জ—
মৌমাছিদের গুঞ্জন নাই।
ইট ও কাঠে শূন্য ঢাকা,
নাই অবকাশ একটু ফাঁকা,
শ্রান্ত হ'লে শান্ত শীতল
ছায়ায় ঢাকা বিজন নাই;
পবনে না পাই পরিমল—
শীকর-মাখা বীজন নাই।

বৃহৎ সৌধ, বিপুল বিত্ত,
বিরাট গর্ব্ব,—হৃদয় নাই;
আগল-আঁটা অন্ন ছত্র—
অন্নপূর্ণার উদয় নাই।
যান-জনতা-কোলাহলে
পরাণ মরে পলে পলে,
বাহির হ'লেই পথে হেথায়
প্রতিবেশী স্বজন নাই;
প্রীতির হাসি বিরল অতি—
দু'টি কুশল-বচন নাই!

পাঁকের ফুল

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

দীর্ঘ দিন পরে স্বদেশের বুকে পা দিয়েই দেখি, সারা বাংলা এক শিল্পীর গৌরবগাথায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। দেশের কবি তাকে যশের জয়টিকা পরিয়ে দিয়েছেন, তরুণের দল তাকে বরণ ক'রে নিয়েছে প্রীতি-পুষ্পের অর্ঘ্য দিয়ে, নারীদের মনের মহলেও দেখ্‌লুম তার প্রতিপত্তির অন্ত নেই। অকস্মাৎ এমনি ক'রে ধূমকেতুর মতো বাংলার নিঃসাড় মনকে নাড়া দিয়ে যে সচেতন ক'রে তুলেছে, তার শিল্প-সৃষ্টি দেখ্‌বার জন্য মনের ভেতর একটা অদম্য কৌতূহলের সৃষ্টি হ'ল।

আমি যখন সাগরের পারে পাড়ি জমিয়েছিলুম, বাংলার সাময়িক পত্রিকাগুলোতে তখন ছবি দেওয়ার রেওয়াজ সুরু হয় নি—ভারি ভরাট প্রবন্ধে তাদের কলেবর ভ'রে উঠ্‌ত। এখন সে প্রবন্ধের গৌরব লঘু হ'য়ে গেছে এবং তার জায়গায় উড়ে' এসে জুড়ে' বসেছে পটুয়াদের পট। সুতরাং এই তরুণ শিল্পীর শিল্প-লক্ষ্মীর পরিচয় পেতে বেশী দেরী হ'ল না। বড় একখানা মাসিকের পাতা ওল্‌টাতেই তার ছবির নমুনা আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে' উঠ্‌ল।

ছবি দেখে খুশী হ'তে পার্‌লুম না। আর্টের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় ভাবাভিব্যঞ্জনার কোন ছাপই তার ভেতর নেই—একটা অতি স্থূল লালসার ক্লেদে ছুপিয়ে ছবিগুলোকে রঙ্‌-চঙ্‌এ ক'রে তোলা হয়েছে। ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি স্থানের রূপদক্ষদের রূপের লেখায় চোখ্‌ দুটো তখনো মশ্‌গুল হ'য়ে ছিল। বাংলা দেশ হঠাৎ এমন তালকানা হ'য়ে গেছে ভাবতেও মনটা খানিকটা খিঁচে গেল। অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়েই বন্ধু নীতীশকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—এ লোকটার শিল্প-বিদ্যার নমুনা যদি এই হয়, তবে একে তোমরা মাথায় ক'রে এত নাচ্‌ছ কেন?

নীতীশ বল্‌লে—মামুলী ধরণের ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমাদের চোখে চাল্‌সে ধরেছে, তাই শক্তির ছাপ যেখানে আছে তাকে তোমরা বুঝ্‌তেও পারো না—সইতেও পারো না। ধোঁয়ার সৃষ্টি ঢের হয়েছে, এখন কিছুদিন সেটা না হয় যাক্‌। মানুষ যখন রক্ত-মাংসের জীব, তখন তাদের কাছে দুনিয়াটাকে দুনিয়া ক'রেই যদি কেউ দেখাতে চেষ্টা করে, তবে সে মহাভুল করেছে এ কথা মনে কর্‌বার কোনো কারণ নেই। তোমাদের মতো রুচিবাগীশেরাই তো আর্টটাকে জাহান্নমে দিতে বসেছে। জান তো অস্কার-ওয়াইল্ডের সেই কথা—'It is better to be beautiful than to be good.' সাধু এবং শিল্পীর স্বপ্নের ভেতর ঢের তফাৎ! এই যে শিল্পী—একে যদি দেখ্‌তে, এর ছবি যেমন অফুরন্ত প্রাণের উৎস, এর জীবনটাও তেমনি উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রবাহে পরিপূর্ণ—যেমন চঞ্চল—তেমনি সুপ্রচুর!

আমি হেসে উত্তর দিলুম—এই অস্কারই আবার বলেছেন, 'It is better to be good than to be ugly.' রুচির দিক থেকে যা কুৎসিত, যা বীভৎস, সত্যকার শিল্প-জগৎ তাকেও প্রশ্রয় দেয় না। তোমার বন্ধুর ভেতর যদি অফুরন্ত প্রাণের উৎস থাকে, সে ভালো কথা। কিন্তু, প্রাণের পরিচয় যদি তোমাদের ঐ ছবিগুলো হয়, তবে সে প্রাণ কারো ভিতর না থাকাই ভালো।

তর্কের খাতিরে প্রাণকে তো উড়িয়ে দিলুম। কিন্তু সে প্রাণ যে আমার বুকেই মৃত্যুবাণ হেনে, তারি রক্ত পান ক'রেই রাঙা হ'য়ে উঠেছে তা কি জান্‌তুম!

* * *

মিনতি ছিল আমার প্রতিবেশী। ছোট-বেলা থেকে তার সাথে একসঙ্গে খেলা করেছি। তারপর বড় হ'য়েও তাকে পেয়েছিলুম, কিন্তু সে আর এক ভাবে। তাই যাবার সময় যখন তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, চোখের জলে বান ডাকিয়ে সে বল্‌লে—যত শীগ্‌গির পারো, ফিরে এসো সমীর-দা, মনে রেখো, তোমার হাতের স্পর্শ ছাড়া আমার চোখের ধারার এ সোতা কখনো শুকোবে না।

বিদেশের শুষ্ক মরুভূমিতে মিনতির চোখের জলের সেই

ঝর্ণাই ছিল আমার সব আনন্দ, সব সান্ত্বনা। ভবিষ্যতের গাছে যত সোনার ফল ফলিয়েছি, হীরের ফুল ফুটিয়েছি, তাদের সবাইকে তাজা ক'রে রেখেছিল সেই চোখের জলের ঝর্ণাটা। কিন্তু কল্পনার সে স্বর্গটাও আমার অকস্মাৎ একদিন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ভেঙে, টুটে, রেণু-রেণু হ'য়ে পথের পাশে পায়ের ধূলোর তলেই লুটিয়ে পড়্‌ল। ফিরবার প্রায় সময় হ'য়ে এসেছে, হঠাৎ এক দিন মিনতির চিঠি পেলুম—'আমায় মাফ ক'রো সমীর-দা, অন্য জায়গা থেকে আমার ডাক এসেছে ভাই, আমি তোমার জন্য সবুর কর্‌তে পার্‌লুম না। আমার হৃদয় যেভাবে নিজেকে তোমার পায়ে বিলিয়ে দেবে ব'লে শপথ নিয়েছিল, সে শপথ তার ভেঙে গেল। যদি পারো, তোমার এই চঞ্চল-চিত্ত বোনটাকে ক্ষমা ক'রো। হৃদয়টাকে ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে যে ভুল হয়েছিল, জানি, সে ভুলের জের টেনে চলাকে তুমি অপমান ব'লেই মনে কর্‌বে। তোমার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পারি, কিন্তু তাকে অপমান কর্‌বার সাহস আমার নেই।'

এ চিঠির উত্তর দেবার কোনো দরকার ছিল না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে আস্‌বার দরকারটাও ক'মে গিয়েছিল। তারপর দু'টি বছর ছন্নছাড়ার মতো বিদেশের পাহাড় পর্ব্বত বন-জঙ্গলে ঘুরে' মনের দিক্‌ দিয়ে সর্ব্বরিক্ত এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পুরো মাত্রায় নাস্তিক হ'য়ে বাংলার বুকে ফিরে এসেছি বটে, কিন্তু মিনতিদের বাড়ীতে এখনো পা দিতে পারি নি। যে মিনতি আঠারোটি বৎসরের সম্বন্ধ একখানা চিঠির মারফৎ শেষ ক'রে দিতে পারে, তার কাছে দাঁড়াবার সাহস আমারও ছিল না, যে আমি সাহসে ইউরোপের বে-পরোয়া পাহাড়ীদেরও পরাজিত ক'রেছিলুম।

কিন্তু মিনতির সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার কারবার যে শেষ হয় নি, সে কথা ভালো ক'রে বুঝ্‌লুম সেই দিন যে-দিন মিনুর চিঠি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এক তাড়া কাগজ এসে আমার কাছে হাজির হ'ল। সে লিখেছে—'যাবার বেলা আবার তোমার কাছে মাফ চাইছি সমীর-দা। এবার আমার আহ্বান এসেছে কোনো মানুষের কাছ থেকে নয়, পরপারের অজানা লোক থেকে।—যদিও জানিনে সে লোকের মালিক ভগবান না শয়তান! তুমি যে আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পারো নি, তা তখনি বুঝেছি যখন দেশে পা দিয়েও তোমার মিনুর কাছে ছুটে' আসা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। পাপটা যে আমার 'ছোট তা বল্‌ছিনে। কিন্তু যদি জান্‌তে ভাই, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে কি ভাবে কর্‌তে হয়েছে! ধ্রুব আশ্রয়কে পরিত্যাগ ক'রে যে আলেয়ার পেছনে ছুটে' চলে, মরণ ছাড়া তার গতি নেই। সেই মরণের স্পর্শই প্রতিমুহূর্ত্তে আমি নিজের ভেতরে অনুভব কর্‌ছি। সে স্পর্শ তুষার-শীতল। কিন্তু যার বুকে রাবণের চিতা তার কাছে তুষারের রক্ত-জমানো ঠাণ্ডা স্পর্শও তো অবাঞ্ছনীয় নয়! হয়তো মরণটা এত তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে না আস্‌লে আমার অশ্রু-সজল জীবনের কাহিনীটি তোমার কাছে ছাপাই থেকে যেত। কিন্তু আমার জীবনে সবচেয়ে যে বড় আনন্দ এবং সবচেয়ে যে বড় শত্রু, মরণেও তার কথাটা আমি ভুল্‌তে পার্‌ছিনে। পত্র লিখে সব কথা জানিয়ে যাব সে শক্তিটাও আমার নেই। জীবনের হাসিকান্নাগুলো সময় সময় খাতার ওপর এঁটে রাখ্‌বার অভ্যাস তোমার কাছেই পেয়েছিলুম। সেগুলো যাবার বেলা আবার তোমার পায়েই উপহার দিয়ে গেলুম। তোমার মিনুর জীবনের পানপাত্রটা কোন্‌ অমৃত-রসে ভ'রে উঠেছিল তার আভাস এর ভেতর থেকেই পাবে। হয়তো যে দুঃখ আজ না হোক্‌, দু'দিন বাদে তুমি ভুল্‌তে পার্‌তে, তার পথেও কাঁটা পড়্‌ল। কিন্তু এ ছাড়া আমার যে আর কোনোই উপায় ছিল না ভাই! এত বড় রিক্ততা নিয়ে মরণের পথে আর বুঝি কেউ আমার আগে পা বাড়ায়নি—ইতি।

তোমার মিনু।'

চিঠি শেষ ক'রে খাতার পাতাগুলো খুলে' বস্‌লুম। একে ঠিক ডায়েরী বলা যায় না। এলোমেলো-ভাবে কয়েকটা দিনের মনের ইতিহাস এর বুকে ধ'রে রাখা হয়েছে মাত্র। মাঝে মাঝে ভেতরে অনেকগুলো পাতা ছেঁড়া। প্রথম তারিখটা প্রায় দু'বছর আগের। বুভুক্ষু ভিক্ষুক যেমন ক'রে খাদ্যের পাত্রটার পানে ঝুঁকে পড়ে, আমার দীর্ঘ দিনের উপোসী চোখ্‌ দু'টো তেমনি ক'রে খাতার পাতাগুলো পড়্‌তে সুরু ক'রে দিলে:—

* * *

ডায়েরী লিখবার অভ্যাস নেই। কিন্তু জীবনের আজকের ঘটনাটা না লিখে রেখেও তো পার্‌ছি নে। ফাল্গুন শেষ হ'য়ে গেছে, বসন্তের পালা ফুরিয়ে এল।

কিন্তু, আমার মনের বন এ কি নতুন ফাল্গুনের আগমনের সাড়ায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে? বৈশাখের রুদ্র দেবতার মতো যার দীপ্তি বসন্তের পেলব পুষ্পের মতো, এ আলো সে কোথায় পেলে? আমার মনের বনের সমস্ত ফুল যে সে আলোর স্পর্শে আজ ফোটার উল্লাসে মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

শিল্পী সে। ছবির ভেতর রূপের শিখা ফুটিয়ে তোলা তার কাজ। কিন্তু তার দেহের শিখাতে যে মনের গোপন গুহাতেও আগুন ধ'রে যায়। তার দেহে আগুন, তার কথায় আগুন, তার চলার ভঙ্গীতে আগুন। মা গো মা, এত আগুনও একটা মানুষের ভেতরে থাকে! অথচ এত আগুন নিয়ে তার কারবার কি সহজ—কি স্বচ্ছন্দ তার গতি!

শিল্প-প্রদর্শনীতে তার ছবিগুলো টাঙানো ছিল। আর সেই ছবির সাম্‌নে সে দাঁড়িয়েছিল তার চারপাশে অফুরন্ত আনন্দের ঝড়ের দোলানি নিয়ে। ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মুখের দিকে চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম বল্‌তে পারিনে, কিন্তু তখনই আমার হুঁশ হ'ল যখন সে এসে একটা ছোট্ট নমস্কার ক'রে বল্‌লে, ও-ছবিগুলো সব আমার আঁকা। তারপর কোনো দ্বিধা না ক'রেই সারা প্রদর্শনী ঘুরে' সে আমাকে ছবি বোঝাবার ভার নিলে। বুঝলুম, ছবির সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে সে মোটেই ওস্তাদ নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য জোর তার বলার ভঙ্গীতে। সে জোরের বর্ম্ম ভেদ ক'রে তার জ্ঞানের ভেতর যে অজস্র দীনতা রয়েছে, কোন ফাঁকেই যেন তারা মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ খুঁজে পেলে না।

এই বলার ভঙ্গীই যখন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ তখনই সে একবার থেমে গেল। তারপর কি একটু ভেবে তার শিশির-দিয়ে-মাজা স্বচ্ছ কালো চোখ দু'টো আমার মুখের দিকে তুলে ধ'রে বল্‌লে—আপনার বাড়ীতে আমার একদিন নিমন্ত্রণ রইল। পার্‌লুম না এই দু'দণ্ডের দেখায় মনের ভেতর আপনার রূপের রেখাটি এঁকে নিতে। অথচ এ রূপকে দুঃখে আমার তুলির রেখায় ফুটিয়ে না তুলেও তো আমি সোয়াস্তি পাব না। এ তো রূপ নয়—এ যে একেবারে রূপের শিখা;—এ শিখাকে যে ধ্যান ক'রে মনের ভেতর লাভ কর্‌তে হয়। জানেন, আমাদের ধর্ম্মের ভেতর মূর্ত্তির বোঝা এত বেড়ে উঠেছে কেন? দেবতাকে ধ্যানের ভেতর পেতে হ'লেও যে গোড়ায় মূর্ত্তি একটা দরকার! আপনার দেহে রূপের যে দীপ্তি জ্বল্‌ছে আমি সেই দীপ্তিরই পূজারি, তবু অন্ততঃ আরো দু' একবার না দেখলে তো তাকে আয়ত্ত কর্‌তে পার্‌ছি নে।

কি করুণ ব্যাকুলতা তার চোখের ভেতর কাঁপ্‌ছে! অপরিচিতের এই রূপের স্তুতিতে যতই মাদকতা থাক্, বাংলার মেয়ের ধাতে তা বরদাস্ত না হওয়াই ছিল সঙ্গত। হয় তো আর কোথাও শুন্‌লে তার ভেতরকার অপমানটাই আমাকে খোঁচার মতো ক'রে বিঁধ্‌ত। কিন্তু তার ওপরে রাগ কর্‌তে পার্‌লুম না। ছবি দেখা শেষ ক'রে ফের্‌বার পথে তার নমস্কারকে নমস্কার দিয়ে অভিনন্দিত ক'রে ব'লে আস্‌লুম—কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

* * *

আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকার তখনো ভালো ক'রে জমাট বাঁধে নি, কিন্তু ঘরের ভেতরকার আড্ডা পুরো মাত্রায় জমে উঠেছে।

চার টেবিলের চার পাশে সকলে ব'সেছিল, আমি চা তৈরী কর্‌ছিলুম। হঠাৎ শিল্পী ব'লে উঠ্‌ল—মাধ্যাকর্ষণের জোর কত জানিনে, কারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কিন্তু আপনাদের আকর্ষণের জোর আমি সমস্ত দেহমন দিয়েই অনুভব কর্‌ছি। সূর্য্যের আলো আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাবার আগেই আমার মন আমাকে টান্‌তে থাকে এই বাড়ীটার পানে। শুনেছি সমুদ্রের স্থানে স্থানে চুম্বকের পাহাড় আছে। জলের বুক চিরে এপারের জাহাজ ওপারের পানে পাড়ি জমাতে জমাতে হঠাৎ যদি এই চুম্বকের পাহাড়ের আকর্ষণের ভেতর এসে পড়ে, তবে তার ইঞ্জিনের ময়দানবও তাকে রুখ্‌তে পারে না। আমার অবস্থাও সেই জাহাজের মতোই হয়েছে। জানিনে তারি মতো আমাকেও মাঝ-দরিয়ায় বানচাল হ'তে হবে কিনা! ব'লেই সে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লে।

সে হাসি তার আমাকে ব'লে দিলে—ওগো এবাড়ীর চুম্বক পাহাড় সেতো তুমি! আমার মনের শিল্পী ময়দানবও তো তাই এ দেহটাকে আর রুখ্‌তে পারছে না। শিল্পীর ধ্যানলোকে যে মানসীর চরণস্পর্শে সৌন্দর্য্যের শতদল

পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে ফুটে' ওঠে, সেই মানসীর সন্ধান পেয়েছি আমি তোমার মুখে। তাইতো সৌন্দর্য্যের মাতাল হৃদয়টা আমার এমন ক'রে বাঁধা পড়েছে তোমারি দুয়ারে। আর তো আমার ফের্‌বার উপায় নেই।

তার সে হাসির ভাষা সহসা আমার মনকে একটা নাড়া দিয়ে যে কাঁপন জাগাল, তারি বেগ সামলাতে গিয়ে হাত টল্‌কে খানিকটা গরম চা, আমার হাতখানাকে একটু স্যাঁকা দিয়ে, আমার পেঁয়াজি রঙের শাড়ীর প্রান্তটা ভিজিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌ল। হাতটা জ্বালা কর্‌তে লাগ্‌ল। তবু মনে হ'ল এ ভালোই হ'য়েছে, নইলে এই স্তুতির গান আমার বুকের ভেতর যে সমুদ্রের মন্থনকে জাগিয়ে তুলেছে, তাকে আমি কি দিয়ে সম্বরণ কর্‌তুম।

শিল্পী ত্রস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে' বল্‌লে—এই দেখুন, ব'কে ব'কে আপনার হাতটা পুড়িয়ে দিলুম! আমার যদি কো না বুদ্ধি থাকে!

আমি হেসে বল্‌লুম—কিচ্ছু লাগেনি আমার। বসুন আপনি, আপনার চা তৈরী হ'য়ে গেছে।

চার বাটিতে চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে শিল্পী বল্‌লে—সমুদ্র-মন্থনের সময় সুধা এবং লক্ষ্মী একসঙ্গে উঠে এসেছিল, এ হচ্ছে হয় তো নিছক কাব্যকথা। কিন্তু এ কাব্য জীবনেও যে সত্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে তার প্রমাণ পাচ্ছি আজকের এই চার বাটিতে চুমুক দিয়ে। লক্ষ্মীর হাত ছাড়া তো সুধার পরিবেশন চল্‌তে পারে না। লক্ষ্মীর হাতের এই পরিবেশনই তো প্রতিদিন চলেছে আমাদের দেহে, আমাদের মনে, আমাদের সকল কাজে, সকল চিন্তায়, এমন কি আমাদের শিল্প সৃষ্টিতেও। আমি যে এখানে এত বেশী আসি তার কারণ, এইখান থেকেই প্রতিদিন আমি আমার শিল্পের খোরাক জোগাড় ক'রে নিয়ে যাই!

মা একটু হেসে বল্‌লেন—ওকে অত বেশী প্রশংসা করো না বাবা, ওর অহঙ্কার বেড়ে যাবে। সমীর বল্‌ত, মেয়েদের মুখের ওপর প্রশংসা কর্‌তে নেই, তাতে তাদের মাথা ভারি বিগড়ে যায়।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে শিল্পী তার কালো কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছগুলো একটা ঝাঁকিতে সোজা ক'রে তুলে' বল্‌লে—কক্‌খনো না; আমাদের পূজার মন্ত্রই তো হচ্ছে নারীর এই স্তব গানের সমষ্টি! কিন্তু সমীর কে?

মা বল্‌লেন—সমীর সেন, ষ্টেট স্কলারশিপ নিয়ে যে বিলাতে সিভিল সার্ভিস পড়্‌তে গেছে। তার সঙ্গেই তো আমার মিনুর বিয়ে ঠিক হ'য়ে আছে।

শিল্পীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, আসন্ন আষাঢ়ের একখণ্ড কালো মেঘ হঠাৎ যেন আকাশের প্রান্ত ছেড়ে তার মুখের প্রান্তে খ'সে পড়্‌ল। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই একটা ধার-করা হাসির বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘখানাকে আগাগোড়া ঢেকে ফেলে সে বল্‌লে—এত বড় সুখবরটা আমাকে তো এর আগে দেন নি। সমীর বাবুর ফিরে আস্‌বার কত দেরী?

আমার ছোট বোন রীতি হেসে উত্তর দিলে—এ তো ফাল্গুন মাস, এর আগুনে হাওয়ার ফাঁড়াটা যদি মিনতি দি' কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন, তবে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'র আগেই সমীর বাবু ফিরে আস্‌বেন।

পেয়ালাটা নিঃশেষ ক'রেই শিল্পী উঠে' দাঁড়ালো। তার পর ম্লান হাসিতে চোখের পাতা দুটো ভিজিয়ে তুলে' আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে—মনে কর্‌বেন না আমার উপদ্রবের হাত হ'তে আপনি বেঁচে গেলেন। সমীর বাবুর হাকিমী মেজাজ হয় তো শিল্পীর খেয়ালকে বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌বেন না। তাই তাঁর ফিরে আস্‌বার আগেই আমি আমার স্তুতির পালা শেষ করে নিতে চাই!

রাত নিবিড় হ'য়ে উঠেছে কিন্তু তবু ঘুম আস্‌ছে না। সেই শিল্পীর কথাই বার বার ক'রে মনে পড়ছে। ঝড় যেমন ক'রে দুনিয়াটাকে দোলা দিয়ে যায়, তেমনি দোলা যার আসা এবং যাওয়ার ভেতর দুলে' ওঠে, কে তাকে ভুল্‌তে পারে!

যতক্ষণ সে সাম্‌নে ছিল, তার পায়ের তলা হ'তে চুলের ডগাটি পর্য্যন্ত সমস্ত দেহটাই যেন বলছিল—আমি আছি—আমি আছি! কি যে আছে, আর কি যে নেই, বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌বার কথাটাও আর তখন মনে ছিল না। সে যখন চ'লে গেল তার পেছনে রেখে গেল তার সেই বড় বড় দু'টো চোখের অদ্ভুত অপূর্ব্ব দৃষ্টি। সাপের চোখে এক রকমের দৃষ্টি থাকে, যার ওপর চোখ পড়্‌লে পা আর ফেরানো যায় না। শুনেছি কোনো কোনো মানুষের চোখেও নাকি সেই রকমের দৃষ্টি আছে। এ কথা সত্য কি না জানিনে, কিন্তু মানুষের চোখেও যে এমন আকর্ষণী শক্তি থাকে,

তাকে না দেখ্‌লে হয় তো সে কথাটাও কখনো বিশ্বাস কর্‌তুম না।

এই জীবনেই তো আরো একটি দৃষ্টির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সে দৃষ্টি যেমন শান্ত, তেমনি মধুর, তেমনি ত্যাগের আনন্দে পরিপূর্ণ। এতদিন আমার জীবনের ওপর সেই দৃষ্টিই তো ধ্রুবতারার মতো আলো দিয়েছে। কিন্তু এর ক্ষুধিত শাণিত লালসা-তপ্ত দীপ্ত দৃষ্টি যে তার জ্যোতিকেও ম্লান করে দিলে। আপনাকে বিলিয়ে দেবার শক্তি যত বড়ই হোক্ না কেন; মানুষকে জয় করে তারাই, যারা জোর ক'রে কেড়ে নেয়। সভ্যতার এই পরিপূর্ণতার যুগেও মানুষ তার অসভ্য মনটাকে একেবারে ছেঁটে ফেল্‌তে পারেনি!

আলিপুরে বেড়াতে গিয়ে সেদিন একটা সিংহ দেখেছিলুম। সেটা নাকি সদ্য সদ্য ধ'রে আনা হয়েছে। তার গতি আমার ভারি ভালো লেগেছিল। কিন্তু সেই কাউকে-কেয়ার-না-করা সিংহের গতির সঙ্গে এর গতির একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। হেসে গেয়ে কথা ব'লে সে চলে গেল। তার সে হাসি-গান-কথার ভেতর শিল্পীর যোগ্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ হয় তো কিছুই নেই। তবু তার রেশ অক্ষয় হ'য়ে জেগে রইল আমার কানে—আমার বুকের মাঝখানে!

* * *

কাল রাত্রিতে হঠাৎ বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। যে আকাশ তার আগুনের ধারায় ধরণীর তরুণ সৌন্দর্য্যের ওপর ম্লান পাণ্ডুরতার রেখা টেনে দিয়েছিল, মেঘের চুম্বন ঢেলে সেই আবার তাকে স্নিগ্ধ শ্যামল ক'রে দিলে। পৃথিবীর এই স্নাত শুভ্র সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে আজ আবার চোখ জুড়িয়ে যায়।

আজ যে পয়লা বৈশাখ, সে কথাটা আমাদের কারো মনে ছিল না। শিল্পী এসে তার নববর্ষের অভিবাদন জানিয়ে সে কথাটা আমাদের মনে পড়িয়ে দিলে।

রীতি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—

"Now the New year reviving old Desires
The thoughtful soul to solitude retires."

দিদি, তুমি কোন্ নিভৃতে লুকোবে বলো?

শিল্পী ধীরে ধীরে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আমার একটা পুরনো ইচ্ছা যদি পূর্ণ করেন!

আমি বল্লুম—কি?

শিল্পী বল্‌লে—আজ আমাকে আপনার ছবি আঁক্‌বার অনুমতি দিন!

একটা আচম্‌কা আনন্দের বন্যায় বুক ভ'রে গেল। কোনো রকমে সে ধাক্কাটাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লুম—না, থাক।

একটু ম্লান কণ্ঠে সে বল্‌লে—বৎসরের প্রথম দিনটাতে আমাকে বিমুখ কর্‌বেন না আপনি। জানেন, সব শিল্পীরই একটা সংস্কার আছে, বৎসরের প্রথম দিনটা যদি ব্যর্থ হয় সারা বৎসর তার চলতে থাকে সেই ব্যর্থতার জের টেনে।

আর আপত্তি করা চল্‌ল না। বসবার জায়গাটা ঠিক ক'রে দিতেই খানিকটা দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে সেই খানটাতে ব'সে পড়্‌লুম। একটু পরেই শিল্পী ডুবে' গেল তার তুলি রং আর ক্যানভাসের ভেতর। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লুম, আগুনের শিখা কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলোকে ঢেকে ফেলেছে।

আমের মঞ্জরীর সুরভিতে বাতাস ভরপুর। পাখীগুলোর অকারণ কূজন গুঞ্জনে স্তব্ধ বনতল মুখরিত। রৌদ্রের ভেতর দিয়ে ঝরে' পড়্‌ছে প্রকৃতির তরুণ যৌবন—রূপের নেশায় ভরা, সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্যে উচ্ছল—চঞ্চল। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখেও স্বপ্নের ঘোর ঘনিয়ে আস্‌ছে।

চুলের একটা গোছা হঠাৎ বাতাসে উড়ে' এসে আমার মুখের ওপর পড়্‌তেই হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে দিয়ে সে বল্‌লে—ভারি সুন্দর হয়েছে আপনার Poseটা। কিন্তু আমি পার্‌ছিনে এত সৌন্দর্য্য আমার তুলির রেখায় ফুটিয়ে তুল্‌তে। রূপের পূজা আমার ব্যবসা, কিন্তু সে রূপ কি ক'রে ধ্যান কর্‌ব যার সীমা নেই—শেষ নেই। ব'লেই তুলিটা ছুড়ে' ফেলে দিয়ে সে উঠে' দাঁড়ালো।

আমি হেসে বল্লুম—আমার নিজের দৈন্যটা মিথ্যে প্রশংসা দিয়ে ঢাক্‌বার চেষ্টা করবেন না। আমি তো গোড়াতেই মানা করেছিলুম আপনাকে,—এ ছাই চেহারা না কি আবার ছবিতে তোলায়!

বিস্মিত বিহ্বল চোখ দু'টো আমার মুখের পানে তুলে' ধ'রে সে বল্‌লে—জানেন, আপনি কি বল্‌ছেন! আমার নিজের শক্তি যে কত বড় তা আমি জানি এবং এ শক্তির দীনতা এর আগে এমন ভাবে আমি আর কখনো অনুভব

করিনি! কিন্তু এ পরাজয়ের জন্য আমার এতটুকু লজ্জা নেই। বিদ্যুতের শিখার কতটুকুই বা কোন্ শিল্পী ফোটাতে পেরেছে!

• ফেলে-দেওয়া তুলিটা আবার কুড়িয়ে নিয়ে সে আমার ছবি আঁক্‌তে সুরু ক'রে দিলে। তার মুগ্ধ ক্ষুধিত দৃষ্টি ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে আমার মুখের ওপর খ'সে-পড়া উল্কার আলোর মতো ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল! সে আলো আমার বুকে কি রোস্‌নাই জ্বালালো কে জানে!

শিল্পী তার তুলির খেলা বন্ধ ক'রে আবার ব'লে উঠ্‌ল—আপনি মুহুর্মুহু এত বদলাচ্ছেন কেন বলুন তো? সেই জন্যই তো আমার আরো খেই হারিয়ে যাচ্ছে! আপনার মুখটা হঠাৎ কি লাল হ'য়ে উঠেছে দেখেছেন! ও লালকে ফুটিয়ে তোল্‌বার উপযুক্ত রঙ্ তো আমার ভাণ্ডারে নেই। আঃ, যদি আগুনটাকে আমার রঙ্‌এর ভাণ্ডারের ভেতরে পেতুম! তার পরেই উঠে' এসে হঠাৎ তার হাত দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে আমার দু'টো হাত একেবারে তার বুকের ওপর টেনে নিয়ে বল্‌লে—তুমি শিল্পীর সাধনার জিনিষ—শিল্পী তো তোমাকে ছাড়্‌তে পারে না। হয় তো আই-সি-এসএর মোহ আজও তোমাকে জড়িয়ে ধ'রে আছে। কিন্তু কুবের-লক্ষ্মী কুবেরের ভাণ্ডার থেকে উঠে' আসেনি, তাকে নিখিল সৌন্দর্য্যের ভেতর থেকে তিল তিল ক'রে চুইয়ে নিয়ে রূপ দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে শিল্পী। এই তিলোত্তমা তো শিল্পীরই একমাত্র সম্পদ। সে অর্থ চায়নি, মান চায়নি, সুখও সে চায়নি—কেবল চেয়েছে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টিটুকু। কে সে সমীর সেন, যে কেবলমাত্র শক্তির দম্ভে তোমাকে কেড়ে নেবে তোমার সত্যকার যেখানে সার্থকতা সেই সার্থকতার সিংহাসন থেকে। এই যে অপরূপ আগুনের খেলা চলেছে তোমার চুলের আগা, নাকের ডগা, হাতের আঙুল, বসনের প্রান্ত ঘিরে, যে আগুন আমার মনকে নতুন নতুন রহস্যের সন্ধান দিয়ে নব নব সৃষ্টির পুলকে বিহ্বল ক'রে তুল্‌ছে, সে কি কোনো দিন এই সব রহস্য-লোকের সন্ধান পাবে? তবে তোমার ওপর তার কিসের জোর? কেন সে তোমাকে নেবে, তোমার ওপর সত্যকার যার অধিকার তাকেই বঞ্চিত ক'রে?

উত্তেজনায় তার দেহ থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল। আর তারি একটা ঢেউ চারিয়ে গেল আমার সমস্ত দেহ মনে, আমার রক্তের কণাগুলোর ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে তার কথার অস্পষ্ট ইঙ্গিতটাও যেন মূর্ত্তি ধ'রে উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

দৃষ্টি যে কথা কয়—মানুষের ভাষার চাইতেও জোরালো ভাষায় দাবীর আর্জ্জি পেশ করে, তার পরিচয় পেলুম সেদিন সেই শিল্পীর দৃষ্টির ভেতর দিয়ে। তার হাত দু'টো হাতের মুঠোর মধ্যে জোরে চেপে ধ'রে বল্লুম—বন্ধু, আগুনের রথে চ'ড়ে তুমি জয়-যাত্রার পথে বেরিয়েছ। তোমার গতি কে রোধ কর্‌বে? তোমার তূণের বাণ তো ফাল্গুনের বাণের চেয়ে কম জোরালো নয়!

জয়ের উচ্ছ্বসিত হাসিতে শিল্পীর অধর ভ'রে গেল। তার পর সেই অধর ধীরে ধীরে নেমে এল, আমার বিস্রস্ত বিক্ষিপ্ত চুলের অরণ্যে, বিস্ফারিত ললাটের তটে, লজ্জারক্ত অধরের ওপরে। সে তো চুমো নয়, সে যেন তড়িতের রেখা, অপরূপ সুন্দর অথচ বজ্রের জ্বালায় জ্বালাময়!……

দিনের আলোতে পার্‌লুম না, রাত্রির অন্ধকারে সমীরদাকে লিখে দিলুম আমার কবুল জবাব। চলেছি—ছুটে' চলেছি কে জানে কোথায়—নরকের অন্ধকারে কি স্বর্গের আলোকের পথে। আমার চোখের সাম্‌নে জাগ্‌ছে কেবল দুটি বড় বড় চোখের দৃষ্টি! সে দৃষ্টি সুন্দর কি কুৎসিত জানিনে; শুধু জানি সে অপরূপ, আর তার মোহ কাটিয়ে ওঠ্‌বার শক্তি আমার নেই!

* * *

ছ'টা মাস্ কোথা দিয়ে যে উড়ে' গেল কিচ্ছু টের পেলুম না। এ ছ'টা মাস আমার দেহের সমস্ত অণু পরমাণু ঘিরে' যেন বসন্ত জাগ্রত হ'য়ে উঠেছিল—তার শোভা নিয়ে, তার সৌন্দর্য্য নিয়ে, তার অপূর্ব্ব মাদকতার বন্যা নিয়ে। যৌবন যে হঠাৎ বাঁশীর শব্দ শুনে জেগে ওঠে, এত দিন এ কথা নিছক কল্পনা ব'লেই মনে কর্‌তুম; কিন্তু শিল্পীর বাঁশী যখন আমাকে ডাক দিলে, চেয়ে দেখি, আমার দেহের ভেতরেই তা সত্য হ'য়ে উঠেছে। তার একটা ডাকেই আমার ক্ষুধার্ত্ত বুভুক্ষু যৌবন পরিপূর্ণতার প্লাবনে চারিপাশের খানিকটা টল্‌কে ছল্‌কে দিয়ে মনের অরণ্য ভেদ ক'রে যেন অকস্মাৎ বেরিয়ে এল আমার দেহের দুয়ারে;—সদ্যোজাত গরুড়ের মতোই তার অসীম শক্তি, বিজয়ী বীরের মতোই তার বিপুল স্পর্দ্ধা, ভোগের সুরায় তার পানপাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য সমস্ত বাড়ীর ভেতর আমার খ্যাতিই ছিল সব চাইতে বেশী। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় সেই সংযমের আবরণটা খ'সে পড়্তেই মা বিস্মিত ও শঙ্কিত হ'য়ে আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন—মিনু, যে মাত্রায় তুই ছুটে' চলেছিস্ এ বাড়ীর পক্ষে তা কিছু নতুন জিনিষ নয়। কিন্তু আমি তো তোকে জানি, এ যেন তোর ধাতের সঙ্গে মোটেই খাপ খাচ্ছে না। আর এ তোর পক্ষে স্বাভাবিক নয় ব'লেই তোর সম্বন্ধে আমার ভয়ও তো ভাঙ্‌চে না মা!

আমি হেসে তাঁকে উত্তর দিলুম—আমার জন্য তুমি কিছু ভেবো না মা। কলা-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য-শতদলের দলগুলো ফোটাবার ভার যার ওপরে, বসন্তের হাল্‌কা হাওয়াই যে তার বাহন।

মা আমার কথা বুঝলেন কি না জানিনে। কিন্তু ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি চ'লে গেলেন।...

মার আর একটা দিনের কথাও আজ মনে পড়্ছে। স্নেহের দাবী এমনি অন্তর্যামী যে, যে বিপদের আশঙ্কা কোনো দিন আমার মনেও স্থান পায়নি, মার কাছে তাই প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছিল। আকাশে সেদিন জ্যোৎস্নার সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে। তারি ঢেউগুলো গড়ের মাঠের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে-পড়া গাছগুলোর মাথায় জ্বল্‌ছিল। চাঁদের আলোর সেই বন্যায় আকাশের তারাগুলিও যেন ভেসে এসে ছট্‌কে পড়েছিল দূরে দূরে রাস্তার ধারে ধারে যে গ্যাস পোষ্ট-গুলি আছে তাদেরি কাচের জালে ঘেরা খাঁচার ভেতরে। সব জিনিষই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট নয়—সবই আবছায়া। এই আবছায়াই মনের রাজ্যে মায়ালোকের সৃষ্টি করে। শিল্পীর সঙ্গে সারা সন্ধ্যা এই মায়ালোকের মধ্যে কাটিয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌তেই দেখি, মা আমার ঘরের ভেতর স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বল্লেন—ভারি ভাবিয়ে তুলেছিলি মিনু। এত রাত একা একা বাইরে তো থাক্‌তে নেই মা!

হেসে বল্লুম—একা ছিলুম না—শিল্পী সঙ্গে ছিল। মাঠে যা জ্যোৎস্না মা, যদি দেখ্‌তে, তোমারও ফির্‌তে ইচ্ছা হ'তো না।

আমার মুখে কি ছিল জানিনে, সেই মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মা বল্লেন—শিল্পী সঙ্গে থাক্‌লেই একা থাকার দোষ যে কাটে না, এটা বোঝার মতো বয়স তোমার হয়েছে বাছা। তা ছাড়া, সমীর এগুলো পছন্দ হয়তো না-ও কর্‌তে পারে।

সমীরদার সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সব সম্পর্ক যে একখানা চিঠির মারফৎ চুকিয়ে দিয়েছি, সে কথাটা মনে হ'তেই বুকের ভেতরটাতে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ্ করে বিঁধ্‌ল। একটু ম্লান হেসে বল্লুম—সমীরদা কিছু মনে কর্‌বেন না মা। কিছু মনে কর্‌বার অধিকার আর তাঁর যে আমার ওপর নেই, চিঠি লিখে সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি।

চেয়ে দেখ্‌লুম, মার সেই চিরহাস্যে-জ্জ্বল মুখ এক মুহূর্ত্তে একটা বেদনার আঘাতে ম্লান হ'য়ে কালো হ'য়ে গেল। অনেকক্ষণ তিনি স্তব্ধ হ'য়ে সেই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর বল্লেন—চিঠি লিখে দিয়েছ—আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসাও কর্‌লে না?

মার সে রকমের মুখ আমি আর কখনো দেখি নি। সেই কাতর-বিহ্বল মুখের চেহারাটা আমার বুকখানাকে যেন হাতুড়ির পর হাতুড়ির ঘা দিয়ে পীড়ন কর্‌তে লাগল। আমি মার বুকের পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বল্লুম—অপরাধ হয়েছে মা, আমাকে মাফ করো। কিন্তু সমীরদাকে আর একটা দিনও মিথ্যে আশায় ভুলিয়ে রাখা যে আমার অন্যায় হ'তো!

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আমার চুলগুলো আঙুল দিয়ে চিরে দিতে দিতে মা বল্লেন—মার ব্যথা, মার ভয় ভাবনা—এ যে কি রকমের তা তো জানিস্ নে! তোকে সমীরের হাতে দিতে পারলেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু তা যখন হ'লোই না, আমি তোর বিয়েটা শীগ্‌গির সেরে ফেল্‌তে চাই। তুই না পারিস আমি কাল শিল্পীকে বল্‌ব।

লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠে মাকে বল্লুম—তোমাকে কিছু কর্‌তে হবে না মা, আমিই সব ঠিক ক'রে নেবো।...

পরের দিন শিল্পী আস্‌তেই হেসে বল্লুম—মা তোমাকে পাকাপাকি ভাবে বাঁধ্‌বার চেষ্টায় আছেন, অতএব সাবধান!

বড় বড় চোখ দু'টো আমার মুখের ওপর বিস্ফারিত ক'রে দিয়ে শিল্পী বল্লে—অর্থাৎ—

আমি বল্লুম—অর্থাৎ আমাকে যদি তোমার সত্যিকার প্রয়োজন থাকে, তবে তার আগে আমার ওপর তোমার

দাবীর অধিকারটা পাকা ক'রে নিতে হবে—এই হ'লো মার আদেশ!

মনে হ'লো শিল্পীর চোখের চেহারাটা এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন বদ্‌লে গেল। কিন্তু তার পরেই হাত দু'টো আমার দিকে বাড়িয়ে বল্লে—মার কি আদেশ জানিনে, জান্‌বার প্রয়োজনও নেই আমার। তোমার আদেশ, সেই তো আমার পক্ষে যথেষ্ট।

তার প্রসারিত হাত দু'টোর ভেতর আপনাকে ফেলে দিয়ে বল্লুম—ফুল যে কেন বিকিয়ে দেবার জন্য আপনাকে বিকশিত ক'রে তোলে তোমাকে দেখেই তার কারণ বুঝ্‌তে পেরেছি বন্ধু। নারীর তো সঞ্চয় ক'রে রাখবার অধিকার নেই!

* * * *

আরো কয়েকটা মাস ঝড়ের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। পেছনের দিকে তাকানো নেই। কেবল সাম্নের দিকে ছুটে চলা—কি উদ্দাম তার গতি, কি উন্মাদ তার ভঙ্গী! রক্তের ভেতর যখন আগুন ধরে, তখন তার বাষ্প দেহটাকে ঝড়ের ভেতর দিয়ে এমনি ক'রেই টেনে নিয়ে যায়। মনের ইঞ্জিন—সংযত ক'রে রাখা যার কাজ, সেও মাতাল হ'য়ে উঠে' দু' হাত দিয়ে হাততালি বাজিয়ে রাশটাকে শ্লথ ক'রে দিয়ে অট্ট হাসি হাস্‌তে থাকে।

কিন্তু ঝড়ের দোলাও থামে। আমার মনের ঝড়ের দোলা যখন থাম্‌ল, চেয়ে দেখি আমার সমস্ত দেহ রিক্ততায় ভ'রে গেছে—কোথাও নিজের ব'লে আর এতটুকুও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু এ রিক্ততার জন্য কোনো ক্ষোভ নেই আমার। নারী তো আপনাকে রিক্ত ক'রে দিয়েই সার্থক!

কিছু দিন থেকে শিল্পীর ভেতরেও একটা পরিবর্ত্তন দেখতে পাচ্ছি। তার চুমোর ভেতরে যেন সে আবেশ আর নেই। আলিঙ্গন তার ব্যগ্র ব্যাকুল দুঃসহ অথচ মধুর বিদ্যুতের স্পর্শটাকেও যেন হারিয়ে ফেলেছে। হয় তো তার পিপাসা মিটে গেছে—কিন্তু আমি!—পিপাসায় যে এখনো আমার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আছে! হায় নারী, তুমি যখন রিক্ততার নেশায় মেতে ওঠো, পুরুষের মনে তখন চল্‌তে থাকে আপনাকে ভরাট ক'রে নেবার সাধনা। তবু এই পুরুষকেই নারী চিরকাল তার সর্ব্বস্ব অর্পণ করে এসেছে।

ব'সে ব'সে ভাবছি—মা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে' বল্লেন,—মিনু তোর বিয়ের দিন এই মাসেই ঠিক ক'রে ফেল্‌লুম।

আমি হেসে উত্তর দিলুম—বিয়ের মালিক তো আমি একলা নই মা।

মা বললেন—সে তো জানি, আর সেই জন্যই তো আমার আজ ভয়েরও অন্ত নেই! আজ ক'দিন তাকে দেখছি নে। এখন মাঝে মাঝেই এরকম হচ্ছে। তার চোখের দিকেও তাকিয়ে দেখেছি, যে নেশার রং তরুণ তরুণীর চোখে আলোর ঝর্ণা ঝরায় তা যেন ফুরিয়ে গেছে। এ কথাটা কি তুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস নে? আমাকে লজ্জা করিস্ নে মিনু, জানিস্, মার বাড়া বন্ধু মেয়ের আর দ্বিতীয় নেই!

মার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে' নিয়ে বল্লুম—আমার মার মতো মা যে পেয়েছে সে কথা কি তাকেও ব'লে দিতে হবে মা! কিন্তু বোঝাবুঝির হিসেব-নিকেশের কোনো খোঁজই যে আমি রাখি নি।

চেয়ে দেখ্‌লুম চিন্তার রেখা ধীরে ধীরে মার মুখে একটা কালির প্রলেপ টেনে দিয়ে ঘনিয়ে উঠ্‌ল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে তিনি বল্লেন—মিনু, তুই তার 'ষ্টুডিও' চিনিস্?

আমি বল্লুম—হ্যাঁ চিনি।

মা বল্লেন—দুপুরে আজ আমাকে নিয়ে তার 'ষ্টুডিও'তে তোকে যেতে হবে।

আমি বল্লুম—আচ্ছা।

আষাঢ় মাসের পনেরো দিন পেরিয়ে গেছে, তবু পৃথিবীর গায়ে এক ফোঁটা জল ঝর্‌ল না। বন্ধ্যা প্রকৃতির চেহারাটা তৃষ্ণায় যেন চৌচির হ'য়ে ফেটে পড়েছে। তাপমান-যন্ত্রে এবার কল্‌কাতার উত্তাপ ১০৯ ডিগ্রি। রাস্তা ঘাট প্রায় রাত্রির মতোই নির্জ্জন। সেই নির্জ্জন রাস্তা ঘাটের ওপরেই শুভ্র রৌদ্রের হাসির টুক্‌রোগুলো জ্বল্‌ছিল রুদ্র রূপের মশাল জ্বালিয়ে। রূপের নেশা যে ধ্বংসের পথকেও আলো ক'রে চলে, আজকার রৌদ্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ রৌদ্রের দিকে তাকালে চোখ জ্বালা করে, কিন্তু তবু চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

রাস্তায় দেখলুম একটা মোষের গাড়ীর ওপর একটা

ছোট-খাট দুনিয়াকে চাপিয়ে দিয়ে গাড়োয়ান নিশ্চিন্ত মনে চাবুক চালাচ্ছে। উপরের চাপে গাড়ীর চাকা, মোষের পা রৌদ্রে গলা পিচের রাস্তার ওপর ব'সে পড়ছে, সে দিকে আজ আর তার নজর নেই। কারণ সে ঠিকই জানে যে এই আগুনের প্রাচীর ডিঙিয়ে আধা জলচর আধা স্থলচর জীব-গুলোর খবরদারী কর্‌বার জন্য C. S. PC. A.র বাবুরা কেউ আজ বেরিয়ে আস্‌বে না। একখানা ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া আমাদের চোখের সাম্‌নেই হুঁচুট খেয়ে মুস্‌ড়ে পড়ল। গাড়ীর ছাদটা খস্‌খসের ভেজা পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। যারা আরামে আছে দুনিয়ার আরামের পান-পাত্র প্রতি মুহূর্ত্তে তাদেরি মুখের সম্মুখে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে; কিন্তু তৃষ্ণায় যাদের বুকের ছাতি ফেটে যায়, এক ফোঁটা জলও তাদের কাছে দুর্লভ।

মাকে নিয়ে শিল্পীর ষ্টুডিওতে ঢুকে' পড়লুম। দেখি ইলার পা'র কাছে সে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে আছে। দু' জনার মুখেই একটা স্বপ্নের নেশা জড়ানো। ইলা আমার বন্ধু। মাস-খানেক আগে শিল্পীর সঙ্গে আমিই তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম।

উভয়ে ত্রস্ত হ'য়ে উঠে' বস্‌তেই মা বল্‌লেন—মনে করেছিলুম ঘরে তুমি একা আছ, তাই খবর না দিয়ে ঢুকে পড়েছি, কিছু মনে ক'রো না বাবা। কিন্তু তোমার সঙ্গে একলা যে আমার একটু প্রয়োজন আছে।

ম্যাটিংএর ওপর ছড়িয়ে-পড়া তুলি কাগজ পেন্সিলগুলো কুড়ুতে কুড়ুতে শিল্পী বল্‌লে—মিস্ রায়, আজ আর আপনার ছবি নেবার হয়তো সুবিধে হবে না, কাল দুপুরে যদি একবার পায়ের ধুলো দেন এখানে। কোন্ পাটুনীর কাঠের নৌকো অন্নপূর্ণার পায়ের স্পর্শে নাকি সোণার নৌকোতে পরিণত হ'য়েছিল। এর ভেতর কতটুকু সত্য আছে জানিনে, কিন্তু শিল্পীরা যে আপনাদের পায়ের ধুলোর স্পর্শ পেয়েই কাগজের গায়ে সৌন্দর্য্যের সোনা ঝরায়, তার খবর আমিই জানি। চলুন আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

ইলা আমার দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাকে চুপি চুপি বল্‌লুম—মা ফিরে চলো। দুঃখ যা পেয়েছি তাই ঢের, এর পর আর অপমান কুড়িও না।

ধীরে ধীরে আমার মুখের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মা বল্‌লেন—অপমান যদি অদৃষ্টে লেখাই থাকে মিনু, আমি এড়াতে চাইলেও তো তাকে এড়াতে পার্‌বো না। তুই বরং তার চেয়ে গাড়ীতে গিয়ে বোস্, আমি এদিককার বোঝা-পড়াটা শেষ ক'রে নিয়েই ফিরে আস্‌ছি।.....

গাড়ীতে কতক্ষণ ব'সে ছিলুম মনে নেই। হঠাৎ চেয়ে দেখি সফার মাকে গাড়ীর দরজা খুলে' দিচ্ছেন দুর্দ্দিনের ভারি জমাট কান্নাভরা মেঘে তাঁর সবটা মুখ আচ্ছন্ন।

* * * *

মা গো মা, কি অসহ্য গুমোট! বুকের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এ কি ঘোলাটে থম্‌থমে পাংশুবর্ণ মেঘের গাদায় ভ'রে গেছে! দু' ফোঁটা জল ঝরে না! এই মুহূর্ত্তে বাষ্পের বেগে বুকটা ফেটে যদি চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যায় বেশ হয়।

হঠাৎ কিসের লোভে এই লবণ-সমুদ্রের মাঝখানটায় যে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, আজ ভেবেও তার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে। তখন যে জিনিষটা মুগ্ধ ক'রেছিল, আজ দেখ্‌ছি সেটা তো ক্লেদে কাদায় ভরা—বীভৎস—কুৎসিত। দেহে তার যে আলো জ্বল্‌ছে, সে আলো তো সর্ব্বনাশের আলো—সে আলোতেও মানুষের মন ভোলায়!

চিরকাল মনে মনে Cultureএর একটা গর্ব্ব ক'রে এসেছি, কিন্তু সে গর্ব্ব আমার কোথায় রইল!

আজ তার ভেতরের অজস্র বৈষম্যের দিকে নজর পড়্‌ছে আর নিজের পায়ে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডটা থেঁথ্‌লিয়ে গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌বার জন্য মন মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ছে! আশ্চর্য্য হচ্ছি, এগুলো এর আগে আমাকে ঘা দিতে পারেনি কেন! তার উচ্চ হাস্য, তার কথা, তার গান, এমন কি তার শিল্প-রচনা—এ সমস্তর ভেতর দিয়ে যে একটা বীভৎস বর্ব্বরতার ইঙ্গিত সঙ্গীনের মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে তো লুকোবার জিনিষ নয়। মানুষের সহজ সামাজিক আবেষ্টনের ভেতর দিয়ে যে Culture গ'ড়ে ওঠে, তার চলা-ফেরা, তার আকার-ইঙ্গিতের ভেতর তারও তো কোনো দাবী ছিল না। তবু সে আমাকে জয় ক'রে নিলে—এক নিমেষের জন্য ভাব্‌তেও দিলে না কোথায় নিয়ে চলেছে—কিসের উদ্দেশে! যার ছদ্মবেশ ধরা যায় না, সে

যদি এসে ভুলের পথে টেনে নিয়ে যায়, সে হয়তো সহ্য হয়। কিন্তু এ আমি কি ক'রে সহ্য কর্‌ব?...

ঘরের ভেতর মনের গাঢ় অন্ধকারটাকেই চোখের সাম্‌নে বিছিয়ে নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি, মা এসে বল্‌লেন—মিনু, ওর সঙ্গে আমার সে-দিন যে কথাগুলো হ'য়েছিল তা তোর শোনা দরকার।

মা হয়তো ভাব্‌ছেন, তার মোহের নাগপাশটা এখনো আমার কাঁটেনি, তাই তার ধ্বংসের জন্য শেষ অস্ত্র এই গরুড় বাণটাই নিক্ষেপ কর্‌তে হবে! আমি তাড়াতাড়ি বল্‌লুম—কিচ্ছু দরকার নেই মা। আমি সেদিন তোমার মুখ দেখেই সব কথা বুঝে' নিয়েছি।

মা বল্‌লেন—কিছুই বুঝিস্‌নি তুই। মানুষের স্পর্দ্ধা তার হৃদয়হীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে মিশে যখন ভাষা পায়, সে যে কত বড় বীভৎস ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে না শুন্‌লে তার ধারণা করা অসম্ভব। সে বর্ব্বরতার ছবি আমি হয়তো হুবহু আঁক্‌তে পার্‌ব না—তবু শোন্।

তোকে তো ঘর থেকে বা'র ক'রে দিলুম—দিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় সে ঘরে ঢুকেই বল্‌লে—এইবার কি চান আপনারা আমার কাছে বলুন।

আমি বল্‌লুম—তোমার কাছে এসেছি বাবা, মিনতির বিয়ের দিনটা স্থির ক'রে ফেল্‌বার জন্য। আর তো দেরী করা চলে না।

সে বল্‌ল—তার জন্য রৌদ্রের এই অগ্নিদাহ মাথায় নিয়ে এখানে আস্‌বার তো কোনই প্রয়োজন ছিল না আপনাদের।

আমি বল্‌লুম—কিন্তু তোমার সুবিধে যে কবে হবে সে কথার তো কিছুই আমাকে জানাও নি।

সে বল্‌লে—আমার সুবিধে অসুবিধেতে কি আসে যায় আপনাদের? বিয়ে হবে আপনার মেয়ের, আমার নয়।

তড়িৎ স্পৃষ্টের মতো বিস্মিত বিহ্বল চোখ্ তুলে' তার মুখের পানে চাইতেই সে আবার বল্‌লে—আমার সঙ্গে যদি তার বিয়ে দেবার কল্পনা আপনারা ক'রে থাকেন, সে ইচ্ছা আপনাদের পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। আমি চিরকুমার থাক্‌বার ব্রত নিয়েছি।

আমি বল্‌লুম—কিন্তু আমার মেয়ে যে কুমারী, সে কথাটাই বা তুমি তবে ভুলে গেলে কেন? তুমি তাকে বিয়ে কর্‌বে এই প্রতিশ্রুতি দিতেই তো আমি তোমার সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশায় কোনো রকমের বাধার সৃষ্টি করিনি।

সে বল্‌লে—প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম কি না মনে নেই। দিয়ে থাক্‌লে ভুল করেছিলুম। কিন্তু তখন যে তাকে দিয়ে আমার প্রয়োজন ছিল। শিল্পীর ধর্ম্ম অনেকটা প্রজাপতির ধর্ম্মের মতো। ফুলের বুক থেকে সে তার শোভা-সৌন্দর্য্যই তো চয়ন ক'রে নেয়—ফুলের ভাণ্ডারে কোথায় কোন হানি হ'ল তার দিকে তো তার তাকাবার অবসর নেই। মানুষের ভেতরের এই ফুলগুলোকে মালার মতো গলায় জড়িয়ে নিয়েই শিল্পী তার কলালক্ষ্মীর জন্য সৌন্দর্য্যলোকের স্বপ্ন রচনা করে। তারপর যদি কোনো ফুলের সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, মালা থেকে সে তো ঝ'রে পড়্‌বেই।

দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মাকে বল্‌লুম—থামো মা, থামো—আর আমি শুন্‌তে চাই নে।

ধীরে ধীরে আমার মাথাটা তাঁর কোলের উপর তুলে' নিয়ে মা বল্‌লেন—কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে মা, আমার মেয়েকে সে কিসের জোরে জয় ক'রে নিলে!

মার বুকের ভেতরে মুখ লুকিয়ে ভাঙা গলায় বল্‌লুম—মা সর্ব্বনাশের Siren যখন কানের কাছে বাঁশী বাজাতে থাকে, মানুষের উচ্ছৃঙ্খল মন তো এমনি করেই তার হাতে ধরা দেয়। আগুনের আঁচের স্পর্শ পাখার ওপর লাভ ক'রেও তো পতঙ্গ ফির্‌তে পারে না। আমার ভেতর দুর্ব্বলতার যে কুশ্রী ক্লেদটা জমে ছিল, তার উচ্ছৃঙ্খলতার সবল কীট-গুলো তারি ভেতর বাসা বেঁধে শক্তি সঞ্চয় করেছে। সাবধান হ'তে পারিনি, তাই এ কদর্য্যতার গ্লানির হাত হ'তেও আমার মুক্তি হ'ল না।

মুখটা বুকের ভেতর চেপে ধ'রে রেখে, আস্তে আস্তে চুলগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মা বল্‌লেন—সমীরের কিছু খবর রাখিস মিনু—সে কোথায় আছে?

মার কোলের ভেতর হ'তে দেহটা তুলে' নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মাকে বল্‌লুম—আমি জানিনে মা, তুমিও জান্‌তে চেষ্টা করো না। এই বিশ্রী নোংরা পাঁকের ভেতর যদি তাঁকে টান্‌তে চেষ্টা করো, আমি আত্মহত্যা কর্‌ব।

মাকে তো বল্‌লুম—কিন্তু সেই একটি লোকের কথাই

তো আজ দুলে' উঠ্‌ছে আমার চিত্তকে মথিত করে, আমার সমস্ত চিন্তার ভেতর। আনন্দের আলোকের দিনে দেবতাকে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে দুঃখের বজ্র যখন গর্জ্জাতে থাকে তখন দেবতার কথাই তো সকলের আগে মনে পড়ে।

জীবনের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে ঘৃণ্য দুর্ব্বলতাকে জয় কর্‌তে পারিনি; কিন্তু এ দুর্ব্বলতাকে জয় কর্‌ব। আলোকের ভেতর যদি দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে না পেরে থাকি, অন্ধকারের ভেতরেও তাঁকে টেনে আন্‌তে চেষ্টা কর্‌ব না।

* * * *

ওরে আমার বাছা, ওরে আমার মাণিক, তোর নাম আমি রাখ্‌লুম পঙ্কজ। যখন অনাগত ছিলি, অথচ তোর আসার সম্ভবনায় সমস্ত দেহ মন ভ'রে উঠেছিল, সে দিন কেউ তোকে চায়নি, আমিও তোকে প্রাণপণেই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিলুম। সেদিন তোর আহ্বানের মন্ত্র ছিল অশ্রু আর অভিশাপ। কাদায় যার সমস্ত রাস্তা ভরা, গ্লানির ভেতর দিয়ে যার উদ্ভব, গ্লানি আর কুণ্ঠা ছাড়া সে যে আর কিছু দিতে পারে সে কথা তো একবারও মনে হয়নি। কিন্তু যখন তুই এলি—একি অমৃতে সমস্ত মন ভ'রে গেল! কোথায় রইল গ্লানি, আর কোথায় রইল তোর মার সঞ্চিত পুঞ্জিত পাপের বোঝা! সব হাল্‌কা ক'রে দিয়ে, পঙ্কের সমস্ত দীনতাকে জয় ক'রেই তুই যে ফু'টে উঠেছিস অম্লান সৌন্দর্য্যে তোর মার অন্তর-সরোবরের মাঝখানটাতে। দুর্গন্ধ-দুষ্ট ক্লেদের ভেতর থেকে পদ্ম যে কেমন ক'রে অত শুভ্র সৌন্দর্য্য নিয়ে ফু'টে ওঠে, তার রহস্য তোকে পাবার আগে বুঝ্‌তে পারি নি। তোকে পেয়ে তবে আজ তা আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কি গভীর পাঁক জ'মে রয়েছে আমার দেহের শিরায় শিরায়, মনের আনাচে-কানাচে। আমার সেই সমুদ্রের মতো অপার অগাধ পাঁককে নির্ম্মল শুচিতায় ভ'রে দিয়ে আজ তুই চোখ মেলেছিস্, তাই তো তোর নাম রাখ্‌লুম পঙ্কজ।

তোকে পাবার আগে প্রতিদিন মনে হয়েছে—যে পথ মৃত্যুর দরিয়ার দিকে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে, সে পথ ফুরোয় না কেন? আজ মনে হচ্ছে পথটা আর একটু বেড়ে গেলেও মন্দ হ'ত না। তা হ'লে হয়তো তোকে ফুটিয়ে তুলে' রেখে যাবার অবকাশ পেতুম। কিন্তু সে তো আর হয় না—প্রতি মুহূর্ত্তে পরপারের আহ্বান আমার চোখের সাম্‌নে আলোর ভেতর অন্ধকারের জাল রচনা ক'রে চলেছে। এই দণ্ডেই মৃত্যুর দূত যদি এসে বলে—তাঁবু তোল, যাত্রার বোঝা ঘাড়ে নাও, তাতেও আমি বিস্মিত হব না।

এত দিন আপনার ভাবনা নিয়েই মত্ত হ'য়ে ছিলুম; কিন্তু আজ নিজের কথা আর এতটুকুও মনে আস্‌ছে না। আজ আমার সব ভাবনা হারিয়ে গেছে একা তোর ভাবনার মাঝখানে। যাবার সময় তো ঘনিয়ে এল, কিন্তু ওরে আমার মূক মৌন অসহায় মেয়ে, তোকে কার কাছে রেখে যাব, কে তোকে স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে মায়া দিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌বে? জানি, আমার মার কাছে তোর আদর যত্নের অভাব হবে না, কিন্তু এ কথাও জানি, তিনি তোকে প্রসন্ন হাসির সঙ্গেও কখনো গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বেন না। যে তাঁর মেয়ের মাথার ওপর দুঃসহ কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে সে তো তাঁর মনকে কাঁটার খোঁচার মতো ক'রেই বিঁধবে। কিন্তু ফুলকে যে ফুটিয়ে তোলে, আদর যত্নের চেয়ে বড় জিনিষ তাকে দিতে হয়। মাটির মনের রসেই বসন্তের মুখে হাসির রেখা ফুটে' ওঠে—তার বুকে পরিপূর্ণ বিকাশের প্লাবন জাগে!

আজ আবার নতুন ক'রে সমীরদার কথা মনে পড়্‌ছে। মানুষের মনের পশু যখন জাগে, তখন সম্মুখের আলোর দীপ্তিটাও তার চোখে পড়ে না। ভুল যে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, সমীরদা হয়তো তা বুঝতেন। তাই পঙ্কের ওপরে তার কোনো লোভ না থাক্‌লেও পঙ্কজকে তিনি হয়তো উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌তেন না। ফিরে এস সমীরদা, তুমি ফিরে এস। এ জীবনে যে ভার নামাতে পার্‌লুম না, অজানা পথ-যাত্রায় সেই ভারটা অন্ততঃ একটু হাল্‌কা ক'রে দাও ভাই—আমি বেরিয়ে পড়ি!

* * * *

ডায়েরীর পাতাগুলো এইখানেই শেষ হয়েছে। কিন্তু সে যা বেদনার অশ্রু ঝরিয়ে গেল, তার তো শেষ নেই। মিনতিকে পাই নি; সে যে আমার কত বড় বেদনা তা আমিই জানি। তবু তাকে পেয়ে যে তাকে বঞ্চিত করিনি সেইটেই ছিল আমার পরম গর্ব্ব-সুগভীর সান্ত্বনা। কিন্তু আজ মনে

হচ্ছে জোর ক'রে তাকে লাভ কর্‌বার চেষ্টা করি নি কেন? এতদিন পরে আজ মনের ভেতর স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে—কেবলমাত্র ভালোবাসাতেই প্রেম সার্থক হয় না—প্রেমাস্পদকে প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করাও প্রেমের ধর্ম্ম। এই মুহূর্ত্তে যদি সেই কাপুরুষটাকে হাতের কাছে পেতুম!

মিনতির আহ্বান আমার কাছে বেলা-তটের ওপর সমুদ্র যেমন ক'রে কেঁদে ফেটে লুটিয়ে পড়ে তেমনি ক'রে লুটিয়ে পড়্‌তে লাগল। কাগজগুলো গুটিয়ে বুকের পকেটে ফেলে পথে বেরিয়ে পড়লুম। পায়ের তলায় তো বিদ্যুতের গতিকে টেনে দিয়েছি, তবু পথ ফুরোয় না কেন?.....

চোখের সাম্‌নে জেগে আছে সৃষ্টি-প্রভাতের প্রথম পদ্মটির মতো মিনুর মুখ—সৌন্দর্য্যের বন্যায় ভরা—লাবণ্যের প্রভায় অপরূপ! প্রভাতের রূপ বদ্‌লে গেছে, আকাশের বুক প্রলয় ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে স্তম্ভিত। সমুদ্র তারি তালে তালে ক্ষ্যাপার মতো অসম্বৃত স্পর্দ্ধায় দুল্‌ছে। পৃথিবী কাঁপ্‌ছে—তারা খস্‌ছে, কেবল স্থির হ'য়ে আছে সৃজন-প্রভাতের প্রথম পদ্মটি, যার মুখ আমার মিনতির মুখের মতো;—একটি দল তার খসে নি—একটি কেশর তার ঝরে নি!

হঠাৎ চেয়ে দেখি পায়ের গতি থেমে গেছে আঠারো বৎসরের পরিচিত পথটার মাঝখানে—মনুদের বাড়ীর সম্মুখে! মানুষ ভোলে, কিন্তু মানুষের পা তার চিরন্তনের অভ্যাস্ ভুল্‌তে পারে না।

ভেতরে ঢুকে' চিরদিনের পরিচিত ঘরটার সম্মুখে দাঁড়াতেই শুন্‌তে পেলুম, ক্ষীণ দুর্ব্বল কণ্ঠে মিনতি বল্‌ছে—রীতি, দেখ্‌তো ভাই, বাইরে কার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি। ও পায়ের শব্দ যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের চেনা।

ভেতর হতে রীতি বল্‌লে—ও কিছু নয় দিদি, তুই একটু ঘুমো।

মিনতি বল্‌লে—না রে তুই বুঝতে পার্‌ছিস্‌নে—আমি ঠিক চিনেছি ও আমার সমীরদার পায়ের শ'ব্দ।

ওরে অভাগী, আমার পায়ের শব্দটাকেও এমন ক'রে চিনে রেখেছিস্! চোখ ফেটে জলের ঝরণা নেমে এল। কোনো রকমে তাকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে, মুখে একটু হাসির রেখা টেনে ঘরে ঢুকে' বল্‌লুম—হ্যাঁ মিনু, তোমার সমীরদাই বটে। কিন্তু তার পায়ের শব্দটাকে আজও ভুলে' যাওনি ভাই?

রীতি ধীরে ধীরে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল। মিনতির হাত দুটো হাতের ভেতর টেনে নিয়ে আমি তার মাথার কাছে ব'সে পড়লুম।

মিনতি বল্‌লে—ওখানে নয় সমীরদা, এইখানটায় স'রে ব'সো, আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছিনে।

স'রে এসে পাশে বস্‌তেই তার হাত দুটো আমার হাতের ভেতর ছেড়ে দিয়ে সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইল। তার দেহের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরটা একেবারে হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল। পরিপূর্ণ নিটোল দেহটা ভেঙে টোল খেয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। গোলাপফুলের পাপড়িগুলো দেহের বোঁটা থেকে ঝ'রে প'ড়ে কোথায় যে হারিয়ে গেছে তার চিহ্নটুকুও নেই। কূলে কূলে ভরা চোখের কোণ কোটরের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। সেখানে একটা অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বলতা চক্ চক্ কর্‌ছে। কেবল মুখের দীপ্তিটা এখনও নিভে যায় নি। প্রভাতের শুক-তারাটা ভোরের আকাশে যেমন দপ্ দপ্ করে জল্‌তে থাকে, তার মুখের ভেতরেও তেমনি একটা ঝ'রে পড়ার দীপ্তি জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠ্‌ছিল।

মিনতি আমার কথার জের টেনে বল্‌লে—পায়ের শব্দটা মনে আছে দেখে বিস্মিত হচ্ছ সমীরদা; কিন্তু বিস্মিত হবার তো কোনো কারণ নেই। মনটাকে যদি খুঁজে দেখ, দেখ্‌তে পাবে, তার ভেতর থেকে এক ফোঁটা জিনিষও তোমার হারিয়ে যায় নি। এই মনটাকে খুঁজে দেখিনি ব'লেই তো আমি নিজেও জ্বল্‌লুম, তোমাকেও জ্বলিয়ে গেলুম। তোমার বুকে যে কি দাগা দিয়েছি তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তবু তোমাকে যে দুঃখ দিয়ে গেলুম, জানি, সে তোমার সইবে। কিন্তু আমার বুকের ওপরে যে পাথরের বোঝা নিয়ে গেলুম, সে বোঝা আমার ইহকালে তো ঘুচ্‌লোই না, পরলোকেও ঘুচ্‌বে কি না কে জানে!

'যে ঝরণাটাকে বাইরে রোধ ক'রে এসেছিলুম সে ঝর্‌ণাকে আর রোধ করতে পার্‌লুম না, ঝর্ ঝর্ ক'রে তা মিনতির হাতের ওপরেই ঝ'রে পড়তে লাগ্‌ল। ধারার স্পর্শ পেলে যূথীর দলগুলো যেমন হঠাৎ আচম্‌কা ফুটে' ওঠে, তেমনি একটু মিষ্টি হেসে মনু বল্‌লে—ছিঃ সমীরদা, আমার যাওয়ার পথটাকে আর ভিজিয়ে দিও না ভাই। যে শক্তি

নিয়ে মানুষ পিছল পথে পা বাড়ায় সে শক্তি যে আমার নিঃশেষেই নষ্ট হ'য়ে গেছে।

অসম্বৃতের মতো সেই অদ্ভুত অপূর্ব্ব হাসিটির ওপর উত্তপ্ত ব্যগ্র ঠোঁটের একটা স্পর্শ ঢেলে দিয়ে বল্লুম—তোমার তো যাওয়া হবে না মিনু। একলা এখানকার মরুভূমিতে আমি থাক্‌তে পার্‌ব না। দেখ্‌ছ তো বিনা রোগেই তোমার সমীরদা কেমন শুকিয়ে উঠেছে!

তার চোখের সেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টিটা আমার মুখের ওপর ফেলে মিনু বল্‌লে—পাঁকের ভেতর যে ফুল ঝ'রে পড়ে তা দিয়ে তো কখনো দেবতার পূজা হয় না। একটু আগে যে স্পর্শটা তুমি আমার ক্লেদ-ক্লিন্ন অধরের ওপর ঢেলে দিয়েছ সেই আমার ঢের। আমার পরপারের অন্ধকার পথ তারি আলোকে আলোময় হ'য়ে উঠেছে। এর বেশী আমিও চাইনে, তুমিও চেয়ো না সমীরদা।

শীর্ণ দেহটাকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্লুম—কাদা হয় তো কিছু তোমার গায়ে লেগেছিল মিনু। কিন্তু কাদা তো অত্যন্ত ক্ষণিকের জিনিষ। সে কাদা তো কবে ধুয়ে' মুছে' নিশ্চিহ্ন হ'য়ে উঠে গেছে। তা ছাড়া সোনার ভেতরের খাদকেই যদি শুধ্‌রে নিতে না পার্‌বে তবে প্রেমের আগুন রয়েছে কেন?

ধীরে ধীরে আমার আলিঙ্গনের ভেতর থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে নিয়ে মিনতি বল্‌লে—তা হয় না সমীরদা, পাঁককে পরিষ্কার কর্‌তে গেলে সে যে পরিষ্কার জলকেও ঘোলা ক'রে তোলে। দিনও তো আমার ফুরিয়ে এসেছে ভাই, ঐ শোনো, বীণাতে আজ বিদায়ের সুরই বাজ্‌ছে, মিলনের কোনো রাগিণীই তো এর সঙ্গে খাপ খাবে না।

তার পর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে প'ড়ে থেকে তার শুভ্র শীর্ণায়মান হাত দুটোর ভেতর আমার হাত দু'টোকে টেনে নিয়ে সে আবার বল্‌লে—পৃথিবীর আলো আমার কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে সমীরদা। আমি যেতে চাই—কিন্তু যেতে পার্‌ছিনে।—কেন জানো? পিছন থেকে আমাকে টান্‌ছে আমার ঐ নাম-গোত্রহীন মেয়েটা। তার ভার তুমি নাও ভাই, নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও। পাঁকের ভেতর সে জন্মেছে বটে, কিন্তু পাঁকেই তো পঙ্কজও জন্মে। ঐ দোলার ভেতর সে ঘুমিয়ে আছে। তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, তার মা'র গ্লানি তার দেহকে এতটুকু স্পর্শ কর্‌তে পারে নি।

আস্তে আস্তে মিনতির মাথাটা বালিশের ওপর নামিয়ে দিয়ে দোলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখ্‌তে পেলুম, একটা রক্ত মাংসের শতদল, শুভ্র শয্যার বুকটা আলো ক'রে ফুটে' রয়েছে। দুর্য্যোগ রাত্রির পরে ভোরের মুখে যে হাসিটি ফুটে' ওঠে, তার মুখেও তেমনি একটি স্নিগ্ধ হাসির রেখা। ঘুমন্ত শিশুটিকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বল্লুম—এ যে একেবারে তোমার ছেলেবেলার চেহারাটাকেই ফিরিয়ে এনেছ মিনু!

ম্লান হেসে মিনতি বল্‌লে—আশীর্ব্বাদ করো সমীরদা, আমার মতো দুর্ভাগিনী না হয়। ওকে তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি। ওর রক্তের ভেতর যে দোষটা থাক্‌ল, তোমার হাতের স্পর্শে তারও গ্লানিটা যেন ওর ঘুচে' যায়।

পঙ্কজকে কোলে নিয়ে মিনতির কাছে ফিরে এসে বল্লুম—তোমার আমার জন্য না চাও, এই নিষ্কলঙ্ক শিশুটির মুখের দিকে চেয়ে, দু'দিনের জন্য হোক, এক দিনের জন্য হোক্ তুমি আমার ঘরে চলো। একে এমন ক'রে নাম-গোত্রহীন ক'রে রেখে যেও না ভাই।

মিনতির তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টির ভেতর হঠাৎ যেন একটু বিহ্বলতার আমেজ জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পরেই দেখি, তার চোখে আগুনের মতো সেই আলোটা আবার ফিরে এসেছে, যার সাম্‌নে কোনো অন্ধকারই টিক্‌তে পারে না। সেই দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌লে—মিথ্যার দ্বারা ওর মায়ের কলঙ্ক ঢেকে ওকে সুখী কর্‌তে পার্‌বে না সমীরদা। তার চেয়ে ও যা ওকেও তাই জান্‌তে দিও, জগৎকেও জান্‌তে দিও। দুঃখের আগুনে পুড়ে'ই যে মানুষ সোনা হয় তার পরিচয় আমার এই জীবনেই আমি পেয়েছি।

মিনতির চোখের আগুন তখন আমার বুকের ভেতরেও আলোর রেখা এঁকে দিয়েছে। সে আলোকে সত্যের রূপটা আমার চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্‌তেই আমি বল্লুম— বেশ তাই হবে মিনু। যে দুঃখের বজ্র বুকে নিয়ে তুমি সত্যকে লাভ করেছ, তার গৌরব হ'তে তোমার মেয়েকেও আমি বঞ্চিত কর্‌ব না। মানুষের জীবনে যে দুর্ব্বলতা প্রতিদিনকার ঘটনা, তাকে গোপন ক'রে অনেক

অনাচার সমাজের ভেতর বেড়ে উঠেছে। তোমার মেয়েকে দিয়েই যদি তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ কর্‌তে চাও, আমি তাকে সেই যুদ্ধের উপযোগী ক'রেই গ'ড়ে তুল্‌ব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ভাই, ওর ভার আমি নিলুম।

চেয়ে দেখি মিনতির মুখ একটা আকস্মিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। সে দীপ্তিতে ঝরার গানের কথাই লেখা, কিন্তু সে ঝরার গানের ভেতর হ'তে বেদনার রেখাটাও নিঃশেষে মুছে গেছে।

* * * *

এর কয়েক দিন পরে নীতীশ তার বন্ধু সমীরের কাছ থেকে যে চিঠি পেলে তাতে লেখা ছিল—

এই-মাত্র মিনতির শ্মশান থেকে ফিরে আস্‌ছি, কাপড় বদ্‌লানো হয় নি। টেবিলের ওপর আমার টোটা-ভরা রিভল্‌ভারটা প'ড়ে আছে অদৃশ্য আগুনের তড়িৎ স্পর্শটাকে ধূমায়িত ক'রে তোল্‌বার জন্য। তোমার শিল্পী বন্ধুকে সাবধান ক'রে দিও। তাকে ব'লো—সমীর সেন বিলাতে গিয়ে লেখা-পড়া যতটুকু শিখে এসেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী ক'রে শিখে এসেছে জানোয়ারকে শায়েস্তা কর্‌তে। পশুর চেয়ে বড় জানোয়ার যে মানুষের মধ্যেই আছে সে কথা তোমার এই বন্ধুটি যেমন জানে আর কেউ তেমন জানে না।

আল্‌পসের গুহায়, আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে বড় বড় শিকারীদের হাত হ'তে বন্দুক যখন খ'সে পড়েছে—যার তা'ক তখনো ব্যর্থ হয়নি, সেই আবার নতুন ধরণের পশুর রক্ত-লোলুপতায় মেতে উঠেছে। আমার রিভলভারটি তার তারাহীন চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি হেনে বল্‌ছে, এবারেও ব্যর্থ হবে না।

আমার এ চিঠির মর্ম্ম তুমি বুঝ্‌বে কি না জানিনে, কিন্তু তোমার বন্ধুর কাছে এর অর্থ ধরা পড়্‌তে একটুও দেরী হবে না। তাকে ব'লো, মিনতির মেয়েকে নিয়ে আমি বিলেতে চল্‌লুম। যোগাড়-যন্ত্র করে বেরিয়ে প'ড়্‌তে যে কয়দিন দরকার, জীবনের প্রতি যদি তার মায়া থাকে তবে সে কয়দিনের ভেতর যেন আমার চোখের সাম্‌নে ধরা না দেয়।.....

চিঠি পেয়ে নীতীশ বিহ্বলের মতো খানিকক্ষণ ব'সে রইল। তারপর নিজের মনে মনেই বল্‌লে—সমীরের মাথাটা দেখ্‌ছি একেবারেই বিগ্‌ড়ে গেছে!

পদব্রজে সুন্দরবন

শ্রীসরোজেন্দ্র গুহ

যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং হোষ্টেলের ছাত্র আমরা একদিন বিকাল-বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। হঠাৎ আমাদের মাথায় এক খেয়াল চাপিল—এই শিবরাত্রির বন্ধে কোথাও বেড়াইয়া আসা চাই। তখন আমরা ঠিক করিলাম—ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত ট্রেনে যাইয়া তারপর পদব্রজে সুন্দরবনের সাগর-দ্বীপ ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন করিয়া আসিব।

ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে হয় ত আমাদের এই অভিযানের কোন মূল্য নাই। কারণ, রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর কৃপায় অনেকেই অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়াইয়া আসিতে পারেন; এবং তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনী হয় ত শুনিতে খুবই সুন্দর লাগিতে পারে। তবে সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ অঞ্চলে বনের পথে কোন ভ্রমণকারী গিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। সুন্দরবন সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অনেক রকম অদ্ভুত ধারণা আছে। অনেকে হয়ত মনে করেন, এখানে কেবল বাঘ ভাল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তুই থাকে, লোকের বসতি নাই। সেই জন্যই, প্রত্যক্ষ ভাবে এই জায়গাটার পরিচয় পাইতে, এবং—সমুদ্র দেখিতে পাইব, তাহাও কম লোভনীয় নহে,—তা আমরা সাগরদ্বীপ যাওয়াই ঠিক করিলাম। নির্দ্ধারিত দিনে (১২ই ফেব্রুয়ারী) আমরা সাত জন রাত্রি ৯-৪২ মিনিটের গাড়ীতে যাদবপুর হইতে ডায়মণ্ডহারবার রওনা হইলাম। সঙ্গে আমাদের জিনিস-পত্র বিশেষ কিছুই ছিল না,—এক একখানা করিয়া কম্বল, একটী জলের ফ্লাস্ক, রৌদ্র নিবারণের জন্য টুপী এবং কয়েক-খানা মোটা বড় লাঠি। সুন্দরবন ও সাগরদ্বীপের ফটো

তুলিয়া লইব মনে করিয়া আমরা একটা ক্যামেরাও সঙ্গে লইয়াছিলাম।

১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১১টায় আমরা ডায়মণ্ডহারবার পৌঁছি। যাদবপুর হইতে ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। ষ্টেসনে নামিয়া ষ্টেসন মাষ্টারকে সমুদ্রের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, সে তো পাঁচ মিনিটের রাস্তা এখান থেকে, অর্থাৎ সমুদ্র বলতে মাষ্টার মহাশয় গঙ্গা নদীকেই বুঝিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে গঙ্গাসাগরের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন সে অ—নেক দূর। তাঁহার নিকট পরামর্শই আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে, তাঁহার এই খবর যে অমূলক, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

নৌকাঘাটে আসিয়া কচুবেড়ে (কাকদ্বীপের অপর পার) পর্য্যন্ত যাইবার জন্য নৌকা ভাড়া করা গেল। নৌকায় ওঠা—সে এক মজার ব্যাপার। আমাদের সহযাত্রী নলিনীর দেহের দৈর্ঘ্য এবং নৌকার উচ্চতা এমনি একটা গোল পাকাইয়া দিল যে, বেচারীর তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া মুস্কিল হইল—আমাদের সাহায্য লইয়া বেচারী নৌকায় উঠিয়া

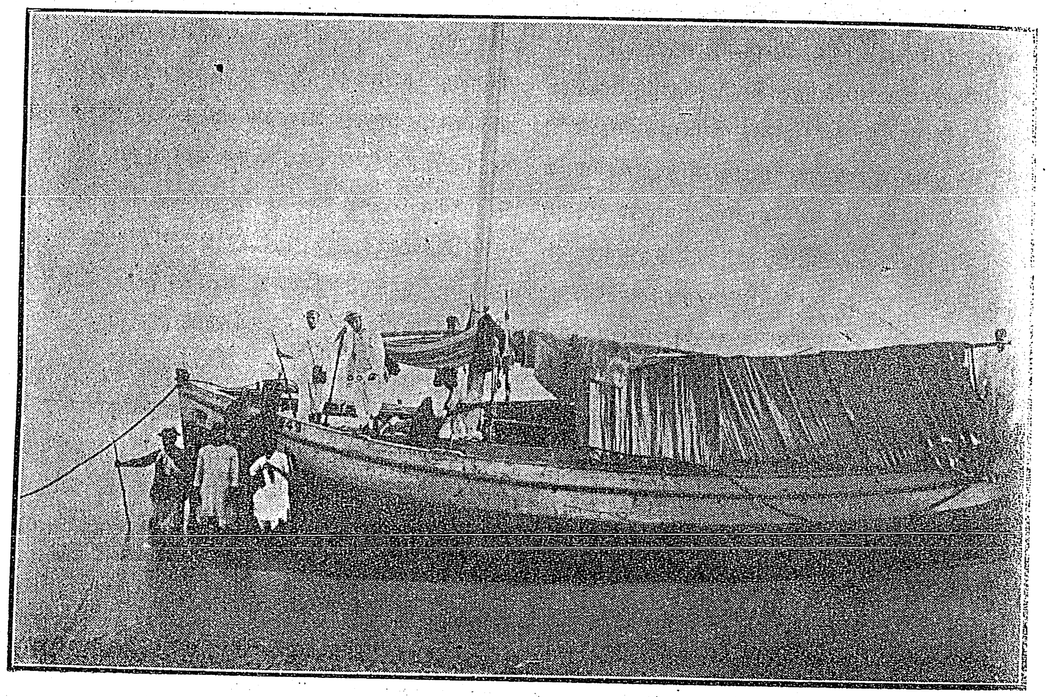

পদব্রজে যাত্রা আরম্ভ (নৌকা হইতে অবতরণ)

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। রাত্রি ১—১৫ মিনিটে নৌকা ছাড়া গেল। তখন নদীতে ভাঁটা ছিল। নৌকা পাল তুলিয়া চলিল। নৌকার চেহারা এক ভিন্ন রকমের। উঁচু গাদা বোট, —পিছনে একটা হাল ও দুইটা দাঁড় মাত্র আছে। আমরা নৌকায় উঠিয়া নানা গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম। সঙ্গীদের মধ্যে দুই একজন গানও ধরিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবী আসিয়া গান ও গল্প দুই-ই বন্ধ করিয়া দিলেন।

ভোরে উঠিয়া সূর্য্যোদয় দেখিলাম। নদীর কোল হইতে

সূর্য্য ক্রমে ক্রমে উঁকি মারিয়া আকাশের গায়ে ভাসিয়া উঠিতেছে,—পূর্ব্বাকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছে। প্রথমে আমরা যে গ্রাম পাইলাম, তাহার নাম কচুবেড়ে। গ্রামটী ঐ অঞ্চলের তুলনায় বেশ বর্দ্ধিষ্ণু বলিয়াই মনে হইল, এবং তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ মনোহর। অনেকগুলি গরু মাঠে চরিতেছিল এবং কতকগুলি গরু নদীর ধারে আসিয়া বুক পর্য্যন্ত কাদায় ডুবাইয়া ঘা'স খাইতেছিল।

ভোর সাতটার সময় জোয়ার আসিল এবং আমাদের নৌকার গতিও মন্দীভূত হইয়া পড়িল। তখন আমাদিগকে

ভাটায় খাল জলশূন্য, কাদায় ভরা। বাম হইতে দক্ষিণে :—মনোরঞ্জন, সরোজ, নীহার, দ্বিজেন, পথপ্রদর্শক অমূল্য

খাড়া হইয়া নৌকা ত্যাগ করিয়া ডাঙ্গায় নামিতে হইল। ৮-৪৫ মিনিটের সময় আমরা হাঁটা-পথে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। কতক্ষণ চলিবার পর মরিগঙ্গার হাটে আসিয়া কয়েক দিনের আন্দাজ খাবার কিনিয়া কাঁধে বাঁধিয়া রওনা হইলাম।

এইবার সাগরদ্বীপের ইতিহাস একটু বলা যাক্, নইলে ভ্রমণ বৃত্তান্তই যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ লইয়া সাগরদ্বীপ গঠিত। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এই দ্বীপপুঞ্জকে "সাগর আইল্যাণ্ড সোসাইটী" নামক এক কোম্পানীকে পত্তনি দেন। এই কোম্পানীতে ইয়োরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয় শ্রেণীর লোকই ছিলেন। তাঁহারা এখানে লোকজন বসাইয়া চাষ-আবাদে কিঞ্চিৎ সফলও হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৬২ ও ১৮৭২ সালে সাগরদ্বীপে ভীষণ বন্যা হইয়া সমস্ত দ্বীপ বন্যাজলে বিধৌত হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেক প্রজার প্রাণহানি হয়। "সাগর আইল্যাণ্ড সোসাইটী"ও ফেল হইয়া যায়। কোম্পানীর যাঁহারা ট্রাষ্টী ছিলেন তাঁহারা দ্বীপকে ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চাষ আবাদ ও লবণের কারবার করিতে লাগিলেন। সাগরদ্বীপের দক্ষিণ দিক লইয়াছিলেন পামার কোম্পানী ও উত্তর দিক লইয়াছিলেন ম্যাকিণ্টস্ ও হাণ্টার কোম্পানী। সাহেব কোম্পানী ফেল হইবার পর protective tank * এর সৃষ্টি করিয়া সমস্ত দ্বীপ পুনরায় বিলি করা হয় ও এবং তখন হইতে ইহা

* Sea level হইতে ৬০।৭০ ফিট উচ্চ একটু জায়গায় পুকুর এবং তাহার চারিদিকে লোক থাকিবার উপযুক্ত জায়গা। সমতল ভূমি হইতে উচ্চ স্থানে উঠিতে চারিদিকে রাস্তা আছে। বন্যা হইলে প্রজারা সেখানে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইতে পারে।

দেশীয় লোকের দখলে আসে। দ্বীপের দক্ষিণাংশ ধবলাট ৺অদ্বৈতচন্দ্র দত্ত, এবং উত্তরাংশ রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জি ও কালীকুমার মণ্ডল মহাশয় জমা লয়েন। এখন তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সমস্ত জায়গায় চাষ আবাদ করাইয়া জমিদারী ভোগ করিতেছেন। বাকী যে সমস্ত জমি ছিল তাহা গভর্ণমেণ্ট অন্য লোককে বিলি করেন; কিন্তু

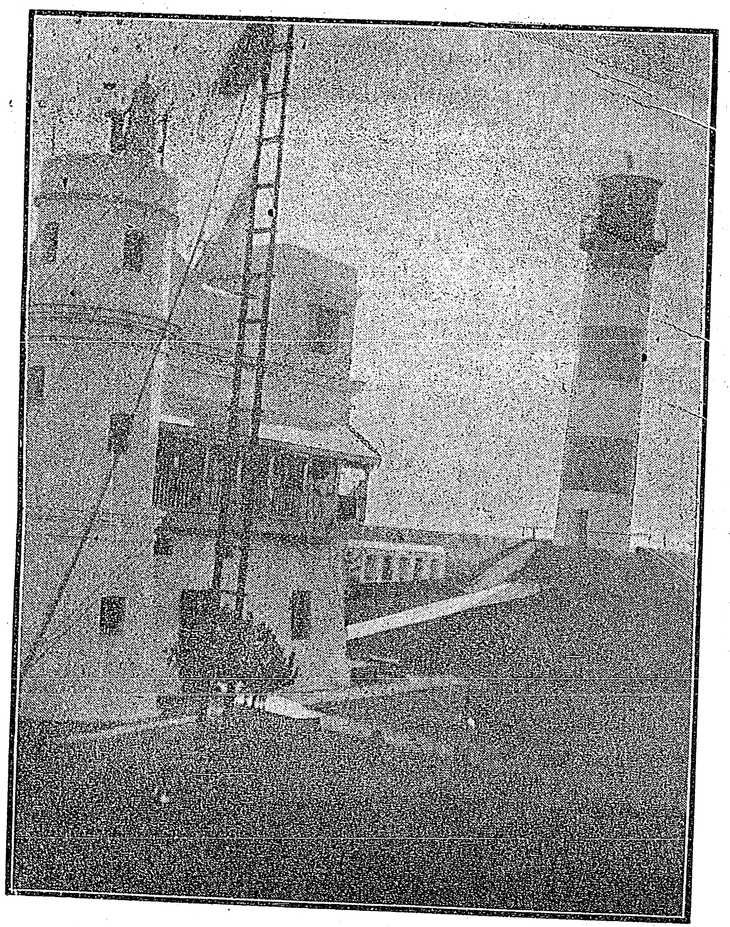

আলোক-ঘর ও Manual সাহেবের বাড়ী

সর্ত্ত অনুসারে protective tank করিতে না পারায়, বছর দশেক হইল তাহাদের জমি বাতিল করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজেরাই জঙ্গল কাটিয়া খুচরা প্রজা পত্তন করিতেছেন।

সাগরদ্বীপের দক্ষিণদিকে একটী বাতিঘর (light house) আছে। সমুদ্রে গমনকারী জাহাজ সকল তাহার আলোতে পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারে। এই দ্বীপের নিকটে গঙ্গাসাগরে প্রত্যেক পৌষ সংক্রান্তিতে একটী বড় মেলা হয়; তাহাতে ভারতবর্ষের নানাদেশ হইতে যাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হয়। লক্ষাধিক লোক এই মেলায় সমবেত হয়। এখানে ৺কপিলমুনির আশ্রমও আছে।

এই দ্বীপেরই দক্ষিণ দিকে ধবলাটে ৺ বিশালাক্ষী দেবী বড় প্রত্যক্ষ ও জাগ্রত দেবতা। সাগরস্নানের নৌকাযাত্রীরা পথে ৺ বিশালাক্ষী দেবীকে দর্শন ও পূজা করিয়া যায়।

দ্বীপের উত্তরাংশে Mud-point (ঘোড়ামারা), এবং বাতিঘর হইতে কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করা যায়। সমস্ত দ্বীপের মধ্যে কেবল মরিগঙ্গার একটী থানা এবং মনসাদ্বীপ ও মরিগঙ্গার ২টী পোষ্ট আফিস আছে। সাগরদ্বীপের কচুবেড়ে হইতে কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রত্যহ জোয়ারের সময় একবার করিয়া খেয়া নৌকা লোককে পারাপার করে ও মেদিনীপুর কাঁথির পেটুয়া ঘাট হইতে এই দ্বীপের ফুলডুবী ঘাটে একটির অন্তর ষ্টীমার আসে। সাগরদ্বীপে কচুবেড়ে হইতে মগরার ভিতর দিয়া ধবলাট পর্য্যন্ত জেলাবোর্ডের একটী রাস্তা আছে।

সাগরদ্বীপের বনজঙ্গলে কৃপাল, সুন্দরী, গড়ান, বগরা, হেতাল, গেঁয়ো, কলিসা ইত্যাদি নানা জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুন্দরী বৃক্ষই খুব প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। দ্বীপের অনেক অংশই এখন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। এই সকল জঙ্গলে এখন বড় বড় বাঘ, বন্য বরাহ ও হরিণ এবং ময়াল, ঢোঁড়া, রানা প্রভৃতি বড় বড় সাপ পাওয়া যায়। খুব বিষাক্ত সাপ এখানে নাই; কারণ নোনা জলে সাপের বিষ থাকিতে পারে না। শস্যাদির মধ্যে এখানে কেবল ধানই প্রচুর পরিমাণে জন্মে; অন্য কোন ফসল হয় না।

সাগরদ্বীপের প্রায় পনের আনা লোকই মেদিনীপুরের অধিবাসী। ইহাকে ২৪ পরগণার অন্তর্গত না বলিয়া

মেদিনীপুরের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গরীব চাষা হইতে লাটদার পর্য্যন্ত সকলেই এক দেশের। খুব অল্প সংখ্যক বুনো কোল, ভীলও এখানে আছে।

এইবার আবার ভ্রমণ-কথা আরম্ভ করা যাক্। হাঁটিতে হাঁটিতে বেলা ১২টায় আমরা কয়লাপাড়া পঁহুছিলাম। এইখানে আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জলপান করিয়া শান্ত ও সুস্থ হইলাম। পুনরায় যাত্রা করিব, এমন সময় স্থানীয় কয়েকজন লোক আসিয়া আমাদিগকে বলিল যে, এই অঞ্চলে ভয়ানক মারিভয় উপস্থিত হইয়াছে এবং আমরা যেন যে-সে জায়গায় জল এবং খাবার না খাই। অধিকন্তু আমাদের সহিত যে খাবার ছিল, তাহাও এখানে খাইয়া শেষ করিয়া কিম্বা ফেলিয়া যাইতে বলিল। তাহাদের এই কথার কোন তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। যাহা হউক, আমরা তাহাদের পরামর্শমত খাবার ফেলি নাই; ফেলিয়া গেলে আমাদিগকে বেশ মুস্কিলে পড়িতে হইত।

বেলা ১২-১৫ মিঃ কয়লাপাড়া হইতে রওনা হইলাম। এবার আমরা শিকারপুরের ভিতর দিয়া চলিতে-ছিলাম। চলিবার পথে আমাদের সহিত এই অঞ্চলের সেটেলমেণ্ট আফিসার মিঃ আর সেনের দেখা হইল। উনি তখন সাইকেল কাঁধে করিয়া একটা খালের উপরের ভাঙ্গা বাঁশের পুল পার হইতেছিলেন! তাঁহাকে রাস্তা ঘাটের সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করায়, পকেট হইতে মানচিত্র বাহির করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এখান হইতে মনসাদ্বীপ (তাঁহার ক্যাম্প) ৮ মাইল এবং সেখান হইতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ১০ মাইল,—এই মোট ১৮ মাইল রাস্তা। তিনি আমাদিগকে আরও বলিলেন যে, গঙ্গাসাগরে বাস করিবার মত কোন জায়গা নাই; এবং আমরা কেন গঙ্গাসাগরে যাইতেছি তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা আমাদের অভিযানের কথা বলিলে তিনি আমাদিগকে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া ধবলাট (মনসা দ্বীপ হইতে ৪ মাইল দূরে সমুদ্রতীরস্থ একটী স্থান) যাইতে বলিলেন; কারণ সেখানে গেলে আমাদের সমুদ্র দেখাও হইবে এবং সুন্দর-বনেরও একটা ধারণা জন্মিবে। তাঁহার যুক্তিই সমীচীন মনে

বনের ভিতর পথ

করিলাম। গঙ্গাসাগর যাওয়াই যে আমাদের উদ্দেশ্য, তাহ নহে; কারণ আমরা তীর্থ করিতে যাইতেছি না।

দুপুর রৌদ্রে আমরা পথ চলিতেছি। চারিদিকে ছোট ছোট জঙ্গল। মাঝে মাঝে হেতাল গাছের কুঞ্জ দেখা যাইতেছিল। মনে হয় কে যেন ইহা রোপণ করিয়াছে। চারিদিকে জন-মনুষ্যের সাড়াশব্দ নাই। যাহারা এ

অঞ্চলে বাস করিত, তাহারা মারিভয়ে পলাইয়াছে। আমাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া দিবার জন্য একজন লোকও পাইলাম না। ভাগ্যিস মিঃ সেন সাইকেল চড়িয়া আসিয়াছিলেন! তাঁহার সাইকেলের চিহ্ন দেখিয়া আমরা রাস্তা চলিতে লাগিলাম। মিঃ সেনকে খুব ভাল আরোহী বলিতে হইবে। ঐ পথে কেহ যে সাইকেল চালাইতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। রাস্তার কোথাও উঁচু কোথাও নীচু; কোথাও আধ হাত চওড়া আর কোথাও বা ৪ আঙ্গুল মাত্র পথ—খুব সাবধানের এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সাইকেল চালাইতে হয়।

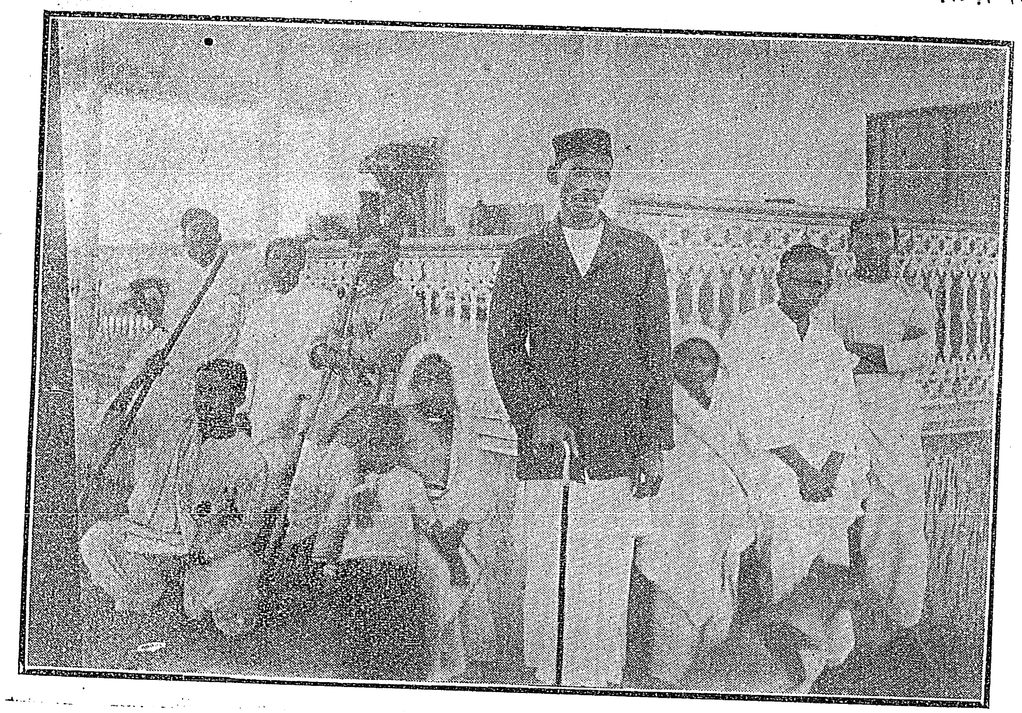

কপিলমুনির আশ্রম ও টুণ্ডেল দেরাজ্জতুল্লা

বেলা প্রায় ২-৪৫ মিঃ চেঁওয়াগাড়ী খালের ধারে আসিয়া উপস্থিত হই। এই খাল পার হইলেই মনসা দ্বীপ। কচুবেড়ে হইতে মনসা দ্বীপ প্রায় ২০ মাইল হইবে। দূর হইতে ঐ পারে সেটেলমেণ্ট অফিসারের ক্যাম্প দেখিতে পাইলাম। কিন্তু খেয়াঘাট খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল; কারণ খেয়া নৌকা এপারে ছিল না। ঐ পার হইতে খেয়া মাঝি আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া খুব উৎসাহ সহকারে নৌকা লইয়া আমাদের কাছে আসিল; কারণ আমাদিগকে পার করিতে পারিলে তাহার প্রায় এক মাসের রোজগার হইবে। এ অঞ্চলে কোন লোকের বিশেষ যাতায়াত নাই। কাজেকাজেই উহার মাসিক রোজগার ৫।৬ আনার অধিক হয় না; তাই বেচারীর আমাদিগকে দেখিয়া মহা আনন্দ।

আমরা নৌকায় উঠিব—তাহাও এক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। খানিক গভীর কাদা মাড়াইয়া যাইয়া নৌকায় উঠিতে হইল; কারণ, তখন ভাঁটা আরম্ভ হইতেছিল। নৌকায় যে আমরা একটু আরাম করিয়া বসিয়া হাঁফ ছাড়িব, তাহারও জো ছিল না। কারণ নৌকা বেশ ছোট ও ভয়ানক নড়াচড়া করে। তাই খোলের ভিতর গুটিশুটি মারিয়া চুপ করিয়া বসিতে হইল,—একটু নড়িলে চড়িলেই নৌকা ডুবিবার বিশেষ ভয়। খালটী ছোট নহে, খুব বড় এবং ঢেউও তাতে বেশ আছে।

অতি কষ্টে পরপারে আসিয়া খেয়ামাঝিকে সন্তুষ্ট করিয়া, এবং পুনরায় কাদা ভাঙ্গিয়া সেটেলমেণ্টের ক্যাম্পে আসিয়া আড্ডা লইলাম। মিঃ সেন তখনও বাড়ী ফেরেন নাই। তাঁহার কর্ম্মচারী ভূপেনবাবু আমাদিগকে যাইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন যে ধবলাটের রাস্তা ভয়ানক খারাপ,—

আমাদিগের এই সময় যাইতে যথেষ্ট কষ্ট হইবে। আমরাও দেখিলাম যে, এখানে যখন বেশ আশ্রয় পাওয়া গেল এবং রাত্রিতে ভাত খাইবার আশাও রহিল, তখন অনিশ্চিতের পথে না যাইয়া নিশ্চিত যাহা পাইয়াছি তাহাকে ধরিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেইজন্য এইখানেই রাত্রি যাপন করিব বলিয়া রহিয়া গেলাম। ভূপেনবাবু ও স্থানীয় 'জানাদের' কাছারীর নায়েব বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন আমরা ভ্রমণের প্রোগ্রাম করিলাম যে, ভোরে উঠিয়া মগরা সাসমলদের কাছারীতে যাইয়া জিনিষপত্র সেখানে রাখিয়া বাতিঘর দেখিতে যাইব; এবং সেখান হইতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে যাইয়া সমুদ্র দর্শন ও স্নান করিয়া পুনরায় মগরা ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর পথে রওনা হইব।

১৩ই ফেব্রুয়ারী ভোর ৫টায় ঘুম হইতে উঠিলাম। সুন্দরবনে প্রথম রাত্রি প্রভাত। ভোরে উঠিয়াই মনে হইল এ যেন কোন অপরিচিত জায়গায় আসিয়াছি। সবই যেন আমাদের কাছে কি রকম নূতন নূতন লাগিতেছে! এখানে বিশাল নগরীর কর্ম্মকোলাহল নাই; কিম্বা পল্লীগ্রামের পাখীর প্রভাতী গান নাই; আছে শুধু তেপান্তর মাঠের নির্জ্জনতা ও ধূসর ছবি।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া জিনিষপত্র কাঁধে বাঁধিয়া ৬-২০ মিঃ মনসা দ্বীপ ত্যাগ করিলাম। সুরেন নামক একটী স্থানীয় লোককে গাইড হিসাবে আমাদের সঙ্গে লইলাম; কারণ, সঙ্গে রাস্তাঘাট-জানাশুনা লোক না থাকিলে এই অঞ্চলে পথ চলিতে যে কিরূপ বিষম বেগ পাইতে হয়, তাহা পূর্ব্ব দিন আমরা কিছু উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

৭ ১৫ মিঃ মগরা পৌছান গেল। মনসাদ্বীপ হইতে মগরা প্রায় ৪ মাইল। সেখানে জিনিষপত্র রাখিয়া লাইট-হাউস অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তখন ভাঁটা হইয়াছে—সমস্ত খাল ও নদীতে একটুও জল নাই,—একদম গভীর কাদায় ভরিয়া রহিয়াছে। খানিকদূর চলিবার পর আমাদিগকে বেগথালির খাল পার হইতে হইল। খুব গভীর পাঁকে তাহা ভরা ছিল। সহযাত্রী নলিনীর অবস্থা ভীষণ,—পাঁকে ডুবিয়া যায় আর কি! মামার (দ্বিজেন কর) অবস্থা তাহার অপেক্ষাও অধিক শোচনীয়!

বেলা ৯—১৫ মিঃ লাইট-হাউসে পৌছিলাম। মগরা

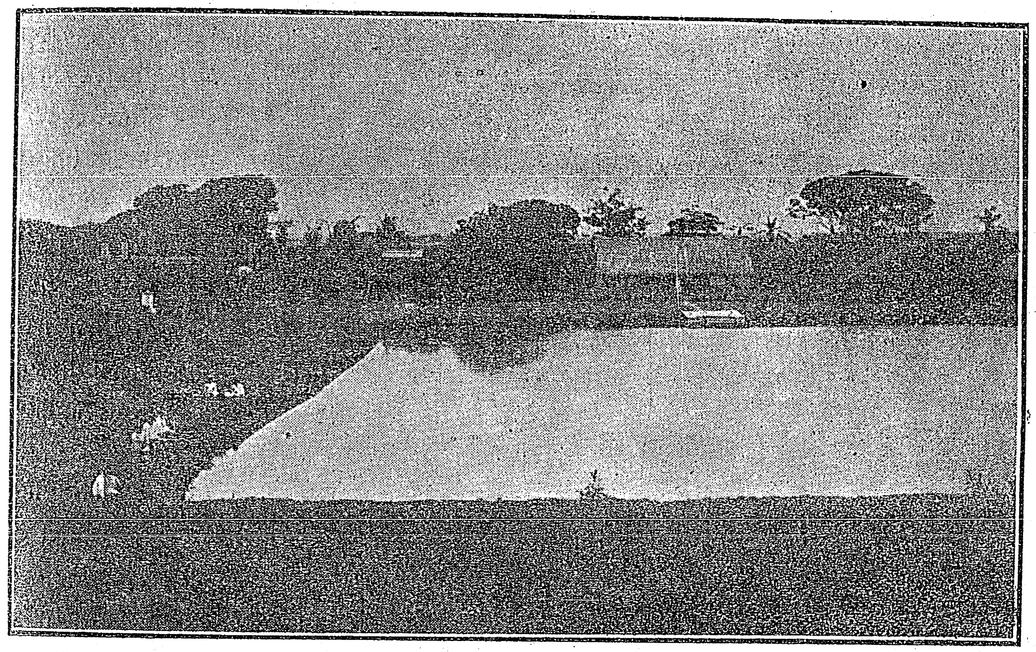

ধবলাট দত্তদের বাড়ী—বিশালাক্ষী মন্দির ও Protoctive tank

হইতে লাইট-হাউস প্রায় ৫ মাইল। বাতিঘরের অধ্যক্ষ A. T. Manual সাহেবকে আমাদের উদ্দেশ্য বলায়, তিনি আনন্দের সহিত আমাদিগকে লাইট-হাউস দেখিতে অনুমতি দিলেন; এবং ভিতরে বেশী লোক ধরিবে না বলিয়া আমাদিগকে দুইজন দুইজন করিয়া ভিতরের সিঁড়ি দিয়া লাইট-হাউসের উপরে উঠিয়া দেখিতে বলিলেন। তাঁহার

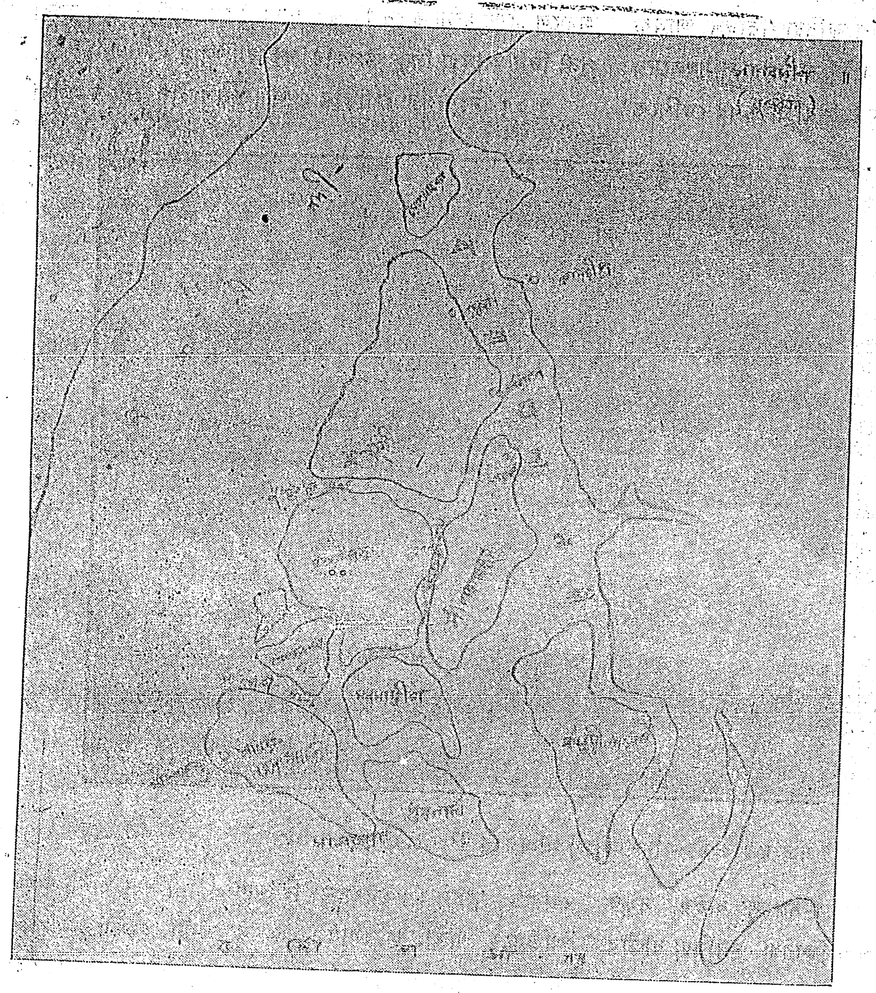

মানচিত্র

কথা অনুসারে আমরা দুইজন করিয়া উপরে উঠিয়া দেখিতে লাগিলাম এবং অন্যান্য সকলকে তিনি তাঁহার ঘরে যত্ন করিয়া বসাইয়া টেলেস্কোপ দিয়া সমুদ্র দেখাইয়া Light-house সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। লাইট-হাউসটী দেখিতে বেশ সুন্দর। তাহার অপেক্ষাও সুন্দর সাহেবের অমায়িক মধুর ব্যবহার।

সমুদ্র-পথে চলাচল করিতে জাহাজের পক্ষে এই বাতি-ঘরের বিশেষ দরকার। এইখান হইতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম নিকটেই। কোন জাহাজকে সমুদ্র হইতে গঙ্গায় প্রবেশ করিতে হইলে, প্রথমে তাহাকে তাহার জাতীয় পতাকা উড়াইতে হইবে। তার পর এই লাইট-হাউস হইতে পতাকা উড়াইয়া অনুমতি দিলে পর, সে গঙ্গায় প্রবেশ করিতে পারিবে। এ নিয়মের ব্যতি-ক্রম করিলে কোন জাহাজ-কেই আসিতে দেওয়া হয় না।

সীমাপুরে (সাগরামেলার নিকটে) এই বাতি-ঘরেরই একটী টুণ্ডেল থাকিয়া, জোয়ারের সময় সমুদ্রের যে পথে জাহাজ যাতায়াত করে, তাহাতে স্বাভাবিক জলের উপর কত জল আছে তাহা মাপে, এবং সেখানে একটী খুব উচ্চ flag-staffএ সাঙ্কে-তিক ভাষায় তাহা দেখাইয়া থাকে। উহা দেখিয়া সমুদ্রে জাহাজ চলাচল করে। সীমাপুর জলমাপঘর হইতে বাতিঘর পর্য্যন্ত টেলিফোন আছে। সীমাপুর হইতে জোয়ার ভাঁটার রিপোর্ট বাতিঘরে পাঠান হয় এবং সেখান হইতে তাহা প্রত্যহ ৪ বার করিয়া কলিকাতা পোর্টকমিশনার অফিসে প্রেরিত হইয়া থাকে।

বেলা ১০—৩৫ মিঃ আমরা লাইট-হাউস হইতে সাগর-মেলায় রওনা হইলাম। তখন জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে; তাই আমরা সমুদ্রের তীরের রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতে

পারিলাম না। আমাদিগকে ঘন বনের ভিতর দিয়া কর্দ্দমাক্ত রাস্তা দিয়া যাইতে হইল। ম্যানুয়েল সাহেব টেলিফোন করিয়া আমাদিগকে রাস্তার ব্যবস্থা ও তাঁহার টুণ্ডেলের বাড়ীতে খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, এবং টুণ্ডেলকে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বলিলেন। সাহেবের সৌজন্যেই এই জনহীন জায়গায় আমাদের উত্তম আহার ও তদতোধিক প্রয়োজনীয় সুশীতল পানীয় মিলিয়াছিল।

বেলা ১—১৫ মিঃ আমরা সীমাপুরের জল-মাপ-ঘরে (৬ মাইল দূরে) আসিয়া পঁহুছি। এবার আমাদিগকে খুব গভীর বনের মধ্য দিয়া আসিতে হইল। গভীর বনের মধ্যে লোক-চলাচলের জন্য যে সরু রাস্তা থাকে, তাহাকে 'সয়েলের' রাস্তা বলে। পথের মধ্যের একটী ছোট খাল আমরা এক অভিনব ও অভাবনীয় উপায়ে পার হইলাম। খালের গভীরতা যথেষ্ট। নৌকা নাই। সাঁতার দেওয়া ব্যতীত কি উপায়ে কাপড় বাঁচাইয়া পার হইব তাহার বুদ্ধি জোগাইতেছি, এমন সময় অতি লম্বা নলিনী এক অসমসাহসের কাজ করিয়া বসিল। খালের অপর পারের একটী জীবন্ত সুন্দরী বৃক্ষ হেলিয়া এপারের নিকটেই জলে পড়িয়াছিল,—নলিনী এপার হইতে গাছের সরু ডাল ধরিয়া অতি জোরে এক লাফ দিয়া গাছের অপেক্ষাকৃত মোটা ডালের উপর যাইয়া পড়িল; এবং গাছের ডাল অবলম্বন করিয়া পরপারে পঁহুছিল। নলিনীর অবস্থা দেখিয়া এবং শাস্ত্রোল্লিখিত মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিতে যাইয়া 'মামা' (দ্বিজেন কর) এক বিরাট হাসির পাহাড় সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। আনন্দের আবেগে (কারণ অতি অল্পেই মামার আনন্দ ও হাসি হয়) মামার পা হোচট খাইয়া ডালে না থাকিয়া জলে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মামাকেও খালে ডুবাইয়া দিল। বেচারী নাকানি চুবানি খাইয়া উঠিল। মামার ইত্যাকার অবস্থা দেখিয়া হাসি চাপিতে যাইয়া (কারণ অপরকে হাসিতে দেখিলে মামা বড় রাগ করেন) অমূল্য ভায়ার (সাধু) হাতের লাঠি ও মাথার টুপী জলে পড়িয়া গেল। যাহা হউক কোন মতে খাল পার হইয়া আসিলাম।

খানিক দূর চলিবার পর আমরা একটী নদীর উপরে সুন্দরী বৃক্ষ ও লতা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত পুল পাইলাম। ভারি সুন্দর সে জায়গার দৃশ্যটা। কূলে কূলে ভরা নদী ছল ছল করিয়া সাগরের পানে চলিয়াছে। চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল। পুলের উপর উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু গাইড আমাদিগকে কোন মতেই সে জায়গায় বেশীক্ষণ থাকিতে দিল না; কারণ, ভরা দুপুরে নাকি বাঘেরা জল খাইতে জঙ্গলের নিকট জলাশয়ে আসে। মোটের উপর এই রাস্তাটুকু চলিতে আমাদের কাদার জন্য বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সীমাপুরে পঁহুছিয়া টুণ্ডেলের সঙ্গে দেখা করিয়া আমরা সমুদ্র-স্নান করিতে ছুটিলাম। সেখান হইতে সমুদ্রের গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল, কিন্তু সম্মুখে বন ছিল বলিয়া সমুদ্র দেখা যাইতেছিল না। ফটোগ্রাফার ও আর্টিষ্ট অরুণ ভায়া পূর্ব্বে কখনও সমুদ্র দেখেন নাই। তিনি, সমুদ্রের রূপ ও তরঙ্গভঙ্গী মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ নীহার সমুদ্রবিষয়ক গান ধরিলেন। সদানন্দ মামা হৃদয়ের ভাবের আবেগে লাফাইতে লাগিলেন। নলিনী ও অমূল্য ভায়া (বৈরাগী ও সাধু) এখানে কোন বাবাজি কিম্বা মাতাজীর সন্দর্শন মিলিবার সম্ভাবনা আছে কি না, সে বিষয়ে গোপনে গোপনে (যদিও সেটা আমাদের কাছে ধরা পড়িয়াছিল) আলোচনা করিতেছিল; সর্ব্বদা-তৃষ্ণার্ত্ত মনোরঞ্জন সমুদ্রের জল পান করিতে পারিবে কি না এবং কতখানি পারিবে তাহার একটা মীমাংসা করিতেছিল। আমি বেচারী আর কি করিব—খাতা পেন্সিল লইয়া তাহাদের মনের ভাব টুকিতেছিলাম।

অতি অল্পকাল মধ্যে বনভূমি পার হইলে পর আমরা সমুদ্র দেখিতে পাইলাম এবং গঙ্গাসাগর-মেলার ভূমি পার হইয়া আসিয়া সাগরের মৃদু পরশ লইলাম। মনের আনন্দে অনেকক্ষণ সমুদ্র-স্নান করিলাম। পুরীর সমুদ্রে যেমন জলে নামিলে কেবল বালু, এখানে তেমন নহে। প্রথমে সমুদ্রের ধারে নদীর আঁটাল মাটি; তারপর বালু ও মাটি মিশ্রিত। কাজেকাজেই এখানে একটু সাবধানতা সহকারে স্নান করিতে হয়, নতুবা পা পিছলাইয়া যাইতে পারে। ইহার কারণ আর কিছুই না,—এখানে সাতবেকী নামে একটী নদী আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে—তাহার আঁটাল মাটিতে সমুদ্রের এই অবস্থা হইয়াছে।

আমরা ছাড়া সমুদ্রে আর কোন লোকই স্নান করিতে-ছিল না। এখানে সমুদ্র কি রকম তাহার আমরা কিছুই জানি না, তাই আমরা বেশী দূর গেলাম না। তবে আমরা যতদূর

গিয়াছিলাম তাহাতেই আমাদের গাইড বেশ ভয় পাইয়া গিয়াছিল এবং আমাদিগকে বার-বার ফিরিয়া আসিতে বলিতেছিল।

এই জায়গাটাকে যে কেন গঙ্গাসাগর-সঙ্গম বলা হয়, তাহা আমরা বুঝিলাম না; কারণ, সাগরের ও গঙ্গার যেখানে সঙ্গম হইয়াছে, তাহা এখান হইতে কিছু দূর পশ্চিমে। যে জায়গাটায় যাত্রীরা নানা দেশ-দেশান্তর হইতে আসিয়া মিলিত হয় ও স্নান করে এবং যে জায়গাটায় মেলা হয়, তাহা গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে নহে, সাতবেকী নদীর যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গম হইয়াছে, সেই জায়গায়। পূর্ব্বে হয়ত গঙ্গা-সাগরের সঙ্গম খুব নিকটেই কোথাও ছিল; এখন হয়ত চড়া পড়িয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। না হয়, এই জায়গাটায় কপিলমুনির আশ্রম আছে বলিয়াই এখানে সাগর-সঙ্গম স্নান হয়। ঐতিহাসিকরা এই ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবেন; আমাদের যাহা ধারণা তাহাই বলিলাম।

সাগর-মেলার স্থানটীকে এখন মরুভূমির মত দেখা যায়। এখানে এখন গুটিকয়েক জটাজূটধারী সাধু আছেন। এক-দিকে কপিলমুনির আশ্রম আছে। আর আছে কেবল পুরান আস্ত, ভাঙ্গা ও আধাভাঙ্গা হাঁড়িকুঁড়ির মেলা। অল্পদিন পূর্ব্বেই স্নান হইয়া গিয়াছে, তাই ঐ সব এখনও বর্ত্তমান। এই সব ভাঙ্গা হাঁড়িকুঁড়ি হইতেই, গঙ্গাসাগরে যে কত অসংখ্য লোকের সমাবেশ হয়, তাহার একটা ধারণা করিয়া লইলাম। ধর্ম্মের জন্য ভারতের নানাদেশ হইতে এখানে কত যে লোক আসে, এবং কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে কত লোক যে মারা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে এই সব জায়গায় আসা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ও ভীতিবহ ছিল। তাই বোধ হয় লোক গঙ্গাসাগরে আসিলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া আসিত।

কপিলমুনির আশ্রমে আমরা আশ্রমত্ব কিছুই দেখিলাম না। চারিদিকে রেলিঙ দিয়া ঘেরা লাল টীনের পাক্কা দেওয়াল দেওয়া ঘর। আশ্রমের কথা বলিলেই আমাদের মনে পড়ে পূর্ব্বকালের সেই মুনি-ঋষিদের তপোবন। লতাগুল্ম দিয়া ঘেরা কানন-পরিশোভিত, বিহঙ্গ-কূজিত মলয়-সেবিত একটী আবাস। সেখানে শান্ত, স্নিগ্ধ, মৌন ও স্বর্গীয় ভাব সর্ব্বদাই বিরাজ করিবে। কিন্তু এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না। মনে হইল এটী যেন একটী ডাকবাংলা। কপিলমুনির আশ্রমে মেঝেতে নিম্নলিখিত কবিতাটী লেখা আছে—

"মিলিতা মা মন্দাকিনী সাগরের সনে
পরম পবিত্র তীর্থ এ ভব ভবনে।
বিরাম-মন্দির হেথা করিল স্থাপন
৺ভারত সাধুখা পৌত্র ৺যাদবনন্দন
দেবাকৃপা প্রার্থী এই বিনোদবিহারী
তিষ্ঠ সাধু, ভক্তগণ কামনা তাহারি
জন্ম কপিলমুনি খুলনা জেলায়
স্থাপিল ভকতি মঠ এ জলধি বেলায়।"

গঙ্গাসাগর দর্শন ও স্নান করিয়া টুণ্ডেল দেরাজতুল্লার বাড়ী আহার করিলাম। ম্যানুয়েল সাহেবের কৃপায় ও সৌজন্যে আমাদের খাবার বন্দোবস্ত এখানে হইয়াছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, গঙ্গাসাগর হইতে 'ধবলাট' হইয়া যাওয়া যায় কি না, কারণ, দূরে ধবলাটকে ভারি সুন্দর দেখা যাইতেছিল। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা যে ধবলাট হইয়া যাই; কারণ, এত কাছে আসিয়াও যদি ধবলাট হইয়া না যাই, তবে আর কোনদিন যে আমাদের ইহা দেখা হইবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।

ভাঁটার সময় ছাড়া সমুদ্র-তীর দিয়া হাঁটা যায় না; তাই আমরা বেলা ৩-৩০মিঃ ধবলাট রওনা হইলাম। প্রথমেই আমাদিগকে সাতবেকী নদীর মোহানা হাঁটিয়া পার হইতে হইল। জোয়ারের সময় আমরা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, ভাঁটার সময় এই বিশাল নদী হাঁটিয়া পার হইতে পারিব। যদিও নদীতে কোমর জলমাত্র ছিল, কিন্তু এত স্রোত যে, আমাদিগকে পরপারে পৌঁছিতে বেশ বেগ পাইতে হইল।

সমুদ্রের তীরে মনের আনন্দে ঝিনুক ও শঙ্খ কুড়াইতে কুড়াইতে পথ চলিতেছি। মাঝে মাঝে চড়াই ও উৎরাই ভাঙ্গিতে হইতেছে। এত সুন্দর রাস্তা পূর্ব্বে আর কখনও আমরা পাই নাই। এখানে বনে বেশ বড় বড় গাছ আছে; এবং দৃশ্যও খুব সুন্দর। মাঝে মাঝে সরু সরু খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া বনের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বেলা ৫-১০ মিঃ সময় আমরা ধবলাটে লালুবাবুদের বাড়ী পৌঁছিলাম। তাঁহাদের বাড়ীটা বেশ সুন্দর জায়গায়

অবস্থিত—ঠিক সমুদ্রের ধারে এবং ইহা আরও এইজন্য দেখিবার জিনিষ যে, এই বাড়ী, ৺বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির ও বাগান প্রভৃতি সমস্তই protective tankএর মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্রে বন্যা হইলেও তাহাদের ধ্বংস হইবে না, ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

লালুবাবুরা খুব ভদ্রলোক। তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন এবং কিছুতেই আমাদিগকে রাত্রিতে না রাখিয়া ছাড়িলেন না। লালুবাবু এবং রাসবিহারীবাবু দুই ভাই এখানে থাকেন। তাঁহারা সুশিক্ষিত লোক। কিন্তু চাকুরীর দিকে না যাইয়া কৃষি-কর্ম্ম লইয়া আছেন। তাঁহারা উন্নত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-কর্ম্ম করিবার চেষ্টায় আছেন এবং ধান ছাড়াও সুন্দরবনে আর কিছু জন্মে কি না তাহার পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে অনেকটা সাফল্যও লাভ করিয়াছেন।

লালুবাবুরা ধবলাটের লাটদার (অর্থাৎ জমিদার)। কৃষি এবং প্রজা বিষয়ে তাঁহাদের বড় উচ্চ ধারণা দেখিলাম। তাঁহারা বলেন যে, প্রজা বড় হইলেই, তাহাদের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি, তাহাদের সুখেই আমাদের সুখ; এবং প্রজাদের জন্য তাঁহারা যথেষ্ট করিয়াও থাকেন দেখিলাম।

এইখানে একটী কথা বলা দরকার। আমাদের দেশে এখন চাকুরীর বাজার যে রকম হইয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ও গরীব শিক্ষিত যুবকদের বড় কষ্ট ও অসুবিধা হইতেছে। তাঁহারা যদি সুন্দরবন অঞ্চলে যাইয়া কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ আবাদ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বেশ লাভবান হইতে পারেন। তাহাদের নিজেদেরও উন্নতি হইবে এবং দেশমাতৃকার মুখেও আবার হাসি ফুটিয়া উঠিবে। সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ অঞ্চলে এখনও যথেষ্ট জমি পাওয়া যায়। কৃষিকর্ম্মে ইচ্ছুক লোকেরা লালুবিহারী ও রাসবিহারী বাবুর নিকট হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারেন।

ধবলাটের ৺বিশালাক্ষী দেবী বড় জাগ্রত। তাঁহার মন্দিরেই আটেশ্বর মহাদেব ও রাধাকান্ত জিউ অবস্থিত আছেন। বিশালাক্ষী দেবীর স্থাপনা সম্বন্ধে একটী বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। কথিত আছে পামার কোম্পানীর পামার সাহেব দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া মাটী খুঁড়িয়া তাঁহাকে বাহির করাইয়া একজন পূজারী ব্রাহ্মণ রাখিয়া তাঁহাকে স্থাপনা করেন। পামার কোং ফেল হইবার পর ৺অদ্বৈতচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ৺বিশালাক্ষীর পূজা করিবেন এই সর্ত্তে জমি বিক্রয় করা হয়। ধবলাটের লাটদারদের নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইলে পর, যাহাতে দেবীর কোন দিন ধ্বংস না হইতে পারে, এইজন্য তাঁহারা দেবীকে protective tankএর ভিতর স্থানান্তরিত করেন। ইহাতে নাকি দেবী অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তাহাদের ২৫০০ বিঘা জমি সমুদ্র দ্বারা গ্রাস করান।

এই অঞ্চলের লোকেরা ইঁহাকে খুব জাগ্রত দেবী বলিয়া জানে। জেলেরা সমুদ্রে জাল ফেলিবার পূর্ব্বে ইঁহাকে পূজা না দিয়া যায় না; এবং অনেকে মনস্কামনা পূর্ণ হইবার জন্য এখানে আসিয়া ঢিল বাঁধিয়া যায়। আমরাও তাহাদের দেখাদেখি ঢিল বাঁধিয়া আসিলাম, দেখা যাক কি হয়।

সন্ধ্যার সময় ধবলাটের Protective tankএর ঘেরীর উপর বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিলাম এবং সমস্ত সন্ধ্যাটা গান গাহিয়া কাটাইয়া দিলাম। ধবলাট জায়গাটা ভারি সুন্দর। ঠিক সমুদ্রের উপরে, অনেকটা পুরীর মত। ফটোগ্রাফার ও আর্টিষ্ট 'অরুণ' ইহাকে 'Lapland' নাম দিয়াছে। এই জায়গাটায় যদি কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাল রাস্তা থাকিত, তবে আমাদের দেশের অসহায় যক্ষ্মাগ্রস্ত লোকেরা আশ্রয় পাইয়া বাঁচিতে পারিত। এবং এত সুন্দর স্থানের অবস্থা আজ এই রকম থাকিত না,—স্বাস্থ্যান্বেষী ও বিলাস-প্রিয় বড়লোকের কৃপায় তাহা আজ একটা দেখিবার মত জায়গা হইত। রাত্রিতে লালুবাবুদের প্রদত্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা পরিতোষ সহকারে আহার করিয়া এবং ভাল বিছানায় ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিলাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ভোরে উঠিয়া সাগরতীরে সূর্য্যোদয় দেখিতে গেলাম। তাহা যে কত সুন্দর, তাহা আর কি বলিব। এই গভীর স্বর্গীয় ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই, তাই বৃথা সে চেষ্টা করিব না।

ধবলাট ত্যাগ করিয়া মগরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম ভোর ৭—৪০ মিঃ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সাতবেকীর খালের ধারে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন সবেমাত্র জোয়ার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভরা জোয়ার না হইলে 'খেয়া নৌকায়' খাল পার হওয়া মুস্কিল। নৌকা এখন ডাঙ্গায় উঠিয়া রহিয়াছে। আমাদের গরজ ও উৎসাহ বেশী—তাই আমরা কাদা হইতে নৌকা ঠেলিয়া জলে নামাইতে

লাগিলাম। নলিনীর কাদায় ডুবিয়া যাইবার ভয় বেশী থাকায়, সে আমাদিগকে কাদা ঠেলিতে সাহায্য না করিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল। আমাদের যদিও ইহাতে খুব রাগ হইতেছিল; কিন্তু কি করিব, বেচারী কাদায় ডুবিলে তো আমাদিগকেই টানিয়া তুলিতে হইবে (ভারও নেহাৎ কম নয়), তাই উহাকে রেহাই দিলাম। অনেক কষ্ট করিয়া নৌকা জলে নামাইয়া খাল পার হইলাম এবং বেলা ১১টার সময় মগরা কাছারীতে পৌঁছিলাম। এই ৮ মাইল রাস্তা আসিতে আমাদের খুব দেরি হইয়াছিল। কারণ গাইডে ও 'খেয়া'য় আমাদিগকে অনেক সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল।

মগরা পঁহুছিয়া স্নান করিলাম এবং সঙ্গের খাবার যাহা ছিল তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। এবার আমাদের খাবার সম্বল ফুরাইল, জল ছাড়া আর কিছুই রহিল না।

বেলা ১২টার সময় মগরা ত্যাগ করিয়া কচুবেড়ে অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মগরা হইতে কচুবেড়ে পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডের রাস্তা আছে। আমরা যাইবার সময় শিকারপুর দিয়া গিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় এই রাস্তায় ফিরিব, তবে আমাদিগের সমস্ত সাগরদ্বীপের ভিতর দিয়া হাঁটা হইবে। অল্প একটু চলিবার পর পথের সাথী গাইডকে বিদায় দিলাম। বেচারীর আমাদের মত হতভাগাদের প্রতি বেশ মায়া পড়িয়াছিল,—যাইবার সময় কাঁদ কাঁদ হইয়া আমাদিগকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আমরা আসিয়া মরিগঙ্গার হাটে পৌঁছি। অনেকক্ষণ পরে পরিচিত জায়গা দেখিয়া মনে আনন্দ হইল। সেখানে আসিয়া খবর লইয়া জানিলাম যে, তার পরদিন বেলা ১২টার সময় 'কাকদ্বীপের খেয়া'। ইহার পূর্ব্বে সেখানে যাইবার আর কোন উপায় নাই। কাজেকাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এখানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। পূর্ব্বদিন লালুবাবুরা আমাদিগকে মরিগঙ্গায় পৌঁছিয়া শ্রীযুত মহেন্দ্র দাসের বাড়ী কিম্বা রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জির কাছারীতে অতিথি হইতে বলিয়াছিলেন। এখানে দোকান আছে, তাই খাবার ভাবনা আমাদের ছিল না; তবে রাত্রিতে থাকিবার জায়গা চাই।

প্রথমে আমরা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ী যাই। লোকটী না কি খুব সদাশয়; কিন্তু তাঁহাকে বাড়ী না পাওয়ায়, আমাদিগকে জমিদারের কাছারীতে যাইতে হইল। সেখানে প্রথমে একটী ভদ্রলোকের সহিত আমাদের দেখা হয়। তাঁহাকে আমাদের উদ্দেশ্য বলায়, তিনি যেন কি রকম সন্দিগ্ধচিত্তে আমাদের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন এবং এখানে কিছু হইবে না বলিলেন। সাতটী যুবককে একসঙ্গে লাঠিশুদ্ধ দেখিয়া এবং তাহাদের সঙ্গে আবার torch-light, জলের flask (ইহাকে নিশ্চয়ই তাহারা bulletএর বাক্স মনে করিয়াছিল) ইত্যাদি আছে দেখিয়া তাঁহারা বোধ হয় একদম ভড়কাইয়া গেলেন।

যাহা হউক, আমরা নায়েব মহাশয়কে খবর পাঠাইলাম। তিনি ভয়ে আমাদের সহিত দেখা করিলেন না, লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, এখানে থাকা হইবে না; এবং সেই লোকটী আমাদিগকে নানাভাবে জেরা করিতে লাগিলেন। হয় ত এই লোকটী গ্রামের মধ্যে সামান্য একটু লেখাপড়া-জানা মোড়ল লোক। আমরা মোটঘাট লইয়া নিকটে একটী স্কুলের বারান্দায় যাইয়া বসিলাম এবং সেখানেই পড়িয়া থাকিয়া রাত্রি কাটাইব মনস্থ করিলাম। নায়েব বাবুর কাছারী ছাড়িয়া আমরা আসিলাম; কিন্তু তাহাদের একঘেয়ে জেরা হইতে কোনমতেই রেহাই পাইলাম না। প্রায় ২০।২৫ বার নানারকমের লোক আসিয়া নানাভাবে আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহাদের কাহাকেও আমরা জবাব দিলাম; কাহারও সহিত আবার কোন কথাই বলিলাম না। আমাদের ভয়ানক রাগ ও বিরক্তি ধরিয়াছিল।

সেদিন আমাদের ভাত খাওয়া হয় নাই,—সমস্ত দিন চিঁড়া খাইয়াই কাটাইয়া দিয়াছিলাম। ভাতের যোগাড় করিতে পারি কি না, এই আশায় নিকটবর্ত্তী দোকানে গেলাম এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিলাম। জমিদারের পুকুরের জল ভাল থাকায় এবং নিকটবর্ত্তী কোন পানীয় জলের পুকুর না থাকায় মনোরঞ্জন ও আমি চালডাল ধুইয়া ও জল আনিবার জন্য সেখানে গেলাম। অন্যান্য সকলে রান্নার জোগাড়ে দোকানে গেল। আমরা অন্ধকার রাত্রির জন্য সঙ্গে torch-light লইয়াছিলাম। মনোরঞ্জন উপর হইতে focus করিতেছে, আমি জলে নামিয়া চাল ডাল ধুইতে লাগিলাম। এই সময়ে একজন লোক আসিয়া আমাদিগকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার

torch-light এর আলো দেখিয়া তাঁহারা আমাদিগকে ডাকাত বলিয়া ধারণা করিলেন; কারণ, এই রকম আলো তাঁহারা পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। তাই তো, এ কি রকম আলো! কোন লোকজন দেখা যায় না, হঠাৎ আলো জ্বলে আর নিভে! জল লইয়া পথ চলিতেছি,—মনোরঞ্জন রাস্তা দেখিবার জন্য focus করিল, অমনি বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং অতি নিকটেই গুলি পড়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। যাহা হউক সৌভাগ্য-ক্রমে আমাদের কাহারও গায়ে গুলি লাগে নাই। তার পর তাহারা মুহুর্মুহু বন্দুকের ধ্বনি করিয়া আমাদিগকে জানাইতে লাগিল যে, তাহারা প্রস্তুত। আমরা ফিরিয়া দোকানে আসিলাম, এবং আজ রাত্রিতে যে আমাদের কোথায় এবং কোন্ অবস্থায় থাকিতে হয়, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলাম।

খিচুড়ি ও আলু ভাজা পাক করিয়া বেশ আনন্দের সহিত খাইতে লাগিলাম। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া মনোরঞ্জন ও নলিনীর ক্ষুধা ভয়ানক পড়িয়া গেল এবং তাহারা খুব অল্প খাইয়াই ক্ষুধা নিবৃত্ত করিল। সমস্ত রাত্রি স্কুলের বারান্দায় পড়িয়া রহিলাম।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ভোরে উঠিয়া কাকদ্বীপের খেয়ার জন্য মোটঘাট লইয়া কচুবেড়ে খেয়ার পারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিবার সময় দেখিলাম জমিদার-কাছারীর লোকেরা আমাদের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। খেয়াপারে আসিয়াও তাহাদের জেরা হইতে নিস্তার নাই—২।৩ জন লোক আসিয়া জেরা করিতে লাগিলেন। বেচারীরা বোধ হয় চিন্তা করিতেছিল—কতক্ষণে আমরা পরপারে যাইব এবং উহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে।

বেলা ১২টার সময় ভরা জোয়ার আসিল,—খেয়া নৌকায় চড়িলাম কাকদ্বীপ যাইবার জন্য। নৌকা খুব বড়, উহার খোলের ভিতরও লোক থাকিতে পারে। খেয়া নৌকায় ছৈ নাই,—রৌদ্র যাহাতে না লাগিতে পারে, সেইজন্য আমরা খোলের ভিতর যাইয়া ঢুকিলাম।

বেলা ১টার সময় কাকদ্বীপ আসিয়া পৌঁছিলাম। পথের মধ্যে একটা মস্ত বড় নদী পার হইতে হইল। কাকদ্বীপ জায়গাটা বেশ একটী বড় বন্দর; প্রায় সমস্ত জিনিষই এখানেই পাওয়া যায়। বাজারে আসিয়া একটী দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্নান করিলাম ও খাবার খাইলাম। রাত্রি ৮টার পূর্ব্বে ডায়মণ্ডহারবার যাত্রী নৌকা পাওয়া যাইবে না। স্থানীয় লোকদিগের নিকট খবর লইয়া জানিলাম যে, কাকদ্বীপ হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত এই ৩২ মাইল বরাবর জেলাবোর্ডের বেশ ভাল হাঁটা-পথ আছে। তাই আমরা পদব্রজে ডায়মণ্ডহারবার যাওয়াই স্থির করিলাম। মামার প্রথমে হাঁটিয়া যাওয়ায় আপত্তি ছিল। কিন্তু উহাকে একটু ঠাট্টা করায়, সে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া সকলের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া পড়িল। বেলা ৪-২৫ মিঃ আমরা কাকদ্বীপ ত্যাগ করিলাম এবং সন্ধ্যা ৬টায় আসিয়া সীতারামপুর হাটে পৌঁছিলাম। হাটের লোকজনেরা আমাদের চারিদিকে আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। সীতারামপুর হইতে পানীয় জল লইয়া পুনরায় রওনা হইলাম এবং রাত্রি ৯-৪৫ মিঃ কুলপী আসিয়া পৌঁছিলাম। কুলপী আসিয়া একটী দোকানে খাবার ও জল খাইয়া এবং খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রাত্রি ১১টায় রওনা হইলাম।

রাত্রির অল্পক্ষণমাত্র আমরা চন্দ্রের আলো পাইয়াছিলাম, তার পর এই আঁধার পথেই চলিতে লাগিলাম। খানিকদূর চলিবার পর আমরা একটী সুন্দর রাস্তা পাইলাম। দুই দিকে খেজুর গাছের সারি, বাতাসে রসের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। এইভাবে কতকদূর চলিবার পর আমরা নদীর ধারে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই জায়গার রাস্তা অতি চমৎকার। কোথাও নদীর পার দিয়া গিয়াছে, আবার কোথাও নদী ছাড়িয়া একটু দূরে সরিয়া যাইয়া আবার নদীর পারেই আসিয়া মিশিয়াছে। রাস্তার ধারে ধারে বাবলা গাছের সারি, ভারি সুন্দর। বাবলা ফুলের গন্ধ নদীর শীতল বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

নৈশ অন্ধকারে নদীর তীরে একটী সুন্দর স্থানে আসিয়া আমরা সাতজন যুবক বসিলাম। কি সুন্দর সে স্থান। মনে কত গভীর ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কুলু কুলু করিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, ছলাৎ ছলাৎ করিয়া তরঙ্গ আসিয়া পারের উপর আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া পড়িতেছে! এমনি শান্ত, স্নিগ্ধ, মৌন প্রকৃতি দেখিয়া নীহার গান আরম্ভ করিল। তাহার সুরের রেশ বাতাসে জমিয়া দূরে বহিয়া যাইয়া চারিদিকে প্রকৃতিতে একটা পুলকের শিহরণ

জাগাইয়া দিল। আমরা তাহার গানে আত্মহারা হইয়া অনন্তের পানে চাহিয়া রহিলাম। প্রকৃতি তখন নিস্তব্ধ, কোন সাড়াশব্দ নাই। দূরে নোঙ্গর করা ষ্টীমারের আলো দেখিতে পাইতেছিলাম। Gas-boatএর আলো ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিতেছিল ও নিবিতেছিল।

এইরূপ মনোরম রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে রাত্রি ৩টার সময় আমরা ডায়মণ্ডহারবার ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এবার আমাদের হাঁটা-পথে যাত্রার শেষ হইল। অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত, অনেক কবিত্ব ও কল্পনাময় হাঁটা-পথ আজ আমাদের কাছ হইতে বিদায় লইল।

ভোর ৫টার সময় যাদবপুরগামী ট্রেণ। এই দুই ঘণ্টা আমাদিগকে ষ্টেসনে বসিয়া থাকিতে হইল। ডায়মণ্ডহারবার ষ্টেশনে যা মশা। তাহাতে একদিনেই ম্যালেরিয়া করিয়া ছাড়ে আর কি। ভোর ৭টার সময় গাড়ী আসিয়া যাদবপুরে পৌঁছিল এবং আমরাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

এইবার আমাদের ভ্রমণ-কাহিনী শেষ হইল। ভবিষ্যতে যদি কোন ভ্রমণকারী সাগরদ্বীপে বেড়াইতে যান, তাহা হইলে আমাদের নির্দ্ধারিত পথে গেলে, তাঁহাদের অনেক সুবিধা হইবে। তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন মনে করিয়া এক একটী জলের flask সঙ্গে লয়েন, নতুবা তৃষ্ণায় যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইবে। ভ্রমণকারীগণের পক্ষে পুলিশের নিকট হইতে একটী ছাড়পত্র লওয়া বিশেষ দরকার; নতুবা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বিপদে পড়িতে হইতে পারে।

সাগরদ্বীপের প্রায় সব জায়গাতেই আমরা সুন্দর ব্যবহার পাইয়াছি। ঐ অঞ্চলের লোকেরা বেশ সরল,—আমাদিগকে তাহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে।

এইখানে আর একটী বিষয় বলা দরকার। ধবলাটের অপর পারে সমুদ্রের ভিতর মৌমুনি ফরেষ্ট। সেখানে এখনও মনুষ্য-বসতি হয় নাই। এই বছরই সেখানে জমি বিলি দেওয়া হইবে। সুন্দরবনের হিংস্র প্রকৃতির Royal Bengal Tiger ঐ জঙ্গলেই পাওয়া যায়। মৌমুনি forest দেখিবার সুযোগ আমরা পাই নাই।

হিমালয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি এ

১

তোমার নির্ঝর নদী অরণ্য কান্তার
উপত্যকা অধিত্যকা সমতল পাড়
গুহাগুম্ফা—সবি শুধু দেয় পরিচয়
তোমারে দিয়েছে ধরা সর্ব্ব সমন্বয়।
তোমারি শিখরে হেরি অখণ্ড আকাশ,
তোমারে ঘেরিয়ে আছে পবিত্র বাতাস—
জীবের জীবনরূপী—ধাতুশিলা প্রাণী
একত্র আহরি বক্ষে মহারাজধানী
গাঁথিয়াছ বক্ষে তব ওগো হিমরাজ,
যা কিছু নিখিল বিশ্বে, হেরি তব সাজ।
প্রথম প্রভাত রবি উঠে তব ভালে,
প্রথম চন্দ্রের টিপ তোমারি কপালে,
কোটি তারা-হার কণ্ঠে; মেঘের বসন
বিচিত্র বর্ণের মেলা অঙ্গের ভূষণ।

২

প্রত্যহ প্রত্যূষে রবি পরায়ে তিলক
তোমার তুষার-ভালে, প্রসাদ আলোক
বিতরে বিপুল বিশ্বে, বন্দনার শেষে;
চন্দ্রের চন্দন-রেখা ও ললাটদেশে
প্রথম পরশ লভি ঝরি পড়ে ধীরে
সুস্মিত কিরণরূপে তিমিরের তীরে।
তব আজ্ঞাবাহী মেঘ বহি বৃষ্টিধার
সৃষ্টিরে পালিছে নিত্য ভরিয়া ভাণ্ডার
ফল শস্য বারিদানে, আর্ত্ত জীব তরে।
পবন চুলায় নিত্য ঝাউএর চামরে
তুহিন-শীতল বায়ু; অনন্ত আকাশ
তারার ঝালরঘেরা ধরে বারোমাস।
ধরণীর একচ্ছত্র অজেয় সম্রাট
এই ত রাজার রূপ—শাশ্বত বিরাট।

অরূপ-রতন

শ্রীমন্মথ রায় এম-এ

এক-দৃশ্যের একাঙ্ক নাটক

"ডুব দিয়েছি রূপ-সাগরে
অরূপ-রতন আশা করে!"
—রবীন্দ্রনাথ

ইঙ্গিত।

বৃহদ্রথ ... বৃদ্ধ কাশীরাজ।

জয়াদিত্য ... কাশীরাজ কন্যা লেখার সহিত সদ্য-পরিণীত কোশলেশ্বর।

রেখানাথ ... সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী; চিত্র-কূট জনপদের অধিপতি।

লেখা ... কাশীরাজ-কন্যা।

সু-লেখা ... কাশীরাজের শ্যালিকা কন্যা।

মাধবিকা ... রাজকন্যাদের অন্তরঙ্গ সখী।

এতদ্ভিন্ন···চিত্রকূট দূত, সেনাপতি, রেখানাথের শিষ্য, ঘাতক।

স্থান এবং কাল ঃ—চিত্রকূট জনপদ-প্রান্তে কাশীরাজের শিবির।

রাত্রিতে উদ্বোধন এবং ঊষাতে বিসর্জ্জন।

* * *

দৃশ্য।—রাজকীয় শিবির। শিবিরটি একটি বিরাট বস্ত্রাবাস। তাহার যে অংশ দেখা যাইতেছে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে "দরবার", দ্বিতীয় ভাগে "অতিথি-নিবাস", এবং তৃতীয় ভাগে "বিলাস-কক্ষ"। প্রত্যেক কক্ষ অপর কক্ষের সহিত অন্তর্নিহিত ক্ষুদ্রায়তন দরজা দ্বারা সংলগ্ন। তদ্‌ভিন্ন সকল কক্ষের সম্মুখ দিয়াই বিস্তৃত অলিন্দ। সেই অলিন্দ-পথে এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাতায়াত চলে। সকল কক্ষেরই সম্মুখে বিশালায়তন সুবিস্তৃত দরজা, তাহা কালো পুরু পরদা দ্বারা আবৃত। প্রয়োজনকালে সেই পরদা উত্তোলিত হয়, এবং তখন কক্ষাভ্যন্তর সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। *

শিবিরস্থ দরবার-কক্ষে বৃদ্ধ কাশীরাজ বৃহদ্রথ এবং তাঁহার নবজামাতা কোশলেশ্বর জয়াদিত্য। সম্মুখে চিত্রকূট-দূত যুক্তকরে দণ্ডায়মান।]

বৃহদ্রথ। দূত! তুমি অবধ্য, কিন্তু, মনে রেখো তোমার প্রভু অবধ্য নয়!

দূত। মহারাজ! দাস তা অবগত আছে। এ দাস শুধু তার প্রভুর বারতা আপনার সকাশে নিবেদন করেই মুক্ত, কিন্তু, সেই যে নিবেদন ..সে নিবেদন তো নির্ভয়েই করা বিধি!

বৃহদ্রথ।···নির্ভয়েই নিবেদন কর—

দূত। আমাদের প্রভু কুমার রেখানাথ যে এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী, তা দেশবিদেশের সকল কলাবিদ্‌ই স্বীকার করেন। শুধু তা-ই নয়, তৎপ্রবর্ত্তিত চিত্র-কলা আজ দেশবিদেশে চিত্রশালায় প্রচলিত। অজন্তগুহায় তাঁর পরিকল্পিত শিল্প-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হয়ে, ভূতপূর্ব্ব মগধ-সম্রাট, কুমার রেখানাথকে এই গিরি-মেখলা নির্ঝরিণী-স্নাতা পরম রমণীয় চিত্রকূট জনপদ দান করেন।

---

* দৃশ্য-সজ্জার এই পরিকল্পনা এবং এই নাটকের মূল আখ্যান-ভাগ (plot) প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক আমার নিকট পরিকল্পিত। এই নাটকখানি সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিলাম।

নিঃ শ্রীমন্মথ রায়।

লেখা। আমি বলতে চাই, যদি সেদিন আপনি আমাকে না দেখে সুলেখাকে দেখে থাকেন ?

জয়াদিত্য।···কিন্তু তোমার হাতের হীরকাঙ্গুরীয়ক ?

লেখা। ও আপনার আত্মপ্রবঞ্চনা। নয় কি ?—হীরকাঙ্গুরীয়কের কথা আপনি আজ এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে পিতার নিকট জানতে পেরেছেন, সে দিন জানতেন না! তার পরেও না!

জয়াদিত্য। আমার কল্পনার সঙ্গে খেলা ক'রো না লেখা।···আমার সকল স্বপ্ন ভেঙে দিয়ো না, দিয়ো না—আমি তোমাকেই ভালোবেসেছি লেখা!—আর কাউকে নয়!

লেখা। তবেই দেখুন আমার এই রূপ আপনি ভালোবাসেন নি! কারণ আমারো যা রূপ সুলেখারও সেই রূপ! আপনি ভালোবেসেছেন রাজকন্যার স্মৃতি!

জয়াদিত্য। হাঁ, হয় ত তাই। কিন্তু, তাতে কি কিছু আসে-যায় ?

লেখা। হয় ত যায়, হয় ত যায় না। আমি ঠিক্ জানি না। কিন্তু, লোকে যে স্মৃতিকেই ভালোবাসে, তার জলন্ত নিদর্শন আজ পেলুম ঐ পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে, যখন চিত্রকূট-দূতের কথা শুনছিলুম!···সেই চিত্রকর কোন দিন, হয় ত মুহূর্ত্তের তরে, কোন এক নারীকে দেখেছে, আজো তার ধ্যানেই সে বিভোর! তার সেই ধ্যান রাজকুলের শ্রেষ্ঠা রূপসীও ভঙ্গ করতে পারে নি, কাল প্রভাতে মৃত্যু-রাক্ষসী পার্ব্বে কি না তাও জানি না!

জয়াদিত্য। কাল প্রভাতের আর বিশেষ বিলম্ব নেই, অতএব, শীঘ্রই তোমার কৌতূহল চরিতার্থ হবে! এখন চল···ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ রক্ষা করি!

লেখা। ফুলশয্যা ? ফুলশয্যা! হাঁ, ফুলশয্যা। কিন্তু, তার পূর্ব্বে আমার আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। অনুমতি পেলে নিবেদন করি!

জয়াদিত্য।—দয়া করে বল!···

লেখা। রাজসূয় যজ্ঞে যাকেই দেখে থাকুন, আপনি রাজকন্যারূপে আমার স্মৃতিকেই ভালোবেসে আজ আমাকে আপনার বধূরূপে বরণ করেছেন।·· কিন্তু, ··কিন্তু···

জয়াদিত্য। নিঃসঙ্কোচে বল লেখা!

লেখা। কিন্তু, আমার ভয় হয়! হাঁ, আমি শিউরে উঠি!···অন্ধকার রাত্রে···অন্ধকার কক্ষে···

জয়াদিত্য। বল···বল লেখা!

লেখা।···যদি সুলেখাকে আপনি লেখা বলে ভ্রম করে বসেন!

জয়াদিত্য। অন্ধকারেও হীরক জ্বলে!

লেখা। তা আমিও জানি! কিন্তু, তবু···তবু সুলেখা যদি···

জয়াদিত্য। হাঁ, বল···সুলেখা যদি—

লেখা।—কোন দিন আমার অজ্ঞাতে, ধরুন আমার ঘুমের মাঝে, আমার এই অঙ্গুরীয়ক চুরী করে হাতে দিয়ে, ···পরে··

জয়াদিত্য। এ যে বিষম সমস্যায় পড়লুম!···শোন। কালই আমরা কোশল যাত্রা কর্ব্ব। সেখানে আর তোমার সুলেখা রইবে না!

লেখা। তা ঠিক্ বটে!···হাঁ, সেখানে সুলেখা রইবে না বটে।···যাক্।···কিন্তু, হাঁ, ঐ চিত্রকরের বড় দর্প। কাল প্রভাতে সে পরাজিত হলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দিতেই হবে। কি শাস্তি ঠিক্ হয়েছে ?

জয়াদিত্য। প্রাণদণ্ড···খুসী হবে তবে ?

লেখা। না···না···না। তা নয়। মৃত্যু তার শ্রেষ্ঠ দণ্ড নয়।

জয়াদিত্য। তবে ?

লেখা। আমার কথা থাকবে ?

জয়াদিত্য। আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, অবশ্য থাকবে।··· বল তুমি কি দণ্ড দিতে চাও ?

লেখা। ঐ সুলেখার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে হবে!

জয়াদিত্য। হাঃ হাঃ হাঃ, সে কি!

লেখা।—আমার খেয়াল! সে রাজকন্যাকে তুচ্ছ করেছিল, এইবার অনাথাকে বধূ বলে বরণ করুক! সুলেখার হাত হতেও আমি মুক্তি পাই!

জয়াদিত্য। তুমি তবে তাকে এখনো চেন নি!—বেশ্! সে যদি সুলেখাকে বিবাহ কর্ত্তে অসম্মত না হয়, সুলেখা তারই বধূ হবে!—এইবার চল···

লেখা। আপনি অগ্রসর হন্···আমার সাজসজ্জা বাকী রয়েছে।

জয়াদিত্য। শীগ্‌গীর এসো কিন্তু!

লেখা। তাতে ত্রুটি হবে না।

জয়াদিত্য। বেশ্! আমি চললুম। [অলিন্দ-পথে নেপথ্যে প্রস্থান।]

লেখা। মাধবিকা! [মাধবিকার প্রবেশ]

মাধবিকা। কি সখী!

লেখা। আমার বিশ্বস্ততমা প্রিয়তমা সখী!

মাধবিকা। ও কি ভাই! তুমি অমন শিউরে উঠ্‌ছ কেন ?···ও কি! তোমার চোখ ছলছল কেন ?

লেখা। একটা গান শুনেছিলুম "ডুব দিয়েছি রূপ-সাগরে অরূপ-রতন আশা করে!" আমি আজ সেই ডুব দিতে চলেছি!

মাধবিকা। কি হয়েছে বোন্, খুলে বল—

লেখা। তোকে পূর্ব্বেই যখন আভাস দিয়েছিলুম, তখন তুই আমার কথা রাখতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলি। এইবার তার পরীক্ষা।

মাধবিকা। অক্ষরে অক্ষরে আমি তোমার কথা রাখব বোন্! এখন কি করতে হবে বল!

লেখা। আজ ফুলশয্যা!

মাধবিকা। তার সময় হয়েছে। চল—

লেখা। কিন্তু, আমি ফুলশয্যায় যাবো না।

মাধবিকা। তবে কি সই আমি যাবো ?

লেখা। যাবে সুলেখা।

মাধবিকা। তবে তোমার সেই খেয়ালই বজায় রইবে।

লেখা। হাঁ।

মাধবিকা। কিন্তু, সুলেখা কি সম্মত হয়েছিল ?

লেখা। তাকে আমি আজ সারাটি অপরাহ্ণ বুঝিয়েছি। অবশেষে সে সম্মত হয়েছে। তোরা তাকে আমার কৃতদাসী বলে থাকিস, এমনি অনুগত আমার সে।—কিন্তু তোরা তাকে ভুল বুঝেছিস। প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসলেই কৃতদাসী হতে হয়। সে আমার সেই কৃতদাসী। তা ছাড়া—

মাধবিকা। তা ছাড়া ?

লেখা। সুলেখা জয়াদিত্যকে ভালোবাসে। জয়াদিত্য এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর! সুন্দর সুপুরুষ সে! জয়াদিত্য সার্ব্বভৌম নরপতি! কে তাকে না ভালোবেসে থাকতে পারে!

মাধবিকা। তবে তুমি ?

লেখা। আমি সব-চাইতে ভালোবাসি তাকে যে আমাকে তুচ্ছ কর্ত্তে পেরেছে। নারী যার পূজা পায়, তাকে সে পূজা কর্ত্তে চায় না; নারী পূজা করতে চায় তাকে, যে তাকে পূজা করে না!

মাধবিকা। তবে তুমি জয়াদিত্যকে ভুললে ?

লেখা। আমি যে চিত্রকরকে ভুলতে পার্চ্ছি নে! নারীকে যে ভালোবাসে, নারী তাকে হয় ত ভুলতে পারে, কিন্তু, নারীকে যে আঘাত করে, নারী তাকে ভুলতে পারে না!

মাধবিকা। তুমি যা ভালো বোঝ, কর। আমি আমার কাজ করে যাব। যা করতে বলবে তাই কর্ব্ব।

লেখা। হাঁ বোন্, তাই কর, তাই কর। আমার জন্য ভেবো না। এই নাও অঙ্গুরীয়ক, এই অঙ্গুরীয়ক সুলেখাকে পরিয়ে দাও, আমার সাজে সাজিয়ে দাও। তাকে ব'লো শুধু আজকের রাতটুকুর জন্য আমি ছুটি চাইছি! একটি রাত! শুধু একটি রাত!

মাধবিকা। বলব। কিন্তু, কোশলরাজ যদি অঙ্গুরীয়ক সত্ত্বেও সুলেখাকে আর কোনরূপে চিনতে পারে!

লেখা। কোশলরাজ স্মৃতির ধ্যান করেন। যাকেই তিনি পান না কেন, মনে কর্ব্বেন সে আমি, কাশী-রাজকন্যা লেখা। তা ছাড়া, "অন্ধকারে হীরক জ্বলে ব'লে" তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। [শিবির-প্রান্তে সানাই বাজিয়া উঠিল।] ঐ সানাই বাজছে!···ফুলশয্যার তান!—না বোন্, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়, তুই যা···শীগ্‌গীর! [তাহাকে অঙ্গুরীয়ক দিয়া অলিন্দ-পথে ঠেলিয়া দিলেন। মাধবিকা লেখার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিয়া, পরে অদৃশ্য হইল।]

[শিবির-প্রান্তে সানাই বাজিতে লাগিল। একমনে লেখা তাহা শুনিতে লাগিলেন। পরে একবার অলিন্দ-পথে বাহির হইলেন, আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া পর্দ্দা ছাড়িয়া দিয়া আত্মগোপন করিলেন। একাধিকবার এইরূপ করাতে মনে হইল তিনি খুব বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, এদিকে, ফুলশয্যার শোভাযাত্রা অলিন্দ-পথ দিয়া ক্রমে বিলাস-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। লেখা ছুটিয়া যাইয়া অতি সঙ্কোচে সেই জনতার মধ্যে মিশিয়া গেলেন। ধূপ দীপ আলো, নানাবিধ যৌতুক প্রভৃতি বহন করিয়া, সখীগণ, বাহকগণ, অনুচরগণ, শোভা-যাত্রার পুরোভাগে এবং পশ্চাদ্‌ভাগে সুসজ্জিত ছিল। মধ্যভাগে

ছিলেন বরণডালা হাতে কুলস্ত্রীগণ এবং, ক্রমে, জয়াদিত্য, (অবগুণ্ঠিতা সুলেখা), এবং বৃহদ্রথ।

বিলাস-কক্ষে শুধু তাঁরাই প্রবেশ করিলেন যাঁরা শোভা-যাত্রার মধ্যভাগে ছিলেন। কাশীরাজ ও কুলস্ত্রীগণ বর ও বধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পার্শ্বস্থ দ্বারপথে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর সখীগণ, বরণডালা হাতে লইয়া, দুই পার্শ্বস্থ দ্বারপথে বিলাস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সানাই বাদ্যের তালে তালে, বর ও বধূকে আরতি-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিল। নাটকে গানের প্রয়োজন, অতএব, খুব সম্ভবতঃ তাহারা সময়োপযোগী গানও গাহিয়াছিল। তাহা শেষ হইলে, ক্রমে, তাহারা অদৃশ্য হইল, এবং বিলাস-কক্ষের সম্মুখস্থ পর্দা, ধীরে ধীরে, বিলাসকক্ষের সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল। শোভাযাত্রার যাহারা বাহিরে ছিল, ততক্ষণ, তাহারাও অপসৃত হইয়াছে। ক্রমে সানাইও থামিয়া গেল।

অতিথি-নিবাসের সম্মুখস্থ দরজা-পথের পর্দ্দার আড়াল হইতে লেখা বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিত চরণে বিলাস-কক্ষের পরদা-পথে উঁকি দিতে যাইয়াই সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে অলিন্দ-পথে, ধীরে ধীরে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখেন সেখানে চিত্রকর-সম্রাট রেখানাথ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। বোধ করি তিনি শোভাযাত্রার ভিড়ের মধ্য হইতে কোন সময়ে এইখানে আসিয়া কাহারো প্রতীক্ষা করিতেছেন। লেখা তাঁহাকে দেখিয়াই প্রথমে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে গিয়াই আবার ফিরিলেন। এবং ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সাহস-ভরে কথা কহিয়া তাঁহার তন্ময়তা দূর করিলেন।]

লেখা। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন!

রেখানাথ। আমার আশীর্ব্বাদ! [হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।]

লেখা। আপনার পদস্পর্শে আমাদের এই দীন বস্ত্রা-বাস ধন্য!

রেখানাথ। পরিহাসও তবে কলাবিদ্যা হিসাবে শিক্ষা করা যায় দেখছি! বাঃ চমৎকার!···হুঁ···কিন্তু রাজা কোথায়? অথবা কোশলেশ্বর জয়াদিত্য?

লেখা। রাজা শয়নকক্ষে এতক্ষণ নিদ্রাগত। আর কোশলেশ্বর তাঁর হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে ফুলশয্যার প্রেমরঙ্গে মত্ত। আপনার যা প্রয়োজন, যদি নিতান্ত অসঙ্গত না হয়, তবে আমাকেই বলতে পারেন···

রেখানাথ। আপনি—

লেখা। আমি সুলেখা, কাশীরাজের শ্যালিকা-কন্যা।

রেখানাথ। আমি আপনার কথা শুনেছি; তবে দেখলুম আজ এই প্রথম। রাজকন্যা লেখার চিত্রাঙ্কনার্থ যখন আমি নিমন্ত্রিত হয়ে রাজপ্রাসাদে অতিথি ছিলুম, তখনি আপনাদের এই অশ্রুতপূর্ব্ব সাদৃশ্যের কথা শুনি। আর সেই সময় রাজকন্যার সেই হীরকাঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞানের খবর জেনেছিলুম বলেই আজ আপনাকে রাজকন্যা লেখা বলে ভুল করে বসিনি!

লেখা। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ এই গভীর রাত্রে এখানে আপনার শুভ-পদার্পণের উদ্দেশ্য?

রেখানাথ। কাল প্রভাতে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ! তবু, আজ রাত্রের এই অনিয়ম ক্ষমা করা কি এতই কঠিন?

লেখা। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন! আমি কোন কৈফিয়ৎ চেয়েছিলুম না। কৌতূহল হয়েছিল, সেই কৌতূহল চরিতার্থ কর্ত্তে চেয়েছিলুম। বরং আপনিই আমাকে ক্ষমা করুন!

রেখানাথ। তর্ক-বিতর্কে নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই! তোমাদের অভিভাবকগণের আমি দর্শন ভিক্ষা করি।

লেখা। আমিও বৃথা কথা বলে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট কর্ত্তে চাই নে। আপনার উদ্দেশ্য আমার নিকট বিবৃত করুন·····আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। জানবেন আমি তাঁদেরই প্রতিনিধি।

রেখানাথ। তবে আপনিই শুনুন। কাল প্রভাতে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। আজ তাই এই সুন্দর ধরণী হতে বিদায় নেবার জন্য নিজকে প্রস্তুত করছি! স্নেহ-কাতর বৃদ্ধ কাশীরাজের মনে আমি যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছি, আজ আমাকে আমার সেই অনুতাপ হতে মুক্ত হতে হবে। মুক্ত না হলে আমার বিদায় পরিপূর্ণ হবে না। এই নিন রাজকন্যা লেখার প্রতিকৃতি!

লেখা। [পরিপূর্ণ ঔৎসুক্য কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া] সে কি! এ কি!···কই? [হাত বাড়াইয়া

প্রতিকৃতি গ্রহণ করিয়া তাহা দেখিয়া] উঃ, এ যে অবিকল, অবিকল প্রতিচ্ছবি!···কিন্তু, কিন্তু, তবে আপনি আপনার সংকল্প ত্যাগ কর্লেন?···নিকৃষ্টতর সৌন্দর্য্য এঁকে আপনি পরাজয় স্বীকার কর্লেন?

রেখানাথ। প্রতিমূর্ত্তি নিখুঁত হয়েছে?

লেখা। নিখুঁত, নিখুঁত! এ তো শুধু প্রতিকৃতি নয়, এ জীবন্ত মূর্ত্তি।···যাক্, আমার সাধনা সফল হ'ল।···আজ তোমার এই পরাজয় কামনা করেই আমি তোমার শিল্প-কুঞ্জে অভিসারে চলেছিলুম—

রেখানাথ। ···বিদায়! আমার শিষ্যের শ্রম সার্থক হয়েছে।···অতি যত্নে সে এঁকেছে! আমি আমার শ্রেষ্ঠ তুলি দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ কর্ব্ব!

লেখা। [সবিস্ময়ে]···এ চিত্র তবে তুমি আঁকো নি?

রেখানাথ। আমি?—হাঃ হাঃ হাঃ।

লেখা। এ চিত্র আমরা গ্রহণ করলুম না!···[সরোষে] ফেরৎ নাও···

রেখানাথ। —ফেরৎ নিতে হয়, শিষ্য নেবে; আমার কাজ শেষ হয়েছে। শোন নারী! আমার সুন্দরী তোমাদের দেখছে, আর হাস্‌ছে!···ঐ যে চিত্র···ঐ চিত্রে, ঐ মধু-মুখের ঐ চারু ওষ্ঠের একটি পাশে ছোট্ট একটি কালো তিল বসিয়ে দিলে ঐ চিত্র আরো শতগুণ সুন্দর হয়ে উঠত··· সেই যে সৌন্দর্য্য, সেই সৌন্দর্য্যের চাইতেও শতগুণে সুন্দর আমার সুন্দরী!···কাল প্রভাতের পরীক্ষায় আমি ভয় পাই নি!···আমার এই শিষ্যও তো ভয় পেতো না··· সে শুধু ঐ ছবিতে একটি তিল বসিয়ে দিত!···কিন্তু, আমার ভয়, আমি, আমার সুন্দরীকে, কাল প্রভাতে বিশ্ব-ভুবনে তার মহিমার পরিপূর্ণ সমারোহে প্রকাশিত কর্ত্তে পার্ব্ব কি না!···আমি ক্লান্ত, আমি শ্রান্ত, আমার তুলি চলে না! কালী সরে না!···দীর্ঘপথের যাত্রী আমি! সাথী নেই, দোসর নেই।...তবু চলেছি! চলেছি! সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে—তারি উৎসাহে চলেছি! চল্‌ব!

লেখা। চিত্রকর! চিত্রকর! বল···আরো বল···

রেখানাথ। "ডুব দিয়েছি রূপ-সাগরে
অরূপ-রতন আশা ক'রে!"

লেখা। চিত্রকর! চিত্রকর!···তুমি কি যাদুকর?

রেখানাথ। আমি চললুম। আজ এই রাত্রিটুকু আমাকে অমানুষিক শ্রম কর্ত্তে হবে। আমার মাথার ভেতর রূপের আগুন জ্বলছে! হয় ত সে আগুন বিশ্ব আলোকিত কর্ব্বে, না হয়, তাতে আমার সকল সত্ত্বা ভস্মীভূত হবে।·· কিন্তু, তবু এর শেষ দেখব! মর্ত্তে হয় মর্ব্ব, স্বপ্নে বিভোর হয়ে পরলোকে যাবো···সেখানে আবার চেষ্টা কর্ব্ব, না পারি, আবার মর্ত্ত্যে নেমে আসবো! যুগে যুগে জন্ম আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমার এই সাধনা চল্‌বে!

লেখা। চিত্রকর! চিত্রকর! তোমার সুন্দরীর কথা বল—

রেখানাথ। সময় নেই, সময় নেই। আমার শেষ কথাটি তোমাকে বলে যাই! রাজকন্যা লেখাকে ব'লো, সে যেন আমাকে ভুল না বোঝে। যদি আমি কাল প্রভাতে জয়ী হই, বিশ্ব ভুবন বুঝবে কি সৌন্দর্য্যে আমি মত্ত মাতাল হয়ে রয়েছি! আর যদি পরাজিত হই, তবু, রাজকন্যা লেখাকে আমি আমার সুন্দরীর আভাস দিয়ে যাবো। চিত্রপটে আমি তার রূপরেখা যতটুকু ফোটাতে পারি, সেইটুকু লেখাকেই উৎসর্গ করে যাব—সেই হবে আমার জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ উৎসর্গ! লেখা সেই রূপরেখা ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে আরো সুন্দর হবে, আরো অপরূপ হবে!

লেখা। লেখাকে এ উপহার কেন?

রেখানাথ। আমি জানি, সে আমাকে ভালোবেসেছে! [বলিয়াই চকিতে অলিন্দ-পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লেখা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন।]

[মুহূর্ত্তপরে সেখানে ত্বরিৎপদে মাধবিকা আসিয়া বিস্ময়াভিভূতা লেখাকে স্পর্শ করিয়া সচকিত করিল।]

মাধবিকা। তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়েই রয়েছ?—সর···সর···ছুটে পালাও!···ওরা এখানে উঠে আস্‌ছে!

লেখা। কারা?

মাধবিকা। বর এবং বধূ!

লেখা। তুমি তা জানলে কেমন করে?

মাধবিকা। আমি আড়ি পেতে বসে ছিলুম! ওদের সব প্রেমালাপই শুনেছি। এখন ওদের বেড়াতে সখ হয়েছে। ঐ জ্যোৎস্না উঠেছে! বসন্ত-সমীরণ ভেসে আসছে! প্রেমসাগরে তুফান উঠেছে!

লেখা। কবিত্ব থাক্। শোন—

মাধবিকা। বল—

লেখা। আমার ঘরে চল। সুলেখাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু নিজমুখে তা বলতে সাহস পাচ্ছি নে! লজ্জা হচ্ছে! তুমি আমার দূতী হয়ে তাকে তা নিবেদন কর্ব্বে!

মাধবিকা। কিন্তু তাকে একলা পাবার সুযোগ পেলে হয়। সে হবে এখন।...ঐ তারা আসছে!—চল...পালাও —[লেখার হাত ধরিয়া অতিথি-নিবাসে আত্মগোপন।]

[কিছু পরে, সুলেখা ও জয়াদিত্য হাত-ধরাধরি করিয়া অলিন্দ-পথে দরবার-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

জয়াদিত্য। এই জ্যোস্না রাত্রে তুমি আমার কোলে মাথা রেখে গান গাও, আমি শুনি!

সুলেখা। গান নয়, তুমি গল্প কর, আমি শুনি। তোমার যুদ্ধজয়ের কাহিনী বল, তোমার কীর্ত্তি-কাহিনী বল, দেশের সার্ব্বভৌম নরপতি তুমি, কি তোমার গৌরব, কি তোমার গর্ব্ব আমাকে বল...আমি শুনব! আমি শুনব!

জয়াদিত্য। বল্‌ব! সব বল্‌ব!.. কিন্তু আমি কি শুধু বল্‌ব-ই? শুনব না?...

সুলেখা। বেশ, তবে শোন...

[সুলেখা গান গাহিলেন। গান শুনিতে শুনিতে জয়াদিত্য সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।]

সুলেখা। [গীতান্তে] এ কি! তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ? [কিয়ৎক্ষণ তাঁহার ঘুমন্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া] না থাক্।...সারাদিন যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত তুমি,... ঘুমাও। আমি গান গাই! সেই স্বপ্নের গান, যার আরম্ভও জানি নে, কখন যে ভেঙে যাবে তাও জানিনে! ...কি রহস্যময় এই স্বপ্নের জীবন, অথবা, জীবনের স্বপ্ন! [তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। অথবা, নাটকীয় প্রয়োজনে হয় ত আর একটি গানও গাহিলেন।]

[অতি শঙ্কিত চরণে মাধবিকা আসিয়া সুলেখার অঙ্গ স্পর্শ করিল। সুলেখা চমকিয়া উঠিলেন।]

সুলেখা। কি?

মাধবিকা। চুপ্!...[নিম্নকণ্ঠে] শুনে যাও—

সুলেখা। কোথায়?

মাধবিকা। ...নির্জ্জনে!...চল...ঐ বিলাস-কক্ষে—

সুলেখা। [অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে জয়াদিত্যকে দেখাইলেন।]

মাধবিকা। ঘুমিয়ে রয়েছেন, বেশ।...ওঁকে না জাগানোই ভালো, তবে আমাদের কথা কইবার সুযোগ হবে না, অথচ, বড় জরুরী কথা—

সুলেখা। কিছু কি প্রকাশ পেয়েছে?

মাধবিকা। তুমি এসে শুনে যাও বোন্!

[নিতান্ত অনিচ্ছাতেই সুলেখা মাধবিকার পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইলেন। যাইবার সময় দরবার-কক্ষের পরদা টানিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহারা অলিন্দ-পথে চলিয়া বিলাস-কক্ষের পরদা অপসারিত করিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।]

সুলেখা। ...কি বোন?

মাধবিকা। লেখার কাজ শেষ হয়েছে।

সুলেখা। কিন্তু, কিন্তু ..রাত কি ভোর হয়েছে?

মাধবিকা। না, এখনো বিলম্ব আছে। শোন বোন! কাল প্রভাতে চিত্রকর রেখানাথ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপনীত হবেন। আজ রাত্রে সেই মৃত্যু-পথ-যাত্রীকে পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য, লেখা, তোমার হাতে তার আজ রাত্রির পত্নীত্ব সমর্পণ করে, অভিসারিকা সেজেছিল—হাঁ, এ অভিসারিকা ভিন্ন আর কি!

সুলেখা। —[আপন মনে] চন্দ্রমা তো এখনো অস্ত যায় নি!

মাধবিকা। লেখার সেই পরীক্ষা শেষ হয়েছে!

সুলেখা। কিন্তু আমার স্বপ্ন তো এখনো শেষ হয় নি!

মাধবিকা। শোন বোন—

সুলেখা। না...না...ব'লো না, ব'লো না...রাত্রি শেষ হোক্, তার ঘুম ভাঙুক্...

মাধবিকা। সুলেখা!

সুলেখা। চুপ!

মাধবিকা। তবে শোন—

সুলেখা। বল...বল...না, না, ব'লো না!

মাধবিকা। ...তুমি বুঝেছ!...লেখা এখন তোমার হাতের ঐ অঙ্গুরীয়ক ফেরৎ চায়—

সুলেখা। ও—হো—হো! [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া কৌচে এলাইয়া পড়িলেন]

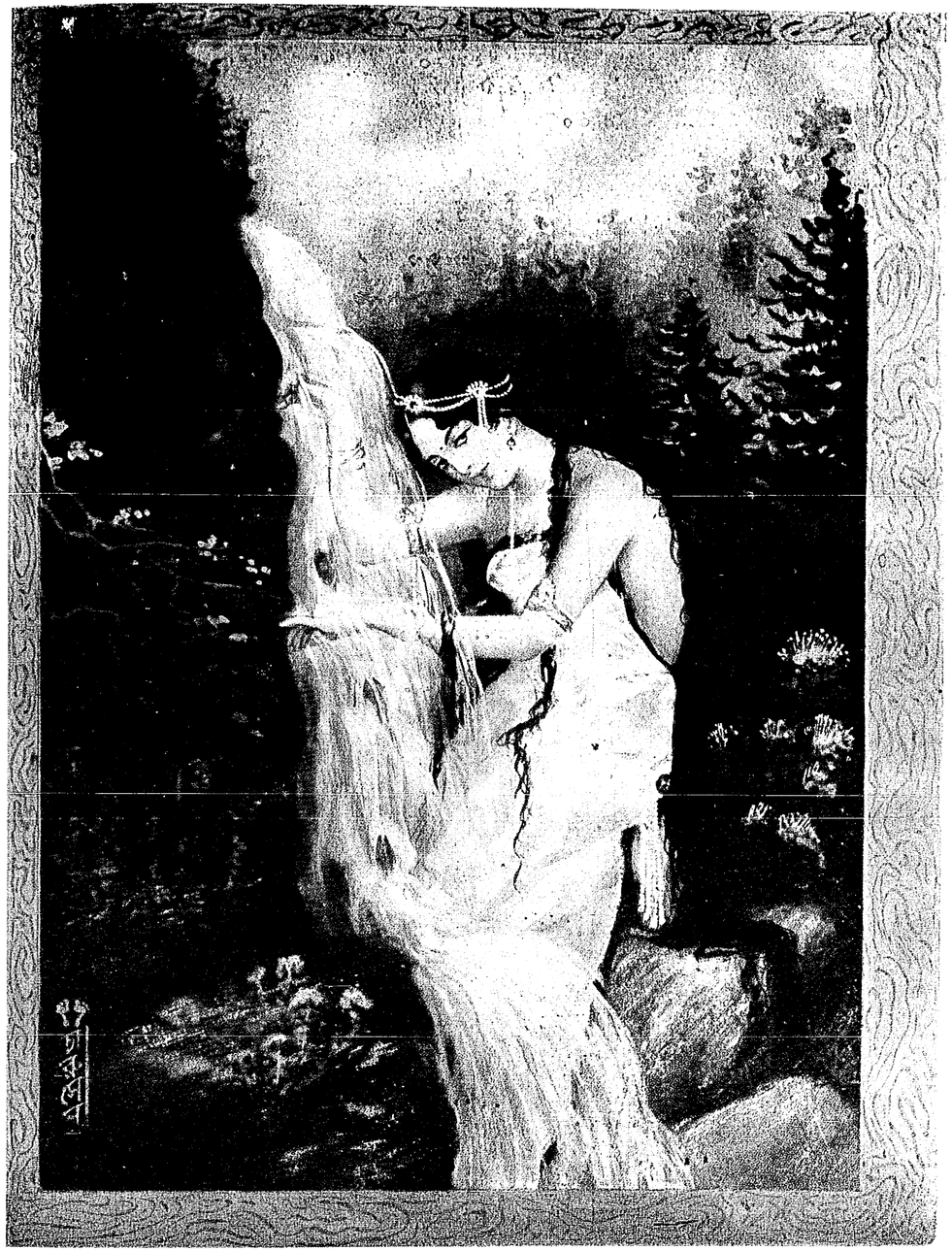

ঝরণা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

মাধবিকা। সুলেখা! সুলেখা! আমি ঐ পর্দ্দার আড়ালে যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম···ওঠ···আত্মসম্বরণ কর···অঙ্গুরীয়ক দাও—

সুলেখা। না—না—না—! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

মাধবিকা। সে কি!

সুলেখা। পারি না, পার্ব্ব না, তাকে ছেড়ে দিতে পার্ব্বো না! তিনি আমাকে ভালোবেসেছেন! তিনি আমাকে তাঁর ইহকাল পরকাল নিবেদন করেছেন, আমি তাঁকে আমার জীবন-মন সমর্পণ করেছি! এ তো একদিনের, এক রাত্রির ভালোবাসা নয় সখী!

মাধবিকা। মনে রেখো তুমি তার পত্নী নও—

সুলেখা। হাঁ, মন্ত্রপাঠ হয় তো হয় নি! কিন্তু·· না—না—না—এ যে কিসের বন্ধন আমি বলতে পার্ব্ব না!

মাধবিকা। লোকে বলবে এ ব্যভিচার!

সুলেখা। রাধিকার এই ব্যভিচার তাঁর মাথার মণি ছিল, আমার এই ভালোবাসা আমারো মাথার মণি!

মাধবিকা। কিন্তু কথার তো আর সময় নেই! তুমি তবে রাজকন্যার প্রস্তাবে সম্মত নও?

সুলেখা। না—না—না! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।]

মাধবিকা। জীবনে বোধ করি এই প্রথম তোমার ভগিনীর অবাধ্য হলে।

সুলেখা। ওঃ [মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।]

মাধবিকা। মূর্খ তুমি! জয়াদিত্য তোমাকে ভালোবাসে নি, ভালোবেসেছে রাজকন্যাকে। তাঁর ধারণা তুমিই রাজকন্যা। যে মুহূর্ত্তে তিনি জানতে পার্ব্বেন যে তুমি সুলেখা, নও, সেই মুহূর্ত্তেই···

সুলেখা। [চমকিয়া উঠিয়া]—সে কি!

মাধবিকা। হাঁ, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তোমাকে ঘৃণায় পরিত্যাগ কর্ব্বেন। যাও দেখি তুমি তাঁর কাছে একবার ঐ অঙ্গুরীয়ক ত্যাগ করে!

সুলেখা। না—না—না!···তা কি সে পারে! সে আমাকে মনে প্রাণে ভালোবেসেছে বলেছে! বলেছে—ওগো রাণী! যুগযুগান্তেও জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়েও আমি তোমারি!

মাধবিকা। অবোধ তুমি! নিতান্ত সরলা তুমি! তোমার অদৃষ্টে বহু দুঃখ আছে। সময় থাকতে এখনো সাবধান হও!··একবার গিয়েই দেখ না তাঁর কাছে ঐ অঙ্গুরীয়ক ত্যাগ করে!

সুলেখা।—হাঁ, তাই যাব। তাতে আমার ভয় নেই! আমি তাঁর কালো চোখে তাঁর মনের অন্তরতম কথাটি পর্য্যন্ত পড়েছি।···হাঁ যাব।—এই নাও তোমার অঙ্গুরীয়ক। [অঙ্গুরীয়ক দান।] আমি চললুম। আমি তাঁকে সব খুলে বলব! তবু দেখবে সে আমারি, আমি তাঁরি! [উদ্‌ভ্রান্তভাবে পার্শ্বস্থ দ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মাধবিকা তাহার এই উন্মাদনা লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। তাহার চমক ভাঙিল তখন, যখন পরে লেখা আসিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন।]

লেখা। অঙ্গুরীয়ক—?

মাধবিকা। নাও···[অঙ্গুরীয়ক দান।]···কিন্তু প্রথমে সে কিছুতেই স্বীকৃত হয় নি!

লেখা। আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। কিন্তু, কি কর্ব্ব! উপায় নেই! অরূপ-রতন আশা করে রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি! কি পাব কে জানে!···

মাধবিকা। সুলেখা সেজে তবে আশা মিটল না?

লেখা। মিটল না! মিটল না!···কিসে যে কি পাব কে জানে! আলেয়ার আলো লুকোচুরী খেলছে! তারি পেছনে আবার ছুটেছি এই অঙ্গুরীয়ক নিয়ে! হয় ত তার উপহার পাবো।..কিন্তু, পাবো কি না তাই বা কে জানে! ওগো, এই কি মরীচিকা? মাধবিকা! মাধবিকা! মৃগতৃষ্ণিকার অর্থ জানিস?

মাধবিকা। রাত্রি শেষ হয়ে এল। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও লেখা!

লেখা। ঘুম? আজ রাত্রে ঘুম?···জীবনে আর ঘুম আছে কি না তাই বা কে জানে!···না, না···আমি চললুম! এইবার জয়াদিত্যের পরীক্ষা। আমার ভাগ্যের জাল আমি নিজে বুনে যাচ্ছি!—সেই জালে কে জড়িয়ে মর্ব্বে জানিনে!···আমি নিজে? না জয়াদিত্য? না চিত্রকর?

[বিহ্বলভাবে পার্শ্বস্থ দ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, মাধবিকাও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল। প্রহর শেষের সানাই বাজিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল।]

[ইহার পর দেখা গেল দরবার-কক্ষের পরদা সরাইয়া সুলেখা ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত জয়াদিত্যকে জাগাইলেন]

সুলেখা। জাগো! ওগো জাগো! জাগো!

জয়াদিত্য। কে?

সুলেখা। বল দেখি কে! [দীপ নিভাইয়া দিলেন]

জয়াদিত্য। আমি দেখেছি।···তুমি আমারই হাতের লেখা। কিন্তু লেখা! অন্ধকারে এ আবার তোমার কি খেলা?

সুলেখা। আলোতে নির্ভয়ে কথা বলা যায় না। আলোতে সত্য কথা দীপ্তি পায় না। অন্ধকারেই আজ আমাদের হৃদয় খুলতে হবে। আমি একটা দুঃস্বপ্নের কথা যদি তোমার কাছে বলি—

জয়াদিত্য। তুমি কি ভয় পেয়েছ রাণী?

সুলেখা। ভয় পেয়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।··· বলব?

জয়াদিত্য। নির্ভয়ে বল! যুগের শ্রেষ্ঠ বীরের বুকে তোমার আশ্রয়। নিঃসঙ্কোচে তোমার রহস্য প্রকাশ কর রাণী!

সুলেখা। তবে শোন! আজ যেন আমি তোমার ভালোবাসা পেয়েছি, এখনো পাচ্ছি, কিন্তু—

জয়াদিত্য। থেমো না, বল—

সুলেখা। কিন্তু, মনে কর আমি রাজকন্যা নই, আমি কোন অভাগিনী ভিখারিণী!

জয়াদিত্য। রাণী হতে হলেই যে রাজকন্যা হতেই হবে, এ কথা তোমাকে কে বল্‌লো লেখা? আর, ও কষ্ট-কল্পনারই বা প্রয়োজন কি?

সুলেখা। প্রয়োজন আছে। যদি আমি ভিখারিণী হতুম, তবু তুমি আমায় ভালোবাসতে?

জয়াদিত্য। তা না বাসলে, আমার এ ভালোবাসা যে মিথ্যা হ'ত প্রিয়তমে!

সুলেখা। আজ যদি আমি বলি আমি লেখা নই, আমি সুলেখা—

জয়াদিত্য। হাঃ হাঃ হাঃ! অন্ধকারেও হীরক জ্বলে!—তোমার হাতের ঐ হীরকাঙ্গুরীয়ক ঘোষণা কর্ব্বে যে তুমি...কিন্তু এ কি! তোমার অঙ্গুরীয়ক?

সুলেখা। নেই! নেই!...ওঃ [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।]

[সহসা দীপ জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল সুলেখার পার্শ্বে মাধবিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।]

মাধবিকা। সখী!···এই তোমার হীরকাঙ্গুরীয়ক। [তাহার হাতে পরাইয়া দিতে দিতে]...তুমি হারিয়েছিলে, তোমার বোন্ পেয়ে আমাকে দিয়ে তোমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন!

সুলেখা। ওঃ [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

জয়াদিত্য। মাধবিকা! মাধবিকা! জল আনো! বাতাস কর!

[সম্মুখস্থ পর্দ্দা পড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে সমস্ত শিবির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। করুণ সুরে সানাই বাজিতে লাগিল। ক্রমে উষার আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শিবিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ দিয়া এক দল বৈতালিক প্রভাতী গাহিয়া গেল। তাহারা যখন চলিয়া গেল, তখন প্রভাত হইয়াছে। পাখীরা গান গাহিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে দরবার-কক্ষের পর্দ্দা সরিয়া গেল। জয়াদিত্য ও কাশীরাজ বৃহদ্রথ দরবার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।]

বৃহদ্রথ। তোমার প্রভু কোথায়?

দূত। তিনি তাঁর চিত্রশালায়।

জয়াদিত্য। তার সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার চিত্র কই?

দূত। [নতশিরে নীরব রহিল]

জয়াদিত্য। তার সুন্দরী শ্রেষ্ঠার চিত্র কোথায়?

দূত। [তথাপি পূর্ব্ববৎ নীরব।]

বৃহদ্রথ। এই মুহূর্ত্তে উত্তর চাই—বল দূত অবিলম্বে, নইলে, সেনাপতি! ঘাতক!

[তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ও ঘাতক আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।]

দূত। আমার যা বলবার আছে, আমি নির্ভয়েই বলব।

জয়াদিত্য। কথা রাখ।···বল, কোথায় তার সেই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি?

দূত। তিনি তা অঙ্কন কর্ত্তে অক্ষম হয়েছেন!

জয়াদিত্য। তা আমি পূর্ব্বেই জান্‌তুম!

বৃহদ্রথ। আমিও তা পূর্ব্বেই জানতুম! কিন্তু, শুধু

অক্ষমতা জ্ঞাপন কর্লেই তো চলবে না, আমার কন্যার বিশ্ববিজয়িনী রূপের অমর্য্যাদা করবার গুরু অপরাধের দণ্ডভোগ কর্ত্তে হবে। সেনাপতি! চিত্রকর রেখানাথকে এখানে অবিলম্বে উপস্থিত কর—

[সেনাপতি প্রস্থান করিল।]

দূত। স্মরণ রাখবেন কুমার রেখানাথ যুগপ্রবর্ত্তক চিত্র-শিল্পী। এই প্রতিভা অকালে ধ্বংস কর্লে ভবিষ্যৎ-মানব পর্য্যন্ত আপনাকে ধিক্কার দেবে, আপনাকে অভিশাপ দেবে।

বৃহদ্রথ। সে আমার কন্যার অপরূপ রূপকে অপমান করেছে। অন্য কেউ এ অপমান কর্লে, ক্ষমা করা যেত, কিন্তু, ঐ যুগ-প্রবর্ত্তক শিল্পী আমার যুগ-বরেণ্যা কন্যাকে অপমান করেছে, যুগান্তরেও, লোকে ইতিহাসের কল্যাণে এ কথা না জেনে ছাড়বে না! আমি শুদ্ধ সেই জন্য সেই অপরিণামদর্শী চিত্রকরকে ক্ষমা করতে অক্ষম!

[চিত্র হস্তে লেখার প্রবেশ।]

লেখা। ক্ষমার প্রয়োজনও নেই!—সে···চিত্র দিয়ে গেছে!·····আর, সে চিত্র আমাদের রূপগর্ব্ব চূর্ণ করেছে! ···এই দেখুন—[বৃহদ্রথ-হস্তে চিত্র দান।]

বৃহদ্রথ। এ কি! মা সুলেখা! এ চিত্র তুমি কোথায় পেলে?

লেখা। সে কাল রাত্রে, ফুলশয্যার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সময়, এই চিত্র আপনার উদ্দেশে নিবেদন করে গেছে!

বৃহদ্রথ। দেখ দেখি বৎস! [চিত্রখানি জয়াদিত্যের হস্তে দিলেন।]

জয়াদিত্য। কিন্তু···এ যে রাজকন্যা লেখার মুখখানিই মনে করিয়ে দেয়!

লেখা। হাঁ রাজা!···ও লেখা-সুলেখারই প্রতিমূর্ত্তি; কিন্তু, ঐ ছবির মুখ-সৌন্দর্য্য আরো শতগুণে ফুটে উঠেছে··· ঐ চারু ওষ্ঠের পাশে ঐ ছোট্ট কালো তিলটিতে, যা আমাদের কারো নেই!

বৃহদ্রথ। সত্য?

জয়াদিত্য। [অধোমুখে]—সত্য।

লেখা। [পিতাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া] এইবার তবে আমাকে বিদায় দিন!

বৃহদ্রথ। সে কি মা!

লেখা। মনে মনে আমি তাঁকে আমার গুরুরূপে বরণ করেছি!···এইবার তাঁর পথেরই পথিক আমি!

বৃহদ্রথ। সে কি কথা মা!···আসুক সে, সে কি বলে শুনি!

[সেনাপতির ও রেখানাথের শিষ্যের প্রবেশ]

সেনাপতি। সে আশা বৃথা। তিনি বিদায় নিয়েছেন।

লেখা। [পাংশু হইয়া] সে—কি!

সেনাপতি। আমি যখন তাঁর দেখা পেলুম, তখন তাঁর শেষ-মুহূর্ত্ত!···তিনি এই বস্ত্রাবৃত চিত্রখানি আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন "রাজকন্যা লেখাকে সশ্রদ্ধ উপহার!"

লেখা। আমি জানি! আমি জানি! ওঃ [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অব্যক্ত বেদনায় অভিভূত হইলেন।]

জয়াদিত্য। কিন্তু, তবে কি সে-ই আমাদের পরাজিত করে চলে গেল?···বল সেনাপতি, এখনও ছুটে গেলে কি তার সঙ্গে দেখা হয়?

সেনাপতি। তাঁর আত্মা নশ্বর দেহ বহুক্ষণ ত্যাগ করেছে!

বৃহদ্রথ। [জয়াদিত্যের প্রতি] বৎস···যাবে?

জয়াদিত্য। হাঁ, যাব। সার্থক তার দম্ভ! তার জীবনের দম্ভ মরণে গগনস্পর্শী হয়েছে, সম্ভ্রমে আমার মাথা নত হয়েছে, আসুন পিতা···তার মৃতদেহের সম্রাটোচিত সৎকার-ব্যবস্থা করি।

বৃহদ্রথ। চল·····

[একটা মৌন বেদনা সকলের চোখে মুখে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সসম্ভ্রমে, সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহারা রেখানাথের মৃত্যু-বাসরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন শুধু লেখা আর রেখানাথের সেই শিষ্য।]

শিষ্য। আপনিই কি রাজকন্যা লেখা?

লেখা। না—না—না—!

শিষ্য। তবে আমার গুরুর এই শেষ এবং শ্রেষ্ঠ দান··· এই বস্ত্রাবৃত চিত্রখানি রাজকন্যার হাতে দেবেন···আমি আর বিলম্ব কর্ত্তে পাচ্ছিনে!

লেখা। দিন। [পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় চিত্রগ্রহণ]···সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য এই চিত্রে লুকিয়ে আছে!...আমি খুলব! আমি দেখব! হাঁ, আমার অধিকার আছে!

[চিত্র আচ্ছাদন-মুক্ত করিলেন।]......কিন্তু, কিন্তু... এ কি!

শিষ্য। কি?

লেখা।—[চিত্রপট দেখাইয়া] চিত্রপট···শূন্য···সাদা··· সম্পূর্ণ সাদা!···এতে রেখামাত্র পড়ে নি!···

শিষ্য। ঐ হচ্ছে অরূপ-রতনের অরূপ চিত্র, রেখা দিয়ে তা আঁকা যায় না,—গেলে, জগতে একমাত্র তিনিই তা আঁকতে পার্ত্তেন!···বিদায় দেবী!···বিদায়!

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান।]

লেখা। [শূন্যে চাহিয়া] হে আমার অরূপ-রতন! আমার প্রণাম গ্রহণ কর! [প্রণাম।]

যবনিকা

মসুরীর কথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬ই এপ্রেল—আমার মধ্যে যে "ভবঘুরে"টা আছে তার জ্বালায় বিরক্ত হয়ে যখন কোথায় পালাই ভাবছি, তখন অনাহূত বৃষ্টি-ধারার মত বন্ধুবর নীরদবরণ এসে হাজির।

—কি সমাচার?···

চ্যাপম্যান্স এজেন্সী—রাজপুর

কতকগুলো খাতা ধপাস্ করে খাটের উপর ফেলে সুর করে সে গাইলে—"চলো মুসাফের, বাঁধ গাঁটরিয়া, বহুদূর জানা হৈ"—

—ব্যাপার কি রে?

—কবি-লোক হয়ে তুই বুঝতে পারলি না; বিছানা-পত্তর বেঁধে ফেল্, আমার সঙ্গে মসুরী চল্!

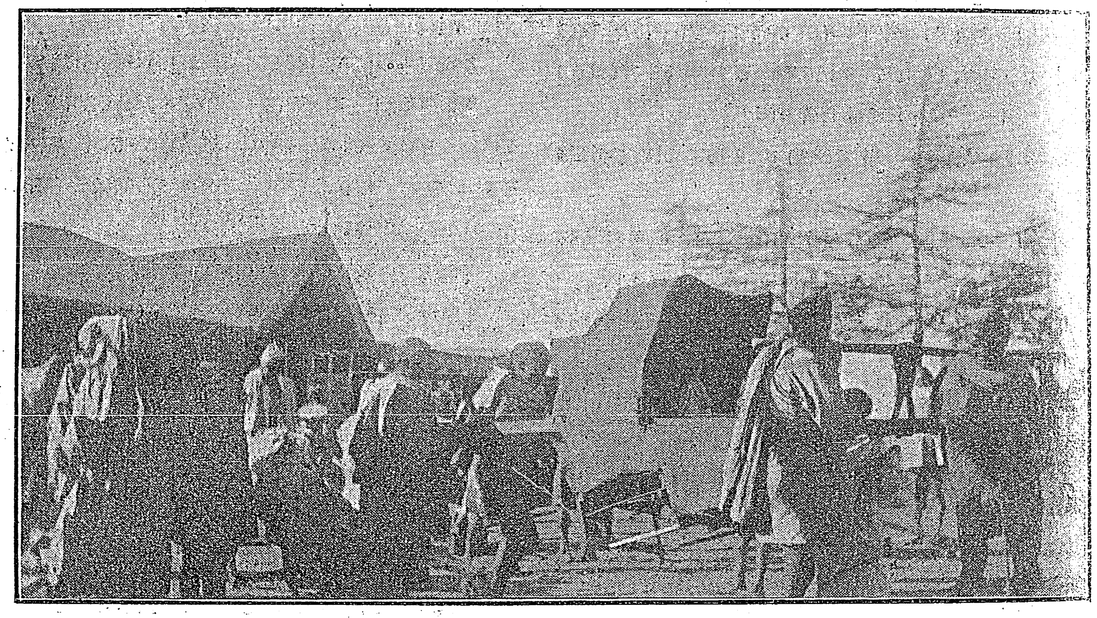

বল্লুম—হঠাৎ মসুরী যাওয়া হচ্ছে যে? আর আমার ত দেখা আছে। বন্ধু হেসে বল্লে—"সে ত সেই লর্ড ক্লাইভের আমলে গিছলে। ঢের জিনিষ বদলে গেছে বন্ধু—দেখবে! চল—মাস দেড়েক আমি সেখানে থাকব, আফিস থেকে আমায় পাঠাচ্ছে Charleville hotel অডিট্ করবার জন্যে! তোমার কোন কষ্ট হবে না বন্ধু। নাও, তৈরী

হয়ে পড়! Bombay mailএ যাব। আমি টিকিট কিনে বিছানা-পত্তর নিয়ে তোমার এখানে বেলা তিনটার সময় আসব। তা হলে এখন আমি চল্লুম, আফিসে সাহেবের কাছে আবার instructions নিতে হবে, দশটা বেজে গেছে।

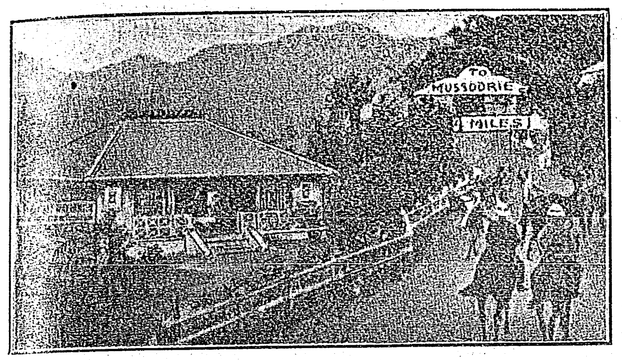

হাফ-ওয়ে হাউস, ঝরিপানী

আমি বল্লুম,—তুই ত এক নিশ্বাসে অনেক বলে গেলি। তার পর আমার কিছুই গোছানো নেই, কাজকর্ম্মের একটা ব্যবস্থা না করে—

বাধা দিয়ে বন্ধুবর বল্লে—গোছানোর ঢের সময় আছে। আর কাজ-কর্ম্ম তোমায় কোন দিন ত আট্‌কে রাখতে পারে নি বন্ধু,—এখন আর নতুন করে অভ্যাসটা বদলে ফেলে, জীবনটাকে আর প্রহসন ঘেঁসিয়ে নিয়ে নাই বা গেলে! আচ্ছা আমি চল্লুম, ঠিক তিনটার সময় আসছি!

বন্ধু ত বিদায় নিলেন! যাক্, ভাবলুম—একা একা কোথায় যেতুম, তার চেয়ে এর সঙ্গে যাওয়াই ভাল! স্নানাহারের পর suit-case গুছিয়ে, বিছানা বেঁধে বসে আছি। বেলা ৫টা বাজতে চলল, কিন্তু বন্ধুবরের আর দেখা নাই! ভারী রাগ হতে লাগল! ভাবলুম, April fool বানিয়ে গেল না ত! কিন্তু না, আজ ত ১লা এপ্রিল নয়! এই রকম যখন সাত পাঁচ ভাবছি, তখন গাড়ীর মাথায় জিনিষপত্তর চাপিয়ে তিনি এসে হাজির। রেগে বল্লুম—এই বুঝি তোমার তিনটে?—

খুব ব্যস্ত হয়ে নীরদ বল্লে—কি করব ভাই, বাড়ীর সব জিনিষ কিন্‌তে হল, ছেলেটার বার্লী, ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে মেয়েটার প্রেসক্রপসান বদলে আনলুম, শালাটার অসুখ করেছে বড্ড, আজ দশ দিন বলছিল দেখে আসতে, আফিস থেকে বেরিয়ে শালাকে দেখতে গেলুম,—কত ঝঞ্ঝাট বল দেখি। তোমার ত আর এসব বালাই নেই, বুঝবে কি বল! তারপর বিদায়ের পালাটাও আছে। দেড় মাস থাকব না, অনেক দিনের বিরহ—কাজেই অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক চক্ষের জল এড়িয়ে আসা···যাক্ সে সব তুমি বুঝবে না। এখন এস! ওরে মাধা, মোট-পত্তর সব গাড়ীতে তোল্!

একটা বেতের ঝুড়ী দেখে জিজ্ঞাসা করলুম—ওর মধ্যে কি আছে?

নীরদ হেসে বল্লে,—সেখানে কষ্ট হবে বলে, গিন্নী ৪টা বড় এঁচোড়, পটল, আম, মুগের ডাল, মশলা, সজনে ডাঁটা এই সব গুছিয়ে দিয়েছে। এসব ত সেখানে পাওয়া যায় না!

আমি বল্লুম,—ওই অত-বড় লগেজ নিয়ে, এই তিনদিনের রাস্তা—

বাধা দিয়ে বন্ধু বল্লে,—কি করব ভাই, শুনলে না—মাথার দিব্বি দিয়ে এটা-ওটা করে, সব জিনিষই দিয়েছে!

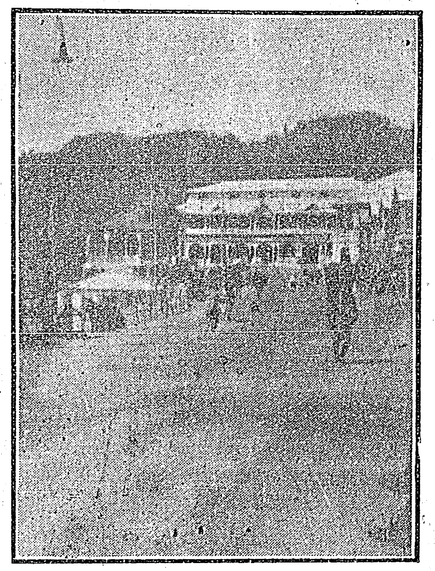

লাইব্রেরী বাজার,—মসুরী

—বেশ হয়েছে, এখন চল!

গাড়ীতে যখন উঠে বসেছি, বন্ধু আমার গা টিপে বল্লে,—তোর উড়ে ড্রবেটার মুখে হাসি ধরছে না দেখেছিস;

এই দেড়মাস বেটারা রাম-রাজত্তি করবে! যাক্, "সজল কাজল আঁখি" দেখার ভাগ্য যখন করে আসনি, তখন এই দন্ত-বিকশিত মুখ দেখেই চল!

বোম্বাই মেল তখন প্ল্যাটফরমে হাজির। গাড়ীতে বেশী ভীড় পাওয়া গেল না! দুখানি বেঞ্চে আমরা দুজনে বিছানা পাতলুম! সে গাড়ীতে আর দুজন সহযাত্রী ছিল। একজন এখানে ল পড়েন—ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত ভদ্রলোক—সাজাহানপুর চলেছেন, দাদার কাছে হাওয়া বদলাতে; আর একটি ১৮।১৯ বছরের ছেলে গয়ায় যাবেন তাঁর পিসীমাকে আন্‌তে! অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা দুজনেই বেশ আমাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেল্লেন!

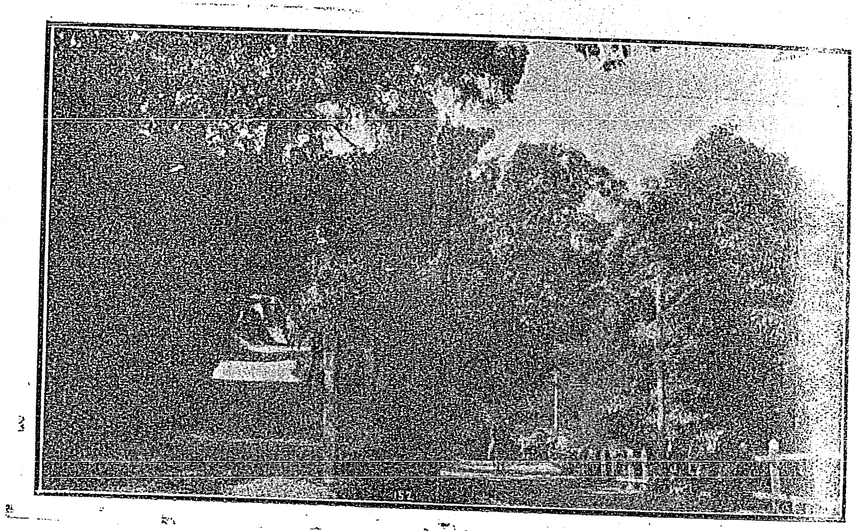

চার্লিভিল রোড

গাড়ী বর্দ্ধমানে আসতে আমাদের টিফিন বাক্স খুলে তাঁদেরও যোগ দিতে বল্লুম। চারজনে বেশ জলযোগ সম্পন্ন করে বসা গেল! তখন আমার বন্ধু সেই ছেলেটিকে বল্লে, "খোকা, তোমার যখন ভাই রবিবাবুর মতন চুলের বাহার, তখন তুমি নিশ্চয় রবিবাবুর গান জান! একখানা গান ধরে ফেল, আমরা বেশ চোখ বুজে শুনি!" সে বারকতক "জানি না" "ভাল হবে না" "সর্দ্দিতে গলাটা বুজে আছে" ইত্যাদি বলে গাইতে সুরু করলে! তার বেশ মিহি সুর ছিল। গান মন্দ লাগল না! তার পর সে আমার কাছ থেকে রবিবাবুর "চয়নিকা" খানা চেয়ে নিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল! বেশ লাগল! সে না কি প্রায়ই 'ইনষ্টিটিউটে' আবৃত্তি করে থাকে! সে এবার আই-এ দিয়েছে। সে আমায় বল্লে, আপনি দাদা ভাল গাইতে পারেন, নীরদবাবু বলছেন,—আপনি একখানা গান শোনান্।

আমি বল্লুম—আচ্ছা, সে তখন হবে, তুমি এখন পড়ে যাও ভাই, থেমো না, ভারী ভাল লাগছে! সুধীন্দ্র "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" পড়তে লাগল!

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব প্রাণ বহে' যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর—
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর!!

* * *

মনটাকে বেশ একটু দোলা দিয়ে দিলে। মনে মনে বল্লুম, যদি আবার কখনও এখানে পাঠাও ভগবান তাহলে অমনি তটিনীর রূপে, অমনি স্বচ্ছ, সহজ সরল—

—কি হে, ভাব লাগল না কি? এস, এইবার তাসে বসা যাক্! রাত্রে ঘুম ত আর কারুরই হবে না! খোকা গয়ায় নেমে গেলে ঘুমুনো যাবে!

সকলেরই সেই মত! কাজেই তাস খেলা চলতে লাগল! রাত তিনটার সময় গাড়ী গয়ায় এলে, খোকা আমাদের নমস্কার করে নেমে গেল! যতক্ষণ ট্রেণ ছিল, সে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেণ ছাড়্‌তে বল্লে, মসুরী থেকে চিঠি দেবেন, কলকাতায় ফিরলে দেখা করব দাদা! সুধীন্দ্র

নেমে যেতে গাড়ীটা আমাদের তখন ফাঁকা-ফাঁকা লাগল! ছেলেটি আমাদের এতক্ষণ বেশ জমিয়ে রেখেছিল। সকলে শুয়ে পড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম!

বেলা সাতটার সময় গাড়ী মোগলসরাইতে আসতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কুলী আমাদের মালপত্তর সব নামালে! আমরা ওয়েটিং-রুমে স্নান করে বেলা দশটার সময় রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়ে আহার সেরে—পেশোয়ার মেলে চাপলুম! এ গাড়ীতেও ভাগ্যক্রমে ভীড় পেলুম না! যে যার বিছানা বিছিয়ে কাত হলুম! রাত্রে ঘুম হয়নি, কাজেই এক ঘুমে বেলা তিনটে বেজে গেল! উঠে চোখ মুখ ধুয়ে

চার্লিভিল হোটেল

বসলুম;—কিন্তু কেবলই মাঠের পর মাঠ, আর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর···ভারী বিরক্তি লাগল! একটু ক্ষুধারও উদ্রেক হয়েছে···টাইম টেবেল হাতড়ে দেখলুম, সাড়ে চারটার সময় লক্ষ্ণৌতে গাড়ী পৌছবে! কি আর করা যায়, মুখ বুজে চুপ করে এই দেড় ঘণ্টা কাটানো ছাড়া উপায় নাই!

লক্ষ্ণৌ খুব বড় ষ্টেশন! গাড়ী থামতেই নেমে পড়া গেল! বন্ধু তরমুজ, ফুটি ও কিছু মিষ্টি কিনতে লাগলেন—আমি চায়ের যোগাড়ে গেলুম। খানসামাকে নিয়ে এসে দেখি, আমাদের কামরায় একজন মুসলমান ভদ্রলোক ও তাঁর সঙ্গে একটি ১৬।১৭ বছরের মহিলা রাজ্যের জিনিষ নিয়ে উঠেছেন! আমি গাড়ীর কাছে আসতে, তিনি উর্দ্দুতে কি বল্লেন বুঝতে পারলুম না। তবে "তকলিফ্" কথাটা শুনে বুঝলুম, বিনয় জানাচ্ছেন! "কুছ নেহি" বলে তাঁর সঙ্গের জিনিষগুলো এধার-ওধার করে একটু পা ফেলবার পথ করে নিলুম ও আমার বিছানা সরিয়ে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাঁদের বসতে বল্লুম।

নীরদ এসে বল্লে—বাবা, এ যে go-down হয়েছে দেখছি!···এঁরা কদ্দুর যাবেন?

আমি বল্লুম—তা ত জানি না! ভদ্রলোকের কথা আমি একবিন্দুও বুঝতে পারি নি···হিন্দি ও ইংরিজী দুইটাই চালিয়েছি, কিন্তু তাতেও সুবিধে হয় নি, শুধু একটু হাসি ও ঘাড় নাড়া ছাড়া আর কোন জবাব পাই নি!

এমন সময় দুজন স্থূলকায় বাঙ্গালী ভদ্রলোক দুটি ব্যাগ হাতে করে গাড়ীতে ঢুকে নীরদের ও কালীবাবুর বেঞ্চে বিনা বাক্যব্যয়ে দুটি জায়গা করে নিয়ে বসলেন! এরা দুজনে একবার পরস্পরের দিকে চাইলে, আমি জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপলুম! গাড়ী ছেড়ে দিলে! নীরদ তরমুজ কেটে ও কিছু মিষ্টি দিয়ে একটা বাটি আমার দিকে এগিয়ে দিলে ও বাকি কালীবাবু আর সে খেতে লাগল! কালীবাবু ভদ্রলোকদের

জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তাঁরাও সাজাহানপুর যাবেন। কালীবাবুর দাদা ডাক্তারবাবুকে এঁরা খুব চেনেন; সুতরাং পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ হল! খাওয়া শেষ করে কালীবাবু আমায় বল্লেন, আসুন না—এইবার ত কয়জন পাওয়া গেছে, একটু তাস খেলা যাক্! কিন্তু তাঁরা ব্রিজ খেলা জানেন না, আর নীরদও সবে মাসখানেক হল বাড়ীর মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের কাছ থেকে গ্রাবু খেলাটা শিখেছে—তার ঝোঁকটাও খুবই বেশী,—কাজেই বল্লুম—আমাকে বাদ দিন কালীবাবু, নীরদকে নিয়ে আপনারা চারজনে গ্রাবু খেলুন। আমার গ্রাবু খেলা আসে না। ওঁরা কয়জনে তাস খেলতে মেতে গেলেন।

আমি জলধর দাদার গ্রন্থাবলী নিয়ে বসলুম! বোধ হয় মিনিট পাঁচ সাত পরেই "এই ছক্কা" বলে নবাগত ভদ্রলোক দুটি এমন বেয়াড়া চেঁচিয়ে উঠলেন, যে, চমকে যেতে হয়! মুখ ফিরিয়ে দেখি—তাঁরা একখানি 'ছক্কা' ধরেছেন! আর খেলা ভারী জমে উঠেছে। আমার সামনে বসে মুসলমান মেয়েটিও এদের খেলার মজা দেখে মুখ টিপে হাস্‌ছিলেন! তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকটি ট্রাঙ্ক খুলে কি বার করছেন!

এই মেয়েটিকে "ঘোমটা-বিহীন" দেখে আমার গোড়া থেকে একটা বিস্ময় হয়েছিল! কারণ "পরদা" এঁদের মধ্যে ত খুবই বেশী! কিন্তু এখন তাঁর পাশে খানদুই হিন্দি ও উর্দ্দু বই, ও খাতা পেন্সিল নিয়ে তাঁকে কি লিখতে দেখে বুঝলুম, কেমাল পাশার প্রভাব এই ইউ-পিতেও এসে পড়েছে! মেয়েটির পোষাকও আমাদের এখানকার মুসলমান মহিলার মতন নয়! এঁর পোষাকে একটু বিশেষত্ব আছে! পায়ে ফিতা-বাঁধা জুতা, পরণে বড় ঢিলা পাজামা; গায়ের জামা অনেকটা আমাদের কোটের মতন, আর মাথায় মোটা সাদা ধবধবে চাদরের ওড়না! পিঠে বিনুনী ঝুলছে! দাঁতগুলি বেশ ঝকঝকে, দেখলেই বোঝা যায়—"পানের" ছোপ জীবনে পড়েনি! মেয়েটি বেশ সুশ্রী!

লোকটি ফিরে বসতেই মেয়েটি কি বল্লে। সে ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে টাইম-টেবেলটা চেয়ে নিয়ে মেয়েটিকে দিতে, সে পাতা উল্টে দেখতে লাগল! বুঝলুম—মেয়েটি একটু-আধটু ইংরিজী লেখাপড়াও জানে! আমি ভদ্রলোকটিকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনারা কোথায় যাবেন?

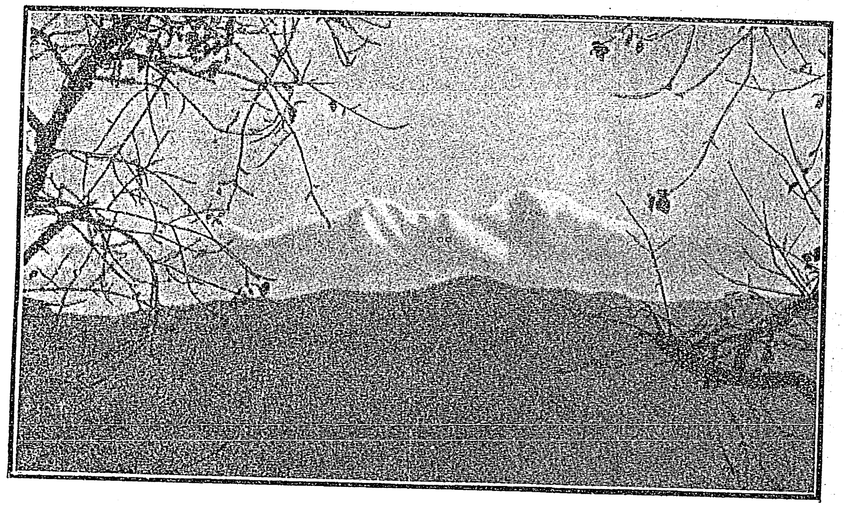

চিরতুষার

প্রত্যুত্তরে মেয়েটি বেশ পরিষ্কার হিন্দিতে বল্লে—"আমরা লাহোর যাব।" মেয়েটিকে এ-রকম আগ-বাড়িয়ে কথা কইতে দেখে আমি একটু বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়েছিলুম, এবং সেটা তাঁর নজর এড়ায় নি! তাই মেয়েটি এবার হেসে বল্লে—আমার দাদা হিন্দি বা ইংরিজী জানেন না! আমাদের দেশে উর্দ্দুটাই বেশী চলে!

বল্লুম—কিন্তু আপনি ত বেশ হিন্দি বলতে পারেন!

তিনি হেসে বল্লেন—আমি ইস্কুলে শিখেছি। আমাদের ইস্কুলে হিন্দি পড়ানো হয়।

মেয়েটির দাদা তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি কি বল্লেন—কিছুই বুঝতে পারলুম না।

এইবার মেয়েটি কলিকাতার দাঙ্গার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। যা জানতুম—তাঁকে আগাগোড়া বল্লুম। শুনে তিনি দুঃখিত হলেন! আরও বল্লেন, তাঁরাও 'অখান্ত' খান না। শুনে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হল। তাঁর হিন্দি বইখানা চেয়ে নিয়ে দেখি, সেখানা সাবিত্রী উপাখ্যান, খানকতক ছবিও আছে। তারপর তিনি লাহোরের গল্প করতে লাগলেন। "শাহ্‌দারা" (নূরজাঁহা বেগমের সমাধি)

বেশ দেখবার জিনিষ। আরও অনেক পুরনো জিনিষ দেখবার আছে! কাছেই অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির দেখবার আছে। আমায় বল্লেন—চলুন না, লাহোর হয়ে মসুরী যাবেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বল্লুম, আমার বন্ধুটি আফিসের কাজে যাচ্ছে, সুতরাং দেরী করা চলবে না। আর ওকে ছেড়ে একা যাওয়াও হয় না। যাই হোক্, বল্লুম, লাহোর এইবার একবার দেখে যাব।

মেয়েটি তার ভাইটিকে কি বলাতে, তিনি আমায় উর্দ্দুতে কি বল্লেন; কিন্তু আমি বুঝতে না পেরে মেয়েটির পানে চাইতে, তিনি সলজ্জ ভাবে হেসে বললেন, দাদা বলছেন, সেখানে গেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন, আমাদের অতিথি হবেন। অবশ্য, আমাদের প্রতিবাসী হিন্দু ব্রাহ্মণের দ্বারাই আপনাদের খাবার যোগাড় করাব। কবে আসছেন বলুন?

কুলুরীর পথে

আমার বিশুদ্ধ (?) হিন্দি বলায় তিনি ত গোড়া থেকেই হাসছেন; যাই হোক্ এবার কোন রকমে মাতৃ-ভাষাটাকে হিন্দিতে মিশিয়ে খিচুড়ী করে আর এক প্রস্থ তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বল্লুম, কবে যাব তা বলতে পারি না; তবে সেখানে গেলে আপনাদের সঙ্গে না দেখা করে আসব না জানবেন। সাজাহানপুরে কালীবাবু ও দুটি ভদ্রলোক নেমে গেলেন। গাড়ী বেরিলী ষ্টেশনে আসতে আমরাও নেমে পড়লুম! ভাই ভগ্নী দুজনেই "আধা বরষ" জানিয়ে বিদায় দিলেন। তাঁদের ভদ্রতা ও বিনয় দেখে মনে হল—হায়, যদি বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় এমনি উন্নত ও সংযত হত, তাহলে আর এই রক্তা-রক্তি হত না। যাক্, রিফ্রেস্‌মেণ্ট-রুমে কিছু আহারাদি করে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় দেরাদুন এক্সপ্রেসে চাপলুম এবং সকালে সাড়ে ছটার সময় দেরাদুনে এলুম। ষ্টেশনের ধারে গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল (Great Indian Hotel) আছে; জিনিষপত্তর নিয়ে সেখানে উঠা গেল। হোটেলের ম্যানেজার একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। উপরের একটি ঘর খুলে দিলেন। বেশ সাজানো ঘর, ঘরের সঙ্গেই স্নানের ঘর আছে। বন্দোবস্ত বেশ ভালই। তবে রান্নাতে লঙ্কার আধিক্য একটু বেশী,—সেইজন্যে একটু অসুবিধা বোধ করা গেল। ৪।৫ জন Transport Agencyর লোক এসে হাজির। নীরদ Chapman's Agencyর লোকের সঙ্গেই ঠিক করলে যে, আমরা বেলা ৪টার সময় এখান থেকে বেরুব—সেই সময় মোটর চাই। আর আমাদের বিছানা, সুটকেস প্রভৃতি তার জিম্মা করে দিয়ে তাকে মসুরীতে Charleville Hotelএর ঠিকানা

দিয়ে দিলে। ঠিক হ'ল আমরা রাজপুর থেকে ঘোড়াতেই পাহাড়ে উঠবো। লোকটি তার ফরমে রসীদ দিয়ে সেলাম করে চলে গেল। স্নানাহার করে এক ঘুম দিয়ে বেলা ৪টার সময় যখন উঠেছি,—হোটেলের বেয়ারা এসে বল্লে মোটর এসেছে। আমরা জামা কাপড় ছেড়ে হোটেলের হিসাব

কুলুরীর বাজার

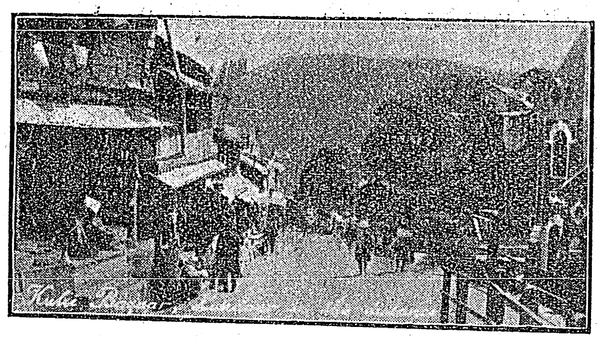

মিটিয়ে রওনা হলুম। দেরাদুন থেকে রাজপুর যাবার জন্য বেশ ভাল পাকা বড় রাস্তা আছে। কোন্ এক কোম্পানী ইলেকট্রিক ট্রাম মসুরী পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে বলে লাইন পেতে পোষ্ট পুঁতে রাজপুর পর্য্যন্ত লাইন নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তার পর আর পাহাড় কেটে লাইন নিয়ে যাবার সুবিধে হয়নি বলে যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। শুনলুম সে কোম্পানীও ফেল হয়ে গেছে। দেরাদুন থেকে রাজপুর ৭ মাইল রাস্তা! ট্যাক্সি, টঙ্গা যথেষ্ট পাওয়া যায়। আজকাল আবার "বাস্" সার্ভিসও হয়েছে।

আমরা সাড়ে চারটা আন্দাজ সময় রাজপুরে চ্যাপম্যানের এজেন্সি আফিসে এলুম। দেখলুম আমাদের জন্য দুটি ঘোড়া তৈয়ারী আছে! আমাদের জিনিষপত্তর পূর্ব্বেই এঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে যে ছোট ব্যাগ আছে, তাহা যে ছোকরা দুজন ঘোড়ার সঙ্গে যাবে তাদেরই একজন নেবে! ম্যানেজার সাহেব আমাদের বিল দিলেন, তাহাতে মোটরের ভাড়া দেরাদুন থেকে রাজপুর ৫৲ টাকা, প্রত্যেক ঘোড়া ৩৲; ৩ জন কুলী প্রত্যেকে দেড় মণ মাল নেয়; ১৲ টাকা হিসাবে ৩৲ টাকা। এখানে "ডাণ্ডি" পাওয়া যায়—তাহা ৬ জন কুলী বদলাবদলী করিয়া একজন লোককে বহিয়া লইয়া যায়; তাহার ভাড়া ৬৲ টাকা। সাধারণতঃ মেয়েরাই "ডাণ্ডি"তে যায়। আমরা ত ম্যানেজারের বিল মিটিয়ে অশ্বারোহণে রওনা হলুম, পেছনে দুজন সহিস আসতে লাগল! প্রথমে রাজপুর বাজারের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। রাস্তার দুধারে যেমন পচা ড্রেনের গন্ধ, তেমনি ধুলো! খানিকটা চড়াই এসে "টোল ফটকে" আসা যায়! এখানে প্রতি লোক-পিছু দেড় টাকা করে দিতে হয়, এবং নিজের নাম, মসুরীতে কোথায় থাকা হবে ইত্যাদি লেখাতে হয়! তাঁরা একখানা ছাড়-পত্র দেন! যাক্—ছাড়পত্র নিয়ে ত আমরা যাত্রা করলুম! চার মাইল পথ এসে (পাঁচ হাজার ফিট উঁচে) ঝরিপানীতে "Half-way house"এ নেমে ঘোড়া দুইটাকে রাস্তার ধারে রেলিংএ বেঁধে, হাতার মধ্যে ঢুকতেই, এক বৃদ্ধ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন! এখানে চা, ডিম, রুটি, সোডা প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমরা চা, টোষ্ট ও ডিম চাই বলাতে মেমসাহেব তাঁর খানসামাকে অর্ডার করলেন। সাহেব আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন! ভদ্রলোকের বয়স প্রায় ৮০র কাছাকাছি; কিন্তু এখনও তিনি বেশ বলিষ্ঠ! তিনি পূর্ব্বে রেলে কাজ করতেন। এখন অবসর নিয়ে স্বামি-স্ত্রীতে এই মনোরম যায়গায় বাস করছেন। শীতকালে বরফ পড়লে দেরাদুনে নেমে আসেন! এই "Half-way House" করাতে জনসাধারণের যেমন উপকার হয়েছে, তাঁদেরও এই থেকে বেশ আয় হয়েছে। ভদ্রলোক যেমন আমুদে তেমনি রসিক! এখানে খানাপিনার দরদামও তেমন বেশী নয়। যাক্, ৬টার সময় আমরা পুনরায় রওনা

স্কেণ্ডাল পয়েন্ট, ক্যামেল্স ব্যাক রোড (কুর্ম্মপৃষ্ঠ পথ)

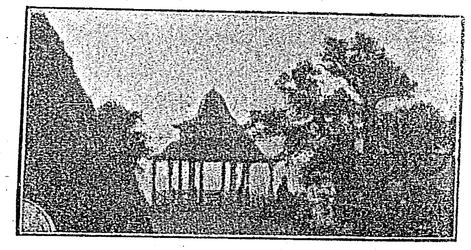

হলুম। আকাশ বেশ মেঘাচ্ছন্ন করে আসাতে সাহেব আমাদের বল্লেন "full speed"এ যান, না হলে পথে শিলাবৃষ্টি পাবেন। আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম! কিছু-দূর এসেই আর একটা ফটক পড়ে। এখানে টোল আফিসের

রসীদ বার করে দেখাতে হয়। তাঁরা "পাঞ্চ" করে ফটক খুলে দেন! খানিকটা এসেই "বারলোগঞ্জে" আসা গেল। এখান থেকে দুইটা রাস্তা দুদিকে গেছে। যাঁরা "লেণ্ডোর"

পিকচার প্যালেস

বা পুরানো মসুরীতে যাবেন, তাঁরা ডানদিকের রাস্তা ধরে যান; আর যাঁরা, "Charleville" বা সহরের পশ্চিম প্রান্তে যাবেন, তাঁরা বাঁ দিকের রাস্তা ধরেন! আমরা বাঁ দিকের রাস্তা ধরে চল্লুম! সেখান থেকে দেরাদুনের বাড়ীগুলি দেখাচ্ছিল যেন ছোট ছেলেদের খেলাঘরের মতন!

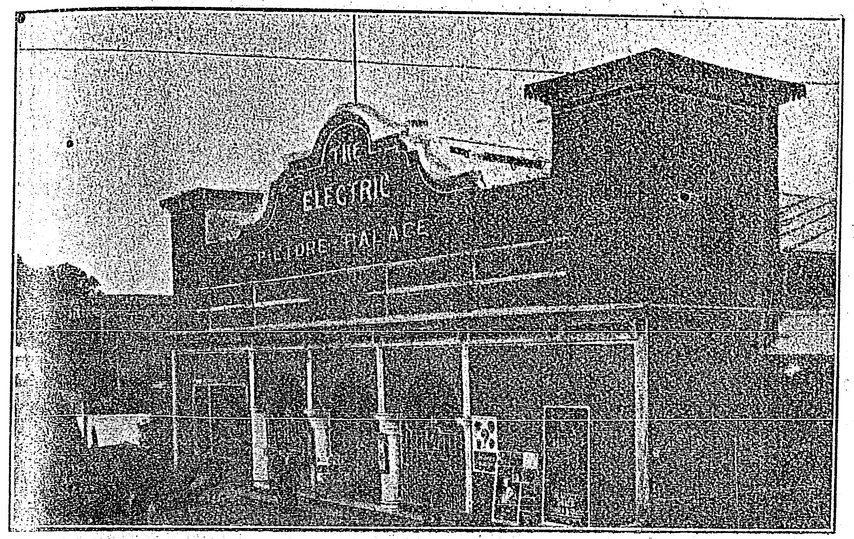

আমাদের আর ভাল করে পথের দৃশ্য উপভোগ করবার অবসর নাই, কারণ, আকাশে তখন কড় কড় করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি এলে পথের ধারে একটু দাঁড়াবার পর্য্যন্ত যায়গা নাই। কাজেই মরি-বাঁচি করে সেই পাহাড়ের পথে পূরা দমে ঘোড়া ছোটানো গেল! আমাদের সহিস দুটো যে কোথায় পেছিয়ে পড়ে রইল তা জানি না। রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দাজ সময়ে মসুরীর উপরে লাইব্রেরী বাজারে (Library Bazar) এসে পড়া গেল। রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। পথের ধারে বড় বড় দোকান খোলা আছে। রাস্তাগুলি বেশ পরিষ্কার। আমার বন্ধু দোকান থেকে এক টিন বিলিতী দুধ কিনে নিলেন—

ল্যাণ্ডোরের সাধারণ দৃশ্য

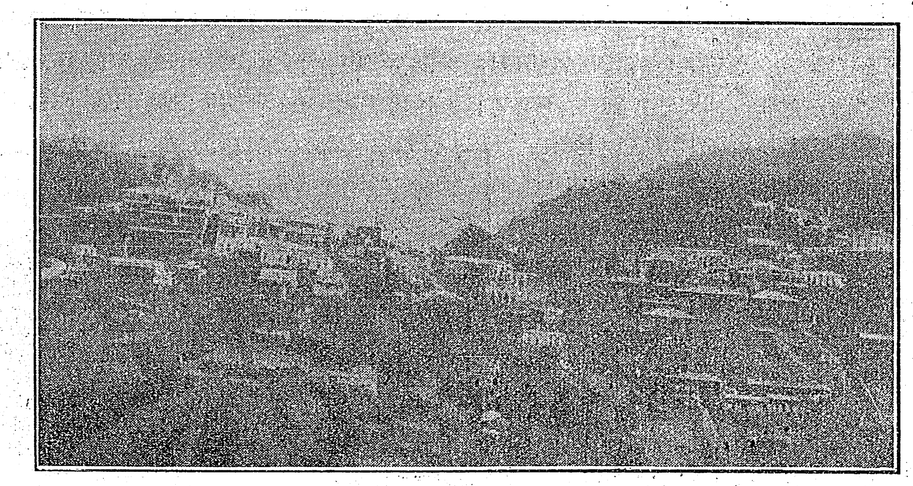

কি জানি, এত রাত্রে যদি হোটেলে চা না পাওয়া যায়!

এখানকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০০০ ফিট্!

লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে মালের (Mall) রাস্তা! আমাদের গন্তব্য স্থান তখনও তিন মাইল। আমরা অপেক্ষা না করে আবার ঘোড়া ছোটালুম। Charleville রোডে পড়ে মাইল

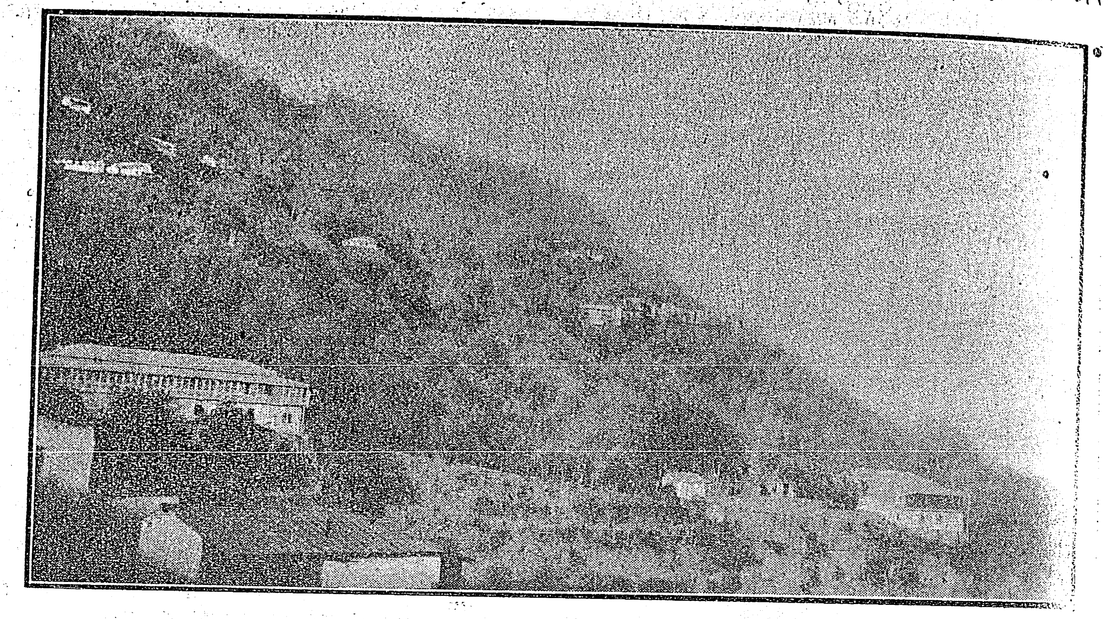

ল্যাণ্ডোর হাসপাতালের পথে

দু-এক যখন এসেছি, তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হল। তেমনি ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস,—পথে জনমানব নেই, কেবল দুধারে বড় বড় গাছের সারি। ভাগ্যে সেখানকার ঘোড়াগুলো খুব শান্ত, আর এ সব পথে ছুটতে অভ্যস্ত; নচেৎ আমার মতন সওয়ারের ভাগ্যে যে কি দুর্গতি হোতো তা বলা যায় না! যখন আমরা হোটেলের কাছাকাছি এসেছি, তখন মুষলধারে শিলাবৃষ্টি নেমে এল! ঘোড়াদুটাকে হোটেলের ফটকের পাশে রেলিংএ বেঁধে চৌকীদারের জিম্মা করে দিয়ে ছুটতে ছুটতে হোটেলে আসা গেল! হোটেলের এক প্রান্তে একাউন্‌টেণ্ট বাবু ও ষ্টোর্‌স বাবুর থাকবার বাড়ী। তাহারই লাগোয়া একটা বাড়ী বন্ধুবর অডিটবাবু অর্থাৎ আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল! আমরা গিয়ে দেখলুম, আমাদের জিনিষ সব এসে গেছে। একাউন্‌টেণ্ট বাবু আমাদের জন্য একজন পাহাড়ী চাকর ঠিক করে রেখেছেন! আমরা যেতেই ভদ্রলোক আমাদের এক পেয়ালা করে গরম চা খাইয়ে আমাদের যথেষ্ট আরাম দিলেন! নীরদের সঙ্গে পূর্ব্ব থেকেই এঁর পরিচয় আছে; কারণ, নীরদ প্রতি বছরেই এখানে অডিট করতে আসে। যে চাকরটি

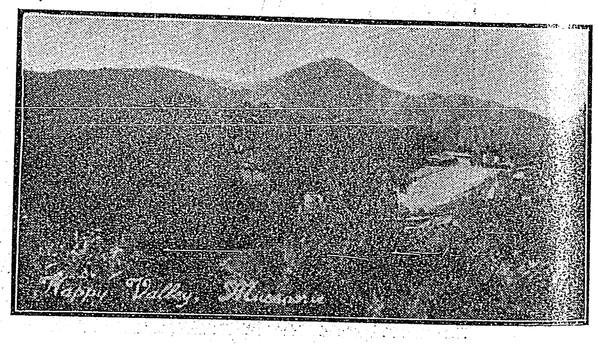

হ্যাপি ভেলী ক্লাব, মসুরী

প্রতিবার নীরদের কাজ করে, সে এবার এখনও বাড়ী থেকে আসেনি, তাই এই "পাহাড়ী"কে রাখা হয়েছে! পূর্ব্বে "রিক্স" টান্‌ত! নীরদ তাকে খাবারের ঝুড়ি থেকে ঘী, ময়দা, আলু ও ডিম বার করে দিয়ে বল্লে, "পুরি আউর ডিম্‌কা ডালনা বানাও।" গিরধারী প্রত্যুত্তরে "জী হুজুর" বলে সেগুলো নিয়ে গেল। একাউন্‌টেণ্ট—রাত হয়েছে, আবার কাল দেখা হবে—বলে বিদায় নিলেন। ভদ্রলোকের

বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে। এখানে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আজ বছর চারেক আছেন! অল্পক্ষণ আলাপ হলেও, লোকটি যে তেমন মিশুক নয়, এটা বেশ বুঝতে পারলুম। নীরদকে বলতে, সেও

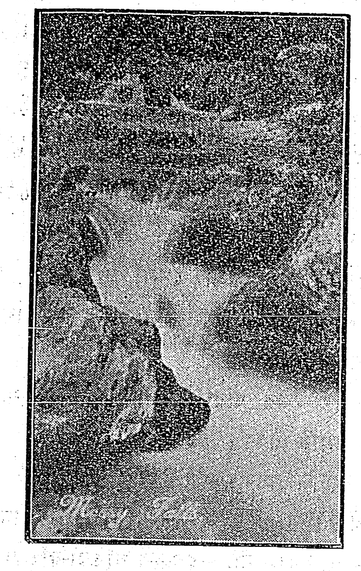

"মসি" জলপ্রপাত

সমর্থন করে বল্লে—থাক্ না, দেখ্‌বি—ওর অনেক রকম বুজরুকী আছে। আমি নতুন যেবার এসেছিলুম, দেখলুম, তিন ঘণ্টা ধরে ধ্যান করে, চেঁচিয়ে কত রকম শ্লোক আওড়ায়, নিরামিষ খায়। আমায় বল্লে—সাধন-পথে স্ত্রীলোক হচ্ছে প্রধান বাধা;—তাদের এড়িয়ে না চল্লে মুক্তি নাই! পরিবার থাকা সত্ত্বেও দাদা আমার মূর্ত্তিমান ভীষ্ম দেব। পরের বছর এসে দেখি—সব ওলট-পালট! দাদা আমার গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসে তোফা খিচুড়ী বানিয়ে ফেলেছে। ডিম, মাংস পাখী কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এ ধারে বউদির কোলে ৪ মাসের ছেলে। উপরন্তু, আর একটি নবাগতের সম্ভাবনা হয়েছে! বউদিটি দাদার আমার দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম গৃহিণীর গুটি দুই তিন মেয়ে আছে, সকলেই বিবাহিতা। এ পক্ষের তিনটি ছেলে ছিল,—কিন্তু দাদার যোগাভ্যাসের দরুণ গেল বছরে একটি বেড়ে গণ্ডা পুরো হয়েছে। আমি হেসে বল্লুম—বলিস কি রে?

হ্যাঁ, কাল তখন দেখতে পাবি! দেখ্, ওর Vanityতে কখনও আঘাত করিসনি,—ও যা আওড়ে যাবে, কেবল সায় দিবি, তাহলে অনেক রগড়ের কথা শুনবি! রাত্রি ১ টা আন্দাজ রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, পাহাড়ী-পুঙ্গব বেশ বড় বড় "ফুল্‌কা" (মোটা রুটি) বানিয়েছে, ডালনা তখন চড়েছে! আমি বল্লুম—লুচী বানানে নেহি জানতা?

জী হুজুর!

তব্ আগে বোলা নেই কাহে, হাম দেখায় দেতা!

জী হুজুর!

সব কথাতেই "জী হুজুর" ছাড়া আর কিছু বলে না! যাক্ কি আর করা যাবে; যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল—তাই দিয়ে ক্ষন্নিবৃত্তি করে, "চারপাই"এর ওপর লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া গেল! হোটেলে তখন জনমানবের সাড়া নেই! বৃষ্টি অবিরল ধারে তখনও পড়ছে!

বেলা আটটার সময় ঘুম ভাঙ্গলে দেখি, নীরদ নাই। পাহাড়ীটাকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। চা খেয়ে, গায়ে লেপ জড়িয়ে বসে আছি,—

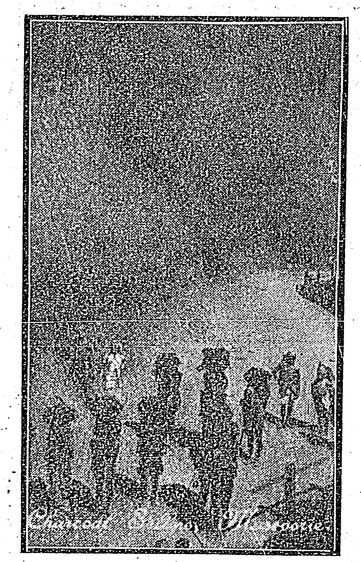

কমলা-বিক্রেতা

১২ মাইল পাহাড়ের রাস্তা অশ্বারোহণে আসার ফলে সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা। বৃষ্টি তেমনি পড়ছে—বিরাম নাই। এমন সময় একাউন্টেট কাছে এসে বল্লেন—কি মশাই, উঠেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আসুন!—তার পর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা গেল। কথায় কথায় ভদ্রলোক বল্লেন—আপনারা ত কলকাতার বাবু, আপনাদের আমার জানা আছে! আমি হেসে বল্লুম—চাক্ষুশ জানা আছে, না, কল্পনার সাহায্যে জানা আছে?

—কেন, শরৎ বাবুর "শ্রীকান্ত"তে "কলকাতার বাবুর" কথা পড়েন নি?

আমি হেসে বল্লুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পড়েছি। কিন্তু এই কলকাতাতেই আবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতন মহাপুরুষও আছেন! তাঁরাও কলকাতার বাবু! শুধু কেতাবেই

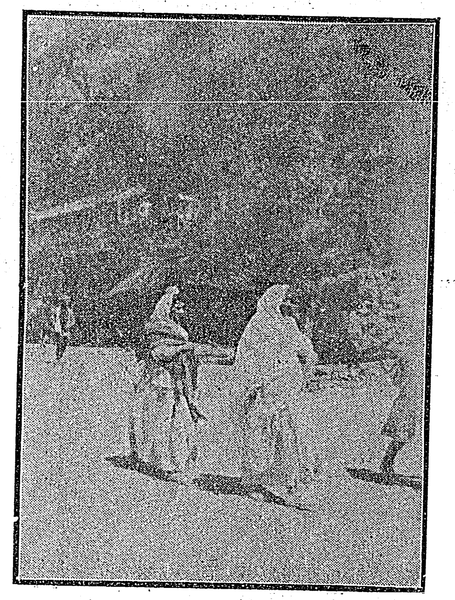

বারলোগঞ্জের পথে

"কলকাতার বাবু" দেখলেন—কখনও কলকাতায় গিয়ে দেখেননি বোধ হয়।

ভদ্রলোক হেসে বল্লেন—বইতে পড়ে আর দেখতে যাবার প্রবৃত্তি হয়নি!

—আমাদের দুর্ভাগ্য! মশায়ের দেশ কোথায়?

তিনি বল্লেন...জেলায়...গ্রামে। আমার গ্রামের মধ্যে আমিই প্রথম ইংরিজী লেখাপড়া শিখি।

আমি হেসে বল্লুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পূর্ব্বেই অনুমান করেছি। কিন্তু এই পাহাড়ে কে আপনার কদর বুঝবে মশাই, সহরে চলুন।

তিনি মাথা দুলিয়ে বল্লেন—আজ্ঞে না, ওইটি পারব না। না হলে কলকাতায় আমায় ৫০০৲ টাকার চাকরী দিয়ে সাধাসাধি করেছিল মশাই, আমি accept করিনি। এখানে আমার ১৫০ টাকাই ভাল। সেখানকার environments আমার ভালই লাগে না। এমন সময় নীরদ এসে পড়ল। একাউণ্টেণ্ট বাবু উঠে বল্লেন,—৯টা বাজল, আচ্ছা এখন যাই, আবার অফিসে যেতে হবে! তিনি চলে গেলেন, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখা গেল, পাহাড়ীটা ডাল ভাত রেঁধেছে। নীরদ, বল্লে—"মাংস আতা হ্যায়, হাম লেকে আয়া, আনেসে পাকাও।"

আমি বল্লুম—ওর দ্বারা হবে না—দেখছিস না বেটা জানোয়ার। আমি রাঁধব। তুই কখন কাজে যাবি?

বল্লে—দুটোর সময়!

যাক্, পাঁচ দিন ধরে ত শিলা বৃষ্টির বিরাম নাই,—কোথাও বেরুন যাচ্ছে না,—কেবল খাওয়া-দাওয়া করে চুপ-চাপ ঘরের মধ্যে লেপ জড়িয়ে বসে থাকা। নীরদ খেয়ে অফিস যায়, আসে বেলা ৪টার সময়,—আমার আর সময় কাটে না। বিছানায় কাত হয়ে জানালার সার্শির মধ্য দিয়ে অদূরে তুষার-ধবল পাহাড়ের দিকে চাই। আকাশে মেঘের খেলা দেখি, আর মনে হয় সত্যই হেথা—

"শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল-মধুর বেড়ে যায় জীবনের প্রতি
ধূলিধৌত দুঃখ শোক শুভ্র শান্ত বেশে, ধরে যেন
আনন্দ মূরতি।"

পাঁচদিন পরে আজ বৃষ্টি থেমেছে। রৌদ্রের শ্রী পাহাড়ের গায়ে গলিত-কাঞ্চন-ধারা ঢেলে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া গেল। নীরদ বল্লে, আসবার সময় একটা "রিকশ" নিস্, না হলে বেলা হয়ে যাবে!

আচ্ছা—বলে সটান সিধে রাস্তা ধরে লাইব্রেরী বাজারের রাস্তা ছাড়িয়ে আসা গেল। সেখান থেকে এসে বাঁয়ে "Camel's back" দিয়ে "কুলুরী বাজারে" এলুম। পথে তখন দলে দলে সাহেব মেমেরা ভীড় করে চলেছে। খানিকটা এসেই Picture Houseএর সামনে পড়া গেল। ঘড়ীতে দেখলুম বেলা ১১টা বাজে! আর দেরী করা উচিত

নয়। একে পাহাড়ীর হাতের মধুর রান্না,—তার উপর এই ঠাণ্ডায় সে সব জমে যা অবস্থা হবে, সে আর মুখে দিতে পারা যাবে না,—কাজেই একটা "রিকস" নিলুম। এখানে "রিকস" ৪ জন পাহাড়ীতে টানে—আর একজন সঙ্গে থাকে—সে সকলকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করে। এক ঘণ্টার ভাড়া একটাকা পাঁচ আনা! একঘণ্টার কম হলেও ওই ভাড়া দিতে হয়।

বিকেলে নীরদ আফিস থেকে এসে বল্লে, চল্, লেণ্ডোর বেড়িয়ে আসি। জীতেন নাগ ফোন্ করেছে,—তোকেও নিয়ে যাবার জন্যে অনেক করে অনুরোধ করেছে।

আমি বল্লুম—সে ভদ্রলোক কে?

—এখানে একটা আপিসে কাজ করে। আমি তাদের ফার্ম্মেও প্রতিবার অডিট করতে যাই, এবারও যাব। লোকটি খুব ভাল, আর আমায় খুব খাতির করে ও ভালবাসে। আর লাণ্ডোরেই যা ৫।৬ জন বাঙ্গালী দেখতে পাই, আর কোথাও নয়! বাঙ্গালীদের মধ্যে নাগ বাবুই হচ্ছে সকলের চেনা! সে ভদ্রলোক আবার অনেকের House Agent. এবং অনেকেরই বেগার খাটেন! কেউ মেয়েছেলে নিয়ে এসে পড়েছেন—বাড়ী পাচ্ছেন না, চাকর পাচ্ছেন না,—নাগবাবু যোগাড় করে দেন। কারুর অসুখ হয়ে পড়ল, ভদ্রলোক ডাক্তার ডেকে ওষুধ-পত্তোর ব্যবস্থা করে দেন। লোকটার ভারী সাদা প্রাণ!

ল্যাণ্ডোর Charleviile থেকে ৫ মাইল।

ল্যাণ্ডোরে নাগবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হ'লে ভদ্রলোক খুব অভ্যর্থনা করলেন। আর অল্প সময়ের মধ্যে আমার সঙ্গে এমন আলাপ করে ফেল্লেন, যেন মনে হল, তাঁর সঙ্গে আমার কতদিনের পরিচয়! তাঁর ওখান থেকে জলযোগ করে তাঁদের আড্ডায় যাওয়া গেল। সেটি হাসপাতালের কাছেই! এক ভদ্রলোকের বাসায় এঁদের আড্ডা বসে। সেখানে আরও ৬জন বাঙ্গালী দেখলুম—সকলেই চাকুরীজীবী। কেহ সার্ভে আফিসে, কেহ ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে কাজ করেন। আমরা যেতেই ভদ্রলোকরা ভারী খুসী হলেন। বল্লেন—বাঙ্গালীর মুখ দেখে বাঁচলুম মশাই! এখানে আমরাই যা ৬।৭ জন বাঙ্গালী আছি। তাও সকলের সঙ্গে সব সময় দেখা হয় না। কেউ বা কাজের জন্য দেরাদুন ব্রাঞ্চে চলে যান, কেউ বা লক্ষ্ণৌতে যান! তার পর গান-বাজনা আরম্ভ হল! এক ভদ্রলোকের একটি হারমোনিয়ম ছিল, সেটি আনানো হল, এবং প্রায় সকলেই "কোরাসে" গাইতে লাগলেন। ডি, এল, রায়, মহাশয়ের গান থেকে আরম্ভ করে; "আলিবাবার" "বাজে কাজে মিনষেকে আর যেতে দোব না" পর্য্যন্ত হল! তাঁদের সকলের "ঠাকুর্দ্দা"—তাঁর বয়স প্রায় ৫০ হবে,—সে ভদ্রলোক এমন রসিক ও আমুদে যে, তিনি অনায়াসে রেপারে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে মাথায় ঘোম্‌টা দিয়ে স্ত্রীলোক সেজে "নাচতে" নেমে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি, "নাগবাবুও" নীরদের শালখানা চেয়ে নিয়ে "ঠাকুর্দ্দা"র অনুকরণ করে দুজনে হাত-ধরাধরি করে নাচতে লাগলেন! দেখে মনে হল, এই পাহাড়ে—নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করে এঁদের আনন্দ-উৎস যা এতদিন চাপা পড়েছিল,

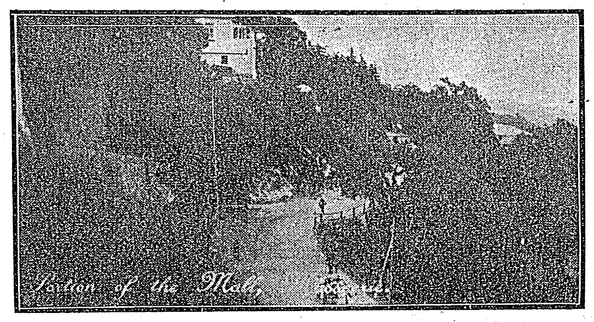

Portion of the Mall, Mussoorie

মল,—মসুরী

আজ পরস্পরের সম্মিলিত অবস্থায় বোধ হয় তা বাইরে এল! এই নির্দ্দোষ, প্রাণখোলা আনন্দের মাঝে ২।৩ ঘণ্টা কাটিয়ে যখন ফিরে এলুম, মনে হল, আমার মনের গোপন কোণে যেখানে যা কিছু দুঃখ জমা ছিল, যেন এই আনন্দ-ধারায় ধুয়ে মুছে গেছে। অচেনা লোকের সঙ্গে এঁদের এই যে কুণ্ঠাহীন আলাপ, প্রাণখোলা ব্যবহার, একটুও আড়ষ্ট ভাব নাই, কোন রকম আদবকায়দা নাই, দ্বিধা সঙ্কোচ নাই; এঁদের প্রতি সম্ভ্রমে আমার হৃদয় ভরে গেল।

দিন পাঁচ সাত পরে হোটেলের ষ্টোর-কিপার বিনোদ বাবু এলেন। ভদ্রলোকের বয়স বোধ হয় ৪৬।৪৭। ইনি আসাতে আমাদের বাসাটি সরগরম হয়ে উঠল! ভদ্রলোক এসেই আমাদের জংলী পাহাড়ীটার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিলেন!

হোটেলের একটি ভাল লোককে আমাদের জন্য দিলেন। মসুরীর বাজারে মাছের আমদানী হয় না, কিন্তু ভদ্রলোক আমাদের এই দুটি "আমিষাশী"কে প্রায় প্রত্যহই মাছ খাওয়াতে লাগলেন! তাঁর পাকা হাতে আমাদের গেরস্থালীর ভার চাপিয়ে দিয়ে আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। প্রত্যহ আহারের সময় "নূতন মিনু" দেখতাম, কিন্তু আহারের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত, কাপ্তেন বিনোদ আমাদের খাবারের ফর্দ্দ জানিবার কোন উপায় রাখতেন না। এই কাপ্তেন (captain) উপাধিটি তিনি হোটেলের সাহেব মহল থেকে

লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পেয়েছেন। কাপ্তেন বিনোদ সকল সাহেব ও মেম সাহেবদের প্রিয়। ইনি হোটেলের অতি পুরাতন কর্ম্মচারী! ভদ্রলোক যেমন মিষ্টভাষী, তেমনি রসিক। আর সদাই মুখে হাসি লেগে আছে। সন্ধ্যার সময় কাপ্তেন আমাদের পরলোকতত্ত্ব শোনাতেন। সেখানকার অধিবাসীদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতেন! তাঁর গ্রামের কোন্ নৈয়ায়িকের মৃতা কন্যা বিরজা, কবে কোন্ গভীর নিশীথে বাপের কাছে এসে বলেছিল "বাবা বড় ক্ষিঁদে পেয়েছে খেঁতে দাও," আর নৈয়ায়িক মশাই শিকেয় তোলা হাঁড়ি থেকে মৃতা কন্যাকে ৮ গণ্ডা সন্দেশ দিয়েছিলেন, আর সেই অশরীরী মেয়েটা, চক্ষের পলকে তাহা খেয়ে ফেলে, ঘরের কোণের এক কলসী জল ঢক্ ঢক্ করে পান করলে। এমনিধারা সব অদ্ভুত গল্প বলতেন। যদি বলতুম, আচ্ছা কাপ্তেন, ওরা ত অশরীরী —শরীর ত নাই, তবে আট গণ্ডা সন্দেশ বা খেলে কেমন করে, আর এক কলসী জলই বা গেল কোথায়।

তিনি অমনি বলতেন "তা জানেন না বুঝি, ওঁরা যে রূপ ধরতে পারেন।"

হাসি চেপে বল্লুম—তা হবে!

একাউন্‌টেণ্ট বাবু অমনি ফোঁস করে বল্লেন—আপনি বুঝি ওসব জানেন না? আচ্ছা, একখানা বই দিচ্ছি পড়ুন দেখি—এই বলে তিনি আমায় একখানা বই এনে দিলেন "Man and the Spiritual World।"

আমি হেসে বল্লুম,—হয়ত তাঁরা আছেন, কিন্তু তাই বলে তাঁরা যে আট গণ্ডা সন্দেশ খেতে পারেন, বা এক কলসী জল ঢক্ ঢক্ করে এক চুমুকে নিঃশেষ করেন, এটা মশাই কেমন করে বিশ্বাস করি বলুন। আমরা স্বচক্ষে দেখছি, তাদের জড়দেহখানা পুড়ে ছাই হচ্ছে, stomachএর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকছে না।

একাউণ্টেণ্ট বাবু বল্লেন—কি করে খায়, তা কি মশাই বলা যায়। তবে বিশ্বাস করতে হবে যে তারা খায়! এই সেদিন একখানা ইংরিজী মাসিক পত্রে পড়লুম,—একজন মেম আজ ২০ বছর হল মারা গেছে, কিন্তু সেদিনও লোকে তাকে পিয়ানো বাজিয়ে গান করতে শুনেছে।

আমি বল্লুম,—সে কাগজখানা আমায় দেখাতে পারেন?

—কাগজখানা বোধ হয় হারিয়ে গেছে, খুঁজে দেখবো'খন। আর আমি কি মশাই মিথ্যে কথা বলছি?

এর ওপর আর কথা চলে না; তাহলেই ভদ্রতার গণ্ডী পেরিয়ে যেতে হয়,—কাজেই চুপ করে গেলুম! মনে মনে বুঝলুম, একাউণ্টেণ্ট বাবু কাপ্তেন বিনোদকে পাকড়ে, নিরালায় এই ক'বছর ধরে ওঁর মাথার মধ্যে এই যে সব আজগুবীর বীজ বুনেছিলেন, আজ তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত! যাক্, মোটের ওপর এখানে দিনগুলো মন্দ কাটছিল না।

বিকালে Happy valley clubএ গেলুম। সারা মসুরীর মধ্যে এই একটি টেনিস খেলবার স্থান! ৫।৬টি লন্ আছে।

বারলোগঞ্জের কাছে, "মসি ফল্" আছে। শুনলুম, সকল সময় জল থাকে না। Charleville থেকে ১২ মাইল দূরে "কামটি fall" আছে। কিন্তু এ সময় সেখানে জল নাই বলে আর দেখতে যাওয়া হয় নি!

মসুরীর পাহাড়ীদের বস্তী নাই বল্লেও চলে। ৪।৫ মাইল দূরে নীচে তাদের বাস। তাদের পুরুষরা এখানে 'রিক্‌শ' ও "ডাণ্ডি" টানার কাজে আসে ও "কুলীর" কাজ করে। এখানে পাহাড়ীরা কাঠ পুড়িয়ে কয়লা করে, সেই কয়লারই প্রচলন খুব বেশী। তাহাতেই সকলের রান্না চলে। এক ঝাঁকা কয়লার দাম ২৲ ৩৲ টাকা। তাহাতে প্রায় ১ মোণ ১০ সের আন্দাজ কয়লা থাকে। ঝাঁকা বড় ছোট হিসাবে দাম হয়, ওজন করে বিক্রী হয় না।

দার্জ্জিলিংএর মতন এখানে জলো হাওয়া নাই, আবহাওয়া শুক্‌নো; বেশ মনোরম স্থান। এখানে স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশ উপভোগ করা যায়। মাস দেড়েক সেখানে কাটিয়ে আবার পুরাতন জীবন-যাত্রার মধ্যে ফিরে আসা গেল।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১৭]

সুকুমারীর স্বামী নরেশচন্দ্র আলিপুরের একজন উকিল। পিতার জীবদ্দশায় সে ব্রুম্ গাড়ী চড়িয়া ব্রীফ-ব্যাগ এবং মুহুরী লইয়া ওকালতি করিতে যাইত; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর হইতে এতাবৎ এক দিনেরও জন্য সে আদালতের ভূমি স্পর্শ করে নাই, যদিও প্রতি বৎসর যথারীতি সরকারী সেলামী জমা দিয়া সযত্নে নিজের নামটি আলিপুর উকিলের সুদীর্ঘ তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পিতৃশ্রাদ্ধের পর আদালতে না গিয়া নরেশচন্দ্র যখন ঘরে বসিয়া রহিল, লোকে মনে করিল, অনির্ব্বাপিত পিতৃশোকই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু কিছুকাল পরে তাহার অন্যান্য আচরণাদি হইতে শোকের ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হইলেও যখন সে আদালতে যাইবার কোনো উপক্রম দেখাইল না, তখন তাহার জমিদারীর প্রধান আমলা অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচের পর সভয়ে বলিয়াছিল, "আর কিছু না হলেও ষ্টেটের উকিলরা যে টাকাটা খায়, আদালতে বেরোলে সেটার ত' অনেকটা বাঁচ্‌ত।" উত্তরে নরেশ বলিয়াছিল, "আর কিছু হলে না হয় ও-কাজটাও করা যেতে পারত। কিন্তু আমার ওকালতী বিদ্যে কেবলমাত্র ষ্টেটের উকিল-মারা ব্যাপারেই শেষ হলে আমার ওকালতী আর ষ্টেট্ দুই-ই একই মাত্রায় মর্য্যাদা হারাবে!" সুকুমারী কিছু বলিলে নরেশ বলিত, "কাছারী গিয়ে পসার না হওয়ার চেয়ে কাছারী না গিয়ে পসার না হওয়া অনেক ভাল; তাই কাছারী যাই নে। আদৎ কারণটি তোমাকে শুনিয়ে রাখলাম।" বন্ধুরা যদি বলিত, "ওকালতীই যদি না করলে তা হলে বছরে বছরে লাইসেন্সের পিছনে অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ করা কেন? একেবারেই ছেড়ে দাও না।" নরেশ উত্তর দিত, "একেবারে ছেড়ে দিলে এত খরচ-পত্র করে ওকালতী পাশ করা ষোল আনাই লোকসান হয় যে—তাই বছরে বছরে ও-টাকাগুলো খরচ করি।"

এইরূপে নরেশ কৌতুকে পরিহাসে সকলের মুখ বন্ধ করিত। লোকে বলিত নরেশের বিদ্যা-বুদ্ধি, চাতুর্য্য যে রকম আছে সেইরূপ একটু তৎপরতা যদি থাকিত, তাহা হইলে সে একটা মস্ত লোক হইতে পারিত। অবহেলার জন্য উহার যত কিছু ভাল ভাল গুণ সব নিষ্ফল হইল! শুনিয়া নরেশ বলিত, "সফলতার দিকটা খুব বড় হয়ে উঠলে মাধুর্য্যের দিকটা ছোট হয়ে যায়। গোলাপ ফুলে যদি লিচু ফলের মত ফল ফল্‌ত, তা হলে লোকে গোলাপ গাছের কাছে সাজি হাতে না গিয়ে ডালা হাতে উপস্থিত হ'ত। তোমরা ভেবে দেখ, তোড়ার মধ্যে যে সব ফুলের প্রধান স্থান, রসনা

তৃপ্তির দিক দিয়ে সবগুলোই নিষ্ফল।" উত্তরে সুকুমারী যদি বলিত, "কিন্তু আমগাছে আম না ফলে গোলাপ ফুলের মত ফুল ফুটলে লোকে এত যত্ন করে আম-বাগান করত না, চাঁপা গাছের মত এক আধটা কোথাও পুঁতত।" নরেশ বলিত, "তা' হলে তার দ্বারা লোকের রসজ্ঞানের অভাবই প্রকাশ পেত। আমি কিন্তু খুব খুসী হতাম যদি আমাদের মজিলপুরের বড় আম-বাগানের আমগাছগুলোতে ফল না ফলে গোলাপ ফুলের মত বড় বড় ফুল ফুটত। কি সুন্দর শোভা হত বল দেখি! আমাকে বিশ্বাস কর—সুকু, তুমি যে ফল প্রসব না করে শুধু ফুল হয়ে আমার জীবনের মধ্যে চিরদিন ফুটে থাকবে, তার জন্যে আমার মনে দুঃখের লেশমাত্র নেই!" শুনিয়া সুকুমারীর মুখে কথা আসিত না, পরিতাপে এবং পরিতৃপ্তিতে চক্ষুদুটি সজল হইয়া উঠিত।

কথা দিয়া নরেশ সুকুমারীর মুখ বন্ধ করিয়া দিত বটে, কিন্তু কাজের বেলা তাহাকে সুকুমারীর নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইত। বচনে-বাচনে, হাস্যে-পরিহাসে, উত্তরে-প্রত্যুত্তরে সে একটি হাল ফ্যাসনের বৃহৎ এঞ্জিনের মত ফোঁস্-ফাঁস্ করিত, কিন্তু চলিবার সময়ে যেদিকে সুকুমারী লাইন্ পাতিয়া দিত সেই দিকেই সে চলিত। শুধু বাহিরের গতিই নহে, তাহার অন্তরের প্রবৃত্তিও অবিচ্ছিন্ন অভ্যাসের ফলে নিরুপদ্রবে সুকুমারীকে অনুসরণ করিয়া চলিত। তাই অপরাহ্ণে যখন নরেশ রমাপদকে বলিল, "ভায়া, চল একটু বাজারের দিকে বেড়িয়ে আসা যাক্,—একখানা গাড়ী আনাও।" তখন সে সুকুমারীর পাতা লাইনেই চলিবার উপক্রম করিতেছিল।

বাজারে যাইবার ভিতরে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে সন্দেহ করিয়া রমাপদ মৃদুভাবে আপত্তি তুলিল। বলিল, "আজই রেল থেকে নেমেছেন, আজ ঘোরাঘুরী না করে একটু বিশ্রাম করলেই ভাল হয়।"

নরেশ বলিল, "বল কি রমাপদ! সটান এক হাজার মাইল রেলে গিয়ে গাড়ী থেকে নেমেই সৈন্যরা যুদ্ধ করতে পারে, আর দুশো আড়াইশো মাইল রেলে এসে বাজারে বেড়াতে যেতে তুমি মানা করছ? এই শক্তি আর উৎসাহ নিয়ে তোমরা তা হলে দেশোদ্ধার করবে কেমন করে?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "তাছাড়া এখানকার বাজারে এমনই বা কি আছে,—তার চেয়ে বরং—"

নরেশ বাধা দিয়া বলিল, "আমার হাতেই বা এমন কি সঙ্গতি আছে যে এখানকার বাজার আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে না; তার চেয়ে বরং আর দেরী না করে তুমি গাড়ী আনাও।"

সুকুমারী সহাস্যমুখে রমাপদকে বলিল, "ওঁর সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না রমা,—তুমি গাড়ী আনতে পাঠাও।"

গাড়ী আসিল।

সুকুমারী সরমাকে বলিল, "সরো তৈরী হয়ে নে, চল্ তোদের বাজার কি রকম দেখে আসি।"

সবিস্ময়ে সরমা বলিল, "আমরা বাজার যাব কি দিদি!"

"আমরা কি আর দোকানে নামব? গাড়ীতে বসে থাকব।"

সরমা আপত্তি করিল। তাহার অনেক কাজ আছে, বৈকালের খাবার তৈয়ারী করিতে হইবে, রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সন্ধ্যা জ্বালিতে হইবে, আরও কত কি করিতে হইবে। সুকুমারী সরমার কোনও ওজর-আপত্তি শুনিল না—বলিল, "তুই কি মনে করেছিস লঙ্কা থেকে দুজন রাক্ষস তোদের বাড়ী বেড়াতে এসেছে যে সমস্ত দিন শুধু তাদের খাবার তৈরী করতেই তোকে ব্যস্ত থাকতে হবে? নে, শীঘ্র তৈরী হয়ে নে।"

অগত্যা সরমাকে যাইতে হইল। গৃহে রহিল শুধু বিশুয়া। যাইবার সময়ে সরমা তাহাকে অনেক কাজের ভার দিয়া গেল! ঈশ্বর যথারীতি তাহার সাজ-পোষাক পরিয়া কোচবক্সে চড়িয়া বসিল এবং ঘিণ্টু তাহার মাসীর ক্রোড় অধিকার করিয়া চলিল।

ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। যাইবার সময়ে যে অর্থ নরেশের মণিব্যাগের ভিতর অদৃশ্যভাবে গিয়াছিল, বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে রূপান্তরিত হইয়া তাহা দুই তিন বাণ্ডিলে বদ্ধ এবং দুই তিন ঝুড়ি বোঝাই হইয়া ফিরিয়া আসিল। দ্রব্যাদির মধ্যে সরমা এবং সুকুমারীর জন্য রেসমী এবং মাদ্রাজী কয়েকখানা শাড়ী এবং ব্লাউসের কাপড় ভিন্ন আর যাহা কিছু ছিল সমস্তই ঘিণ্টুর; সোয়েটর্, সুট্, জুতা, মোজা, টুপি, বিস্কুট, লজেঞ্জস্, খেলনা, বার্লি, মেলিন্স্ ফুড, জেলি, জ্যাম, আরও কত কি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস।

বাজারে জিনিসগুলো কেনার সময়ে রমাপদ প্রতিবারেই মৃদুভাবে আপত্তি করিয়াছিল, গৃহে ফিরিয়া সে একটু প্রবলভাবে বলিল "এ কিন্তু ভারী অন্যায়!"

ঔৎসুক্যের সহিত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নরেশ বলিল, "কি ভারী অন্যায়?"

মনের সূক্ষ্ম অথচ জটিল অভিযোগটা ঠিক কিরূপে ব্যক্ত করিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমাপদ বলিল, "দু-দিনের জন্য এসে মিছিমিছি এতগুলো জিনিষ কেনা!"

"দু-দিনের জন্য এসে এতগুলো জিনিস কেনা যদি এতই অন্যায় হয়, তুমি না হয় দু-দিনের জন্য আমাদের বাড়ী গিয়ে এত জিনিস কিনো না! আমি প্রতিশ্রুত হলাম কিছুমাত্র আপত্তি করব না!" বলিয়া নরেশ হাসিতে লাগিল। তাহার পর সুকুমারী নিকটে আছে কি না, একবার চতুর্দ্দিকে দেখিয়া লইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, "তা ছাড়া, তুমি যখন মেশোমশায় হতে পারলে না, তখন এমন সব উপদ্রব তোমাকে একটু আধটু ভোগ করতেই হবে। বুঝলে না কথাটা?" বলিয়া নরেশ অর্থময় কটাক্ষ-ক্ষেপ করিল।

বুঝুক আর নাই বুঝুক অতঃপর রমাপদ আর কোনো কথা বলিল না, কিন্তু রাত্রে সরমার কাছে একান্তে সে কথাটা তুলিল।

সরমা বলিল, "কিন্তু কি করবে বল? আপত্তি ত তুমিও করছিলে আমিও করছিলাম, তার পরও যদি না শোনেন তা হলে আর উপায় কি? তা ছাড়া অবস্থা আর সম্পর্ক হিসেবে দিতে যে পারেন না তা নয়; তবে একটু বেশী রকম খরচপত্র করছেন এই যা!"

এ কথার বিরুদ্ধে মুখে বিশেষ কিছু বলিবার না পাইলেও রমাপদর মন সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হইতে পারিল না। তাহার আহত আত্মাভিমান কেবলই তাহার কাণে কাণে বলিতেছিল, 'এ উপহার দেওয়া নয়, উপঢৌকন দেওয়া নয়; এত খুঁটিয়ে গুছিয়ে কেউ উপহার দেয় না। এ যেন সব দিক ভেবেচিন্তে দরিদ্রের অভাব মোচন করা!'

[১৮]

পরদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া রমাপদ দেখিল তাহারই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে, আর সকলেই উঠিয়াছে; এমন কি ঘিণ্টু পর্য্যন্ত নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহার মাসীর ক্রোড়ে বেড়াইতেছে।

রমাপদকে দেখিয়া সুকুমারী হাসিমুখে বলিল, "তোমার ছেলেটিকে একটু একটু করে দখল করে নিচ্ছি রমা, শেষকালে যাবার সময়ে কলকাতায় নিয়ে না পালিয়ে যাই।"

রমাপদ স্মিতমুখে বলিল, "তা বেশ ত! নিয়েই যাবেন।"

নরেশ রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "কে কাকে বেশী দখল করছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে ভায়া; শেষকালে খোকাই না ওঁকে ভাগলপুরে আটকে রাখে!"

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "তা হলে ত' আরো ভাল হয়!"

নরেশ বলিল, "তুমি ত' বল্‌লে ভাল হয়! কিন্তু ওঁর নিজের দখলে একটি যে ভদ্রলোক আছেন তাঁর ব্যবস্থা কি হবে তা ভেবেছ?"

"তিনি দখলেই থাকবেন।"

"দখলে ত' থাক্‌বেন। কিন্তু খাসদখলে থাকবেন, না বামুন-চাকরের হাতে ইজারায়,পড়বেন, তাই হচ্ছে কথা।"

"খাসদখলে নিশ্চয়ই!" বলিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল।

যেন একটা গুরুতর শঙ্কট কাটিয়া গেল সেইরূপ ভান করিয়া নরেশ বলিল, "তাই বল!"

অপাঙ্গে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুকুমারী মৃদু হাস্য করিল; তাহার পর রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "বামুন-চাকরের হাতে ইজারার কথা ভেবে এত ব্যস্ত, অথচ গেল বছর খানসামা বাবুর্চির ইজারায় পড়ে বিলাত যাবার জন্য যখন ক্ষেপে উঠেছিলেন তখন খাসদখলের কথা কত মনে ছিল সে কথা একবার জিজ্ঞাসা করো ত' রমা!"

রমাপদ কোনো কথা কহিবার পূর্ব্বে ব্যস্ত হইয়া নরেশ বলিল, "হ্যাঁ, সে দুর্ম্মতি একবার হয়েছিল বটে, কিন্তু প্যাসেজ বুক্ করে বাড়ী ফিরে এসে কান্নাকাটির যে—"

"আঃ!"

"—কান্না-কাটির যে মর্ম্মন্তুদ পালা—"

"আবার!"

রমাপদ চাহিয়া দেখিল অস্তাকাশের মত সুকুমারীর মুখ স্তব্ধ সলজ্জ হাস্যে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রমাপদর দিকে সভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া নরেশ বলিল, "কি অন্যায় দেখ রমাপদ! অভিযোগ চলবে, অথচ সে অভিযোগের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়া চলবে না, এত বড় বে-আইনী কথা কোনো দেশের আইনে আছে বলে কখনো শুনেছ?" তাহার পর সুকুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হয় তুমি তোমার অভিযোগ তুলে নাও, নয় আমাকে সবিস্তারে জবাব দিতে দাও!"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "দোহাই

তোমার! তোমাকে জবাব দিতে হবে না, আমি অভিযোগ তুলে নিচ্ছি!"

রমাপদর দিকে চাহিয়া বিজয়-গর্ব্বিত ভাবে নরেশ বলিল, "এরূপ ক্ষেত্রে আমি বাদিনীর-বিরুদ্ধে খেসারৎ পাবার অধিকারী। তুমি বিচারক, আমাকে উপযুক্ত খেসারতের ডিক্রী দাও।"

খেসারতের ডিক্রী দেওয়ার পক্ষে বিচারকের প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, খেসারৎ যে কি পদার্থ তাহা তিনি জানিতেন না। তবে ডিক্রী কথাটা কতকটা পরিচিত, এবং ডিক্রী যে জারী করা হয় এমন কথাও মাঝে মাঝে শুনা ছিল; তাই নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া রহস্যটা পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে রমাপদ ভয়ে ভয়ে বলিল, "ডিক্র জারী করবেন ত?"

নরেশ সজোরে বলিল, "করব না? নিশ্চয় করব!"

তখন, কথাটা একেবারে বেফাঁস্ হয় নাই বুঝিয়া সাহস পাইয়া রমাপদ বলিল, "কি করে করবেন?"

"কি করে করব সে কথা খুলে বল্লে বাদিনী আর বিচারক উভয়েই লজ্জিত হতে পারেন। অতএব সে কথাটা অপ্রকাশিত থাকাই ভাল।"

এ সাবধানতায় কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। কথাটা না শুনিয়াও বাদিনী এবং বিচারক উভয়েই লজ্জিত হইয়া উঠিলেন।

আরক্ত মুখে সুকুমারী রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "সঙ্গ-দোষে তুমিও দেখছি ক্রমশঃ—" তাহার পর ঠিক কি বলা যায় ভাবিয়া না পাইয়া সে থামিয়া গেল।

রমাপদ কিন্তু এই অসমাপিত তিরস্কারেই শুষ্ক হইয়া উঠিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "বিশ্বাস করুন দিদি, ডিক্রী-জারীর মানে ঠিক কি তা আমি জানি নে। আন্দাজি ব্যবহার করেছি!"

রমাপদর কথা শুনিয়া এবং বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া নরেশ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, "মানে ঠিক না জেনে আন্দাজি কথা ব্যবহার করবার একটা মজার গল্প আমি জানি শোন। সুবোধচন্দ্র সান্যাল নামে পূর্ব্ববঙ্গের একটি ভদ্রলোক একেবারে সাত শ' মাইল দূরে কাশীতে গিয়ে হঠাৎ এক দিন হোমিওপ্যাথী প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করলেন। হিন্দুস্থানীর দেশ, রুগী অধিকাংশ হিন্দুস্থানী, কাজেই হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা কইতে হয়। কিন্তু তখন তাঁর হিন্দীর জ্ঞান, তোমার বিশুয়া চাকরের এখন বাংলার জ্ঞান যেমন, ঠিক তেমনি; অর্থাৎ আর সমস্ত কথাই প্রায় অবিকল বাংলা থেকে যাচ্ছে—শুধু ক্রিয়াপদগুলির উপর হিন্দীর একটা আমেজ পড়তে আরম্ভ হয়েছে। পথের ধারে বারাণ্ডায় বসে এক দিন তিনি রুগী দেখছেন, আমরা কয়েকজন বন্ধু বসে খবরের কাগজ পড়ছি আর গল্প করছি, এমন সময়ে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের নাড়ী পরীক্ষা করে সুবোধবাবু বলে উঠলেন, "বোখার তো তাঁতিল হুয়া।" ভদ্রলোকটি চম্‌কে উঠে ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "কেয়া হুয়া?" ডাক্তার বাবু আবার বললেন, "তাঁতিল হুয়া।" ভদ্রলোকটি চঞ্চল হয়ে উঠে সবিস্ময়ে বললেন, "সমঝা নহি!" রুগীর মূঢ়তায় বিরক্ত হয়ে ডাক্তার বললেন, "কি আশ্চর্য্য! সমঝা নেহি? তাঁতিল হুয়া—তাঁতিল হুয়া!" ডাক্তার বাবুর মূর্ত্তি দেখে রুগীর আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হল না, দ্বিধাভরে মৃদুস্বরে বললেন, "যব্ আপ্ কহতে হেঁ তব্ জরুর হুয়া হোগা!" রুগী ওষুধ নিয়ে চলে যেতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তার বাবু, বোখার তাঁতিল হুয়াটা কি ব্যাপার তা'ত আমিও বুঝলাম না! তাঁতিল মানে কি?" ডাক্তার বাবু ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বিস্মিত বিরক্ত ভাবে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এতদিন হিন্দুস্থানীর দেশে বাস করে তাঁতিল মানে কি তা জানেন না? বন্ধ! বন্ধ! তাঁতিল মানে বন্ধ!" আমি সবিস্ময়ে বললাম, "তাঁতিল মানে বন্ধ, এ আপনাকে কে বললে?" একটু মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন, "তা'ও বলতে হবে?" বলে পথের অপর পারে সামনের বাড়ীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "আপনাদের অনাদি বাবু উকিল। মশায়, একটা নতুন জিনিস আয়ত্ত করতে হলে কি কম ফিকিরে থাকতে হয়? একদিন এইখানেই বসে অনাদি বাবু তাঁর একজন মক্কেলকে বলছেন, 'আজ কাছারী তাঁতিল হ্যায়।' একটা নতুন কথা শুনতে পেয়ে আমি অনাদি বাবুর কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করলাম 'আজ কাছারী কি আপনাদের?' অনাদি বাবু বললেন, 'আজ কাছারী বন্ধ।' তখনি বুঝে নিলাম তাঁতিল মানে বন্ধ।" ডাক্তার বাবুর কথা শুনে আমরা যে কয়েক জন ছিলাম একেবারে হো হো করে হেসে উঠলাম! হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ী ছেঁড়বার উপক্রম হ'ল। ডাক্তার

মশায় আমাদের ও-রকম হাসি দেখে নিশ্চয়ই চটে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন যখন তাঁকে জানালে যে তাঁতিল মানে বন্ধ নয়, ছুটি, তখন কিছুক্ষণ তিনি নির্ব্বাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে দেরাজ টেনে বাদামী কাগজের একটা খাতা বার করে পেন্সিল দিয়ে একটা জায়গা কেটে কি লিখে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বস্‌লেন। তার পর কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ হেসে উঠে বল্‌লেন "কি আশ্চর্য্য! কালও আমি আমার চাকর কপুরীকে বলেছি 'দরোজা জান্‌লা সব তাঁতিল কর দেও, ধূলা আস্‌তা হ্যায়!'"

নরেশের গল্প শুনিয়া রমাপদ এবং সুকুমারী উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। সরমা রান্না-ঘরে চা এবং জলখাবারের ব্যবস্থা করিতেছিল, হাস্য-কলরবে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

"এত কি হাসির গল্প হচ্ছে দিদি? আমি কিছুই শুনতে পেলাম না!"

সুকুমারী বলিল, "তুই রান্না-বাড়া নিয়েই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক্‌বি ত' গল্প শুনবি কখন!"

নরেশ বলিল, "গল্প যদি শুনতে চাও সরমা, তা হলে রান্না-বাড়া একেবারে তাঁতিল করে দাও!"

আবার একটা হাসির কলরোল উঠিল।

সবিস্ময়ে সরমা বলিল, "তাঁতিল কি?"

এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিল না—শুধু হাসির মাত্রা বাড়িয়া গেল।

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। রহস্যে প্রবেশ করিতে হইলে কিছু সময় লাগিবে ভাবিয়া সরমা, সে ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চা ও জলখাবারের জন্য নরেশ এবং রমাপদকে প্রস্তুত হইতে তাগিদ দিয়া প্রস্থান করিল।

অপরাহ্ণে বেড়াইতে যাইবার কথা উঠিল।

রমাপদ বলিল, "টিলাকুঠি যাওয়া যাক্।"

সরমা বলিল, "বুঢ়ানাথের মন্দির।"

নরেশ বলিল, "স্বামী-স্ত্রীতে মতভেদ হলে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা মীমাংসা আবশ্যক: তুমি এর মীমাংসা কর সুকু!"

সুকুমারী হাসিয়া বলিল, "মীমাংসা করতে গিয়ে শেষকালে যদি তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ হয় তার মীমাংসা করবে কে?"

নরেশ বলিল, "সে ভয় করো না। তোমার আমার মধ্যে মতভেদ হতে পারে এ অপবাদ আমাদের কেউ দিতে পারে না। অবশ্য কার গুণে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে।"

রমাপদ এবং সরমার প্রতি অর্থময় ভ্রূভঙ্গী করিয়া মুচকিয়া হাসিয়া সুকুমারী বলিল, "কার গুণে শুনি? তোমার গুণে?"

নরেশ মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "রামঃ! তোমার গুণে; আমার দোষে।"

পুনরায় সরমা এবং রমাপদর প্রতি গূঢ় কটাক্ষ-ক্ষেপ করিয়া সুকুমারী বলিল, "শোন কথা! ওঁর দোষে! উনি যেন কত নিরীহ!"

নরেশ আর্ত্তস্বরে ব্যগ্রভাবে বলিল, "আমাকে বিশ্বাস কর সুকু, আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, আমার গুণে, তোমার দোষে। তোমার ভ্রূকুটি দেখে ভয়ে উল্টা বলে ফেলেছি!"

নরেশের কথায় তিন জনেই উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিল।

স্থির হইল, যেহেতু টিলাকুঠি এবং বুঢ়ানাথের মন্দির একই দিকে অবস্থিত—সময়ের অভাব না ঘটিলে উভয় স্থানেই যাওয়া হইবে।

যাত্রাকালে সুকুমারীর নগ্ন পদ দেখিয়া নরেশ বলিল, "অনেকখানি হাঁটতে হবে, জুতো পরে নাও।"

সুকুমারী বলিল, "সরো খালি পায়ে যাচ্ছে, আমি জুতো পরে কেমন করে যাই?"

সরমা একটু দূরে ছিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল, "দেখুন দেখি জামাইবাবু, দিদির কি অন্যায়! আমি খালি পায়ে গেলে ওঁর জুতো পরে যেতে নেই তার কি মানে আছে?"

নরেশ কহিল, "খুব বেশী মানে না থাকলেও, আমি বলি তর্কে প্রয়োজন কি? তুমিও জুতা পরে নাও না। পা দুটোকে অকারণ কষ্ট দিয়ে আর বিপন্ন করে ত' কোনো লাভ নেই!"

সুকুমারী বলিল. "আমি আমার এক জোড়া ওকে জোর করে পরিয়ে দিয়েছিলাম,, পায়েও হয়েছিল ঠিক, কিন্তু কিছুতে রাজী হল না, খুলে ফেল্‌লে।"

সরমার দিকে চাহিয়া নরেশ কহিল, "কেন? আপত্তি কিসের?"

মৃদু হাস্যের সহিত সরমা বলিল, "অভ্যাস নেই; অসুবিধা হবে।"

নরেশ। কিন্তু অভ্যাস হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অনভ্যাসের বিরুদ্ধে লাগা। সে হিসাবে ত' পরা যেতে পারে?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া সরমা বলিল, "সে না হয় অন্য কোনো দিন হবে—আজ থাক।"

নরেশ। পাঁজীতে নবজুতা পরিধানের জন্য যখন শুভ-দিন লেখে না, তখন আজ হলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না।

কিন্তু সরমা কিছুতেই স্বীকৃত হইল না,—বলিল অভ্যাস লোক চক্ষুর অন্তরালেই শ্রেয়; তদ্ভিন্ন, দেব মন্দিরে যাইতে হইবে,—সেখানে জুতা চলিবে না। অগত্যা সুকুমারীকেও নগ্ন পদে যাইতে হইল।

টিলাকুঠির সোপান-মূলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নরেশ ও সুকুমারী মুগ্ধ হইয়া গেল। সুবৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপের উপর বহু উচ্চে মনোরম অট্টালিকা, তৃণ-মণ্ডিত ঢালু স্তূপ-গাত্র বাহিয়া দুইটি প্রশস্ত সোপানাবলি কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পাপাপাশি উঠিয়া একটি বৃহৎ চত্বালে মিলিত হইয়াছে, এবং তদূর্দ্ধে এক সারি সোপান সরল রেখায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া সৌধ-প্রাঙ্গণ-প্রান্তে পৌঁছিয়াছে। স্তূপ-গাত্রে স্থলে স্থলে সুদূর-প্রয়াসী আকাঙ্ক্ষার মত দীর্ঘ ঋজু ইউক্যালিপ্‌টস্ ও ঝাউ গাছ তৃণদাম ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; তাহাদের গগন-স্পর্শী শীর্ষদেশ সমীর-হিল্লোলে মর্ম্মরিত।

সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া সকলে গৃহ সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। তাহার পর গৃহ ও গৃহাভ্যন্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলের ছাদে উপস্থিত হইল। তথা হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়াহত আনন্দে সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। উত্তরে স্বচ্ছ-সলিলা ভাগীরথী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে প্রসারিত, পরপারে বালুময় নদী-সৈকতের ক্রোড়ে শঙ্করপুর গ্রাম; দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায় তরঙ্গমালা-বিক্ষুব্ধ নীল সমুদ্রের মত তালগাছের শীর্ষ, তাহার মধ্যে মধ্যে ক্বচিৎ প্রকাশমান রেলপথ; পূর্ব্বে ঘননিবদ্ধ বৃক্ষরাজির আবরণ ভেদ করিয়া ভাগলপুর সহরের সৌধাংশমালা দেখা যাইতেছে এবং পশ্চিমে অদূরে, জীবন-সূর্য্যের অস্তপ্রদেশ,—ভাগলপুরের শ্মশান, ঈষৎ ধূমায়িত!

চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে সহসা তাহারা কোনো এক সময়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুই বিভিন্ন দিকে দাঁড়াইয়া পড়িল। নরেশ, সুকুমারী, এবং ঘিণ্টুকে ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বর দাঁড়াইল উত্তর দিকে এবং রামপদ ও সরমা দাঁড়াইল পশ্চিম দিকে। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সরমার সর্ব্ব শরীর অল্প অল্প কাঁপিতেছিল। রমাপদ বলিল, "চেয়ে দেখ সরমা, ঈশ্বরের কোলে ঘিণ্টুকে কেমন সুন্দর মানিয়েছে। আজ সকালে এই পোষাক পরে সে যখন বিশুয়ার কোলে বেড়াচ্ছিল—কেমন যেন খাপছাড়া দেখাচ্ছিল।"

স্বামীর কথায় সরমা পিছন ফিরিয়া একবার ঘিণ্টুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিল, কিছু বলিল না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপদ পুনরায় বলিল, "শুধু ঈশ্বরের কোলেই নয়—ঈশ্বরদের দলেও ও কেমন মিশে গিয়েছে দেখ! মনে হচ্ছে ও যেন ওদেরি একজন; আমাদের কেউ না।"

এবার সরমা পিছন ফিরিয়া পুত্রকে না দেখিয়া পাশ ফিরিয়া স্বামীকে দেখিল। স্নিগ্ধ মেঘের মধ্যে তড়িৎ যেমন অদৃশ্য ভাবে লুক্কায়িত থাকে, তেমনি তাহার স্বামীর শান্ত বাক্যের মধ্যে আর অন্য কোনো পদার্থ লুক্কায়িত আছে কি না জানিবার জন্য সে একবার গভীর ভাবে রমাপদর মুখে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু রমাপদ তখন মৃদু মৃদু হাস্য করিতে ছিল—স্পষ্ট কিছু বুঝিতে না পারিয়া সরমা হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভাগ্যে আমি জুতো পরে আসি নি, তা হলে আমাকেও ত' তুমি ঈশ্বরদের দলে ফেলতে!"

রমাপদ সহাস্যমুখে বলিল, "তা হলে এমন মন্দই বা কি হ'ত? বিশুয়ার দল ছেড়ে ঈশ্বরের দলে ঢুক্‌তে পারলে একটা খুব বড় রকম প্রমোশনই ত' হয়!"

এ কথার উত্তর দিবার সময় হইল না, পদশব্দে সরমা পিছন ফিরিয়া দেখিল—ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দল তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

নিকটে আসিয়া নরেশ বলিল, "এমন ভাবে দুজনে পৃথক হয়ে পড়ে নিভৃত আলাপ কাব্যশাস্ত্রের অনুমোদিত সন্দেহ নেই, কিন্তু অতিথিদের কাছ থেকে হঠাৎ এমন করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে লোকাচারের দিক থেকে একটু আপত্তি তোলা যেতে পারে।"

সরমা লাল হইয়া উঠিল। রমাপদ হাসিয়া বলিল, "না, একেবারে বিচ্ছিন্ন হইনি; ঘিণ্টু আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে ছিল।"

"ওঃ তাও ত বটে! এত বড় যোগসূত্রটার কথা আমার মনেই পড়েনি!" বলিয়া নরেশ হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, "এই যোগসূত্রের একটা চমৎকার গল্প জানি—বলি শোন।"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "রক্ষে কর! তোমার গল্প আরম্ভ হলে আর বুঢ়ানাথে যাওয়া হবে না,—সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়া নরেশ বলিল, "দেখ, প্রোগ্রাম অগ্রাহ্য করবার আর কাজ পণ্ড করবার শক্তি ভগবান যাদের দেন নি, তারাই হচ্ছে অরসিকের দল! রসিক যারা তারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের লোভে বর্ত্তমানকে কখনো অবহেলা করে না।"

সরমা বলিল, "তেমন যদি বড় না হয়, তা হলে গল্পটা শোনাই যাক না দিদি।"

সুকুমারী বলিল, "তুই ক্ষেপেছিস না কি সরো! সামান্য ব্যাপারকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে কি রকম বড় করে তুলতে পারেন তা'ত জানিস নে। এখনি তিলের মত ছোট গল্প তালের মত বড় হয়ে উঠবে!"

গম্ভীর মুখে নরেশ বলিল, "তাকেই বলে ক্ষমতা! গুণকে দোষের মত করে বর্ণনা করবার এমন অদ্ভুত শক্তি তোমার আছে যে নিন্দার ছলে যখন স্তুতি কর তখন প্রথমে বোঝাই যায় না যে যা করছ তা নিন্দা নয়, স্তুতি!"

নরেশের কথায় তিনজনে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সুকুমারী বলিল, "না, না, চল নেমে পড়া যাক্। ও-দিক থেকে কি সব ধোঁয়া টোঁয়া আসছে; রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে পড়ন্ত বেলায় এখানে থেকে কাজ নেই!"

শ্মশানে তখন বোধ হয় একটা নূতন চিতায় অগ্নিসংযোগ হইয়াছিল। সকলে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল।

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। সমস্ত আকাশ সন্ধ্যার কিরণে আরক্ত; সেই কিরণ গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া নদীর জল দ্রবীভূত স্বর্ণপ্রবাহে পরিণত হইয়াছে। নরেশ প্রভৃতি বুঢ়ানাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণের উত্তর প্রান্তে রেলিংএর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিম্নে, বহু নিম্নে বাঁধানো ঘাটের শেষ সোপান স্পর্শ করিয়া জাহ্নবী-ধারা প্রবাহিত; পরপারে বিস্তৃত চরভূমি শীতসন্ধ্যার সঞ্চীয়মান কুয়াসায় ধূসর; তাহার পশ্চাতে বহুদূরে হিমিকাস্পৃষ্ট মসীমাখা তরুশ্রেণী চিত্রের মত অবস্থিত। গো-চর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনশীল গৃহপালিত পশুদিগের কণ্ঠনিবদ্ধ ঘণ্টার ঢং ঢং ধ্বনি শুনা যাইতেছে, কিন্তু কুহেলী ভেদ করিয়া তাহাদিগকে দেখা যাইতেছে না। গগনে, পবনে, জলে, স্থলে সর্ব্বত্র বিরাট যেন তাঁহার আসন পাতিয়া বসিয়াছেন! বিশ্বচরাচর থম্ থম্ করিতেছে! নিখিলেশের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে!

বাক্যহারা হইয়া স্তব্ধ-বিস্ময়ে সকলে শুধু চাহিয়া রহিল! কাহাকেও বলিয়া দিতে হইল না যে যাহা দেখিতেছে তাহা অপূর্ব্ব—অবর্ণনীয়!

মৌন ভঙ্গ করিল নরেশ; গভীর স্বরে সে বলিল, "ধন্য রমাপদ! যে দৃশ্য দেখালে ভাই, জীবনে তা ভুলব না! খুব যে বেশী দেখা শুনা আছে তা বলতে পারিনে—কিন্তু এমনটি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।"

সুকুমারী বলিল, "সত্যি! মন্দিরও ত' অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন গঙ্গাগর্ভ থেকে একেবারে সোজা উঠেছে, এমন মন্দির বোধ হয় কোথাও দেখি নি!"

সম্মুখস্থ দৃশ্যাবলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নরেশ ধীরস্বরে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এমন শোভাসম্পদময় বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চেয়ে, কি-জানি কেন, আমার কেবল মনে হচ্ছে সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা—মনে হচ্ছে—

নাহো ন রাত্রি র্ন নভো ন ভূমিঃ
নাসীৎ তমোজ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।"

নরেশের গভীর মিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত মহাপ্রলয়ের এই ধ্যান-বর্ণনা শুনিয়া অর্থ না বুঝিয়াও সকলে একটা অননুভূতপূর্ব্ব মোহাবেশে মগ্ন হইল। কিছুকাল পরে পশ্চাতে মন্দির দ্বার বিলম্বিত ঘণ্টা সহসা বাজিয়া উঠিলে সেই শব্দে মোহ-বিমুক্ত হইয়া সকলে সে স্থল পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

'উপরি'-পাওনা

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বেলমা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁকে 'মশাই' বলে ডাক্‌তো, কিন্তু তাঁর নাম ছিল শ্রীযুক্ত সনাতন শাণ্ডিল্য। তিনি গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই। তাঁর ধরণধারণ খুব সাদা-সিধে। সরল প্রকৃতির লোক, সংসারের কোনও কিছুরই খবর রাখতেন না। আজীবন শুধু ছেলে পড়িয়ে আসছিলেন—গ্রামের বারোয়ারী-তলার পাশে বড় বকুল-তলায়। যেদিন বড্ড ঝড় জল হত বা হবার আশঙ্কা থাকতো, সেদিন তিনি সেই বকুলতলার বাঁধান বেদীটা বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিয়ে তারই পাশে শিবঘরের দাওয়ায় বসে ছেলেদের পড়াতেন। তাঁর কত ছাত্র মানুষ হয়ে দেশ-বিদেশে বেশ দুপয়সা রোজগার করে বেড়াচ্ছে; কত মেয়ে সুশিক্ষা পেয়ে সুনাম-সুযশ নিয়ে শ্বশুর-ঘর কর্চ্ছে। এদেরও সব ছেলেমেয়েরা আবার পাততাড়ি বগলে করে তাঁর পাঠশালায় তাদের বাপ মায়ের মত আস্‌তে আরম্ভ করেছে। 'মশাই'এর বয়স এখন বছর ষাটের কাছাকাছি। তাঁর মাথার সব চুল সাদা; গলায় তুলসীর মালা; গায়ের রং সুন্দর। সাদা ধবধবে কাপড়, কাঁধে একখানি গামছা এই হচ্ছে মশাইএর সনাতন পোষাক।

হঠাৎ একদিন তিনি জমিদারের কাছারীতে উপস্থিত হয়ে বাবুকে বল্‌লেন—"কর্ত্তামশায়,বাড়ীতে বড়ই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়েছে; পাঠশালাটা আর রাখা গেল না দেখ্‌ছি। এ বয়সে আবার বিদেশ কোথায় গিয়ে কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা কর্ব্বো! আপনি বড় খোকাকে একটা পত্র দিন, আমারই মারফতে আমার একটা কাজের জন্য—রামকৃষ্ণপুরের চালের আড়তে। সে ইচ্ছা করলে আমাকে সেখানে একটা কাজ দিয়ে বড়লোক করে তুলতে পারবে। বাড়ীর সকলের—হঠাৎ বড়লোক হবার বড় খেয়াল চেপেছে। আমার নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলে পড়ান এঁদের বড় অপছন্দ—বলে কি না 'তোমার পড়োরা মাসে যা উপায় করছে, তোমার পাঁচ বছরেও তা হয় না। তুমি এ বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে বেশী পয়সা উপায়ের চেষ্টা কর।' তবু ছেলে মেয়ে পাঁচটা কেঁদে বেড়াচ্ছে না কর্ত্তামশায়! একবার ভেবে দেখুন, এরা কি বলে আর আমাকে দিয়ে কি করাতে চায়। যা হোক, এর একটা বিহিত করে দিন।"

বাবু বল্লেন,—"সনাতন, ছেলেদের লেখাপড়া শেখানর গুরুমশায়ী স্বভাব ও বিদ্যে নিয়ে এ বয়সে আর রকম-ফের বিদ্যের হাতে-খড়ি না করলেই হত ভাল! কিন্তু তুমি যখন স্ত্রীবুদ্ধি-চালিত হয়ে মাথা খারাপ করে এসেছ, তখন অন্যকথা বুঝবেও না, শুনবেও না। এখন কি করতে চাও বলো? আড়তে কোন্ কাজ তুমি করতে পারবে বলে মনে হয়। যা পারবে তারই জন্যে পত্র লিখে দিই।"

মশাই বল্লেন—"বাড়ীতে বলছিলেন পাশের বাড়ীর যদু ও মধু দুজনে মাসে মাসে মাইনে ছাড়া ২০।২৫ টাকা 'উপরি' উপায় করে—কলিকাতার নানা দ্রব্যে কেমন ঘর-বাড়ী গুছিয়েছে,—সাজিয়েছে। তাদের কোনও অভাবই নেই। তা ছাড়া পাঁচজনকে টাকা কড়ি ধার দিয়ে মহাজনী করে আরও যথেষ্ট উপায় করে মহাসুখে দিন কাটাচ্ছে; আর আমাদের শুধু কোনও রকমে খেয়ে দেয়ে দিন যাচ্ছে—গিন্নী কখন ত কাউকে একটা পয়সাও হাতে তুলে দিতে পারছেন না; ব্রতধর্ম্ম করতে পারছেন না; তাই তিনি বড় দুঃখিত হয়েছেন। বলেন 'যদু-মধু ত রামকৃষ্ণপুরের আড়তে ১২ বার টাকা মাইনেই কাজ করে। মাইনে ছাড়া কি করে এত 'উপরি' উপায় করে।' "

আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম যে তারা ওজন-সরকার। ধান-চাল মাপের পরিমাণ ধরবার জন্য ব্যাপারীর ধান-চালের মুঠো মুঠো নিয়ে ওজনের সংখ্যা রেখে দিনান্তে পাঁচ-সাত সের চাল-ধান তাদের উপায়ে আসে। আর বল্লে 'এই সঙ্গে সময়-শিরে—খুব ভিড়ের দিনে আড়তের চাল হতে দুএক সরা চাল নিয়ে পরিমাণটা আরও

বাড়িয়ে নিই।' তাই আমি মনে করছিলাম যে, এ ত খুব সহজ কাজ; এ কাজ আমি কেন পার্‌বো না। আমার গায়ে এখনও খুব জোর আছে। দেখুন না আমার হাতের কব্জি—আমি ধামা-ধামা চাল 'উপরি' নিয়ে আমার প্রাপ্য চালের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেই আমার আয় খুব বেশী হয়ে পড়্‌বে।"

কাছারি-ঘরের সব লোকজন মশাইএর কথা শুনে হেসে অস্থির হতে লাগলো; আমলারা সব গা-টেপাটেপি করতে লাগলো। মশাই তাদের রকম-সকম দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে বল্‌লেন—"এতে বাপু, এমন হাসির কথা কি আছে?"

বাবু বল্লেন—"সনাতন, এ রকম 'উপরি'র নামান্তর হচ্ছে চুরি। তা কি তুমি করতে রাজী আছ? অতি সরল-উদার প্রকৃতির মানুষ তুমি—এ সব কথারই কিছু তুমি বোঝ না; তুমি যাবে সহরে চাকরী করতে। যাক্, আমি তোমার ও তোমার 'বাড়ীর' সব কথাই বুঝে নিয়েছি,—এবং এর যা বিহিত, তা শীঘ্র কর্‌ছি।"

মশাই অপ্রস্তুত হয়ে টাকের উপর হাত বুলাতে বুলাতে কোনও কথা না ব'লে সেখান হতে তখনই দ্রুত পালিয়ে গেলেন।

বাবু তখন আর সকলকে বল্লেন—"এই যে সনাতন কোনও কথা না ব'লে এমন ভাবে চোরটির মত পালাল, এতেই শেষ হল না। ও এখনই ফিরে এসে আবার কি হাঙ্গামা বাধায় দেখ। আমি আজ ষাট বছর ধরে ওকে দেখে আস্‌ছি;— ওকে মাত্র আমিই চিনেছি। আমি বল্‌ছি, ওর যোগ্য কাজ ঐ ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া—তা ছাড়া আর কিছু ও পারবে না। তা বুঝেই আমি কখনও সনাতনকে কোনও কাজের মধ্যে আন্‌তে চেষ্টা করিনি। এতকাল আমি ওর মনে বা মুখে কোনও মালিন্য কখন দেখি নি। মুখে হাসি সদাই লেগে আছে। ওর এই সবে প্রথম বিষণ্ণ ও ভাবান্তর দেখ্‌লাম। আমি মনে করছি—গ্রামে একটি স্কুল করে দিই; তার নাম দিই 'সনাতন-পাঠশালা'। সনাতন তারই তত্ত্বাবধান ক'রে জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিক্। আর দেখুন নায়েব মশাই; আমার নাম করে পত্র দিন ওর যত সব ছাত্র দেশে-বিদেশে আছে—তারা সংখ্যায় ত বড় কম হবে না, শ'দেড়েকের উপর—যারা ওর শিক্ষায় মানুষ হয়ে আজ দেশের সেবা কর্চ্ছে। তাদের কাছে লিখে দিন যে আমি 'সনাতন-পাঠশালা' স্থাপন করব, স্থির করেছি। তারা সকলে যেন আগামী পূজার সময় সনাতনের বাড়ীতে মহাপূজায় আগমন ক'রে 'মশাই-গিন্নী'র,—তাদের গুরু-পত্নীর ব্রত-ধর্ম্মের আশাটা পূরণ করে দেয়; এবং সনাতনের 'উপরি' উপায়-স্বরূপ যথাযোগ্য গুরুদক্ষিণা দিয়ে তার "মহাজন" হবার আশা মিটিয়ে দেয়। সনাতন এতদিন ধরে যে বিদ্যের মহাজনী করে এসেছে, সেটা যেন তারা সুদে-আসলে উশুল করে দিতে ভুলে না যায়।"

এমন সময় সনাতন মশাই একরাশ খাতা-পত্র বগলে নিয়ে প্রফুল্ল মুখে হাস্‌তে হাস্‌তে কাছারী-বাটীতে এসে বল্লেন "দেখুন কর্ত্তামশায়,—আমার এই চল্লিশ বছরের হাজিরে-খাতা; এতে যদু-মধুর নাম নেই—ওরা আমার ছাত্র নয়। আমার ছাত্র হয়ে কি কেউ কখন 'উপরি' উপায় কর্‌তে পারে? চুরী-বিদ্যাও আমি কখন কাউকে শিক্ষা দিই নি—নিজেও তা জানিনে। বুড়া মানুষ—হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল কর্ত্তা মশাই, কিছু মনে করবেন না।"

বাবু হেসে বললেন "সনাতন, তোমাকে কি আমি চিনিনে। যাও, তোমার সহধর্ম্মিণীকে বল গিয়ে, এবার আমি সমস্ত খরচ-পত্র ক'রে তোমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব করব। তোমার সব ছাত্রকে নিমন্ত্রণ করব। তাতে তোমার সহধর্ম্মিণীর যথেষ্ট 'উপরি'-পাওনা হবে, বুঝলে সনাতন!"

সনাতন মশাই বল্‌লেন—"সে কি কর্ত্তা মহাশয়, আমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব! সে কি করে হবে? লোকে কি বল্‌বে? আমার মত গরিব গুরুমশায়ের কি অমন বড়মানুষী সাজে? আপনি ও-সঙ্কল্প ত্যাগ করুন; আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।"

বাবু সহাস্যে বলিলেন—"সনাতন, হাকিম ফেরে, ত হুকুম ফেরে না। এবার তোমার বাড়ী দুর্গোৎসব হবেই; তোমার গৃহিণীর 'উপরি'-পাওনা এবার চাই-ই।"

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যুৎ সাহায্যে চাষ—

আমেরিকার বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক বুরব্যাঙ্কের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ফরাসী দেশেও একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের মত উদ্ভিদ্-জগতে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য কাণ্ড সংঘটন করিয়াছেন।

তিনি মাটি, আকাশ এবং সূর্য্য হইতে তাঁহার নির্ম্মিত একটি বিশেষ যন্ত্র-সাহায্যে তড়িৎ-শক্তি সংগ্রহ করিয়া

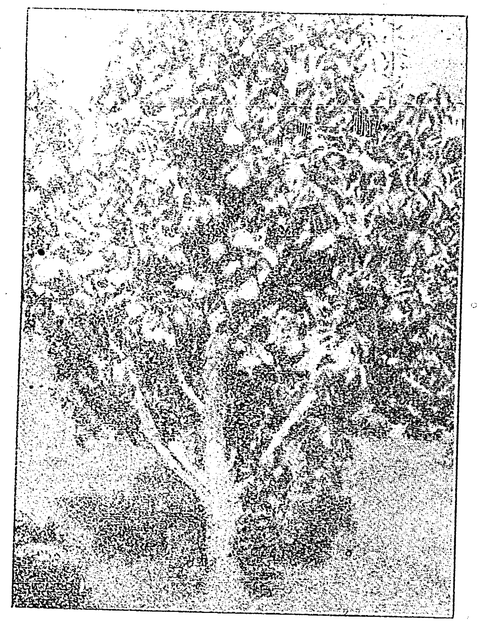

তড়িৎ-শক্তিতে উৎপন্ন বৃক্ষ

তাহাকে বৃক্ষ-লতাদির মধ্যে পরিচালনা করিয়া নানাবিধ ফলমূলের বিবিধ প্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেন। একটি আপেল বৃক্ষে বহুকাল কোন ফল ফলে নাই। ফরাসী বৈজ্ঞানিক Justin Christoflorean এই আপেল গাছটিকে তড়িৎ-চিকিৎসা করার পর ইহাতে এত ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে, যে গাছটি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। অন্যান্য নানা প্রকার ফলের আকার তিনি তড়িৎ-সাহায্যে তাহার পূর্ব্ব-আকারের দ্বিগুণ করিয়াছেন।

Justin Christoflorean বলেন যে, তড়িৎ শক্তির এমন একটি গুণ আছে, যাহা বৃক্ষলতাদির অনিষ্টকারী সকল রকম পোকা মাকড় ইত্যাদি হত্যা করিয়া বৃক্ষকে স্বাভাবে নবশক্তি দান করিয়া তাহার স্বাস্থ্য শতগুণ বাড়াইয়া দেয়।

৩০০০ ফিট উঁচু হইতে লাফ—

কলিকাতার গড়ের মাঠের মনুমেণ্টে চড়িয়া তাহার উপর হইতে নীচে লাফ দিয়া পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করে

লাফ দিবার সময়ের ছবি

হয়—কিন্তু কেহ লাফ দিয়াছে বলিয়া এখনও শোনা যায় নাই। সঙ্গে প্যারাসুট্ লইয়াও কেহ লাফ দিবে কি না জানি না।

শুনিলে অবাক হইতে হয়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বায়ু সৈন্যের করপোরাল আর্থার্ আর্ বার্গো ৩০০০ ফিট উচ্চে স্থিত এরোপ্লেন্ হইতে প্যারাসুট লইয়া শূন্যে লাফ দিয়াছিলেন। প্রথম ১৫০০ ফিট সোঁ করিয়া নীচে নামিয়া

আসেন—এই ১৫০০ ফিট প্যারাসুট বন্ধ ছিল। এই প্রকার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া লাফ দিবার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র

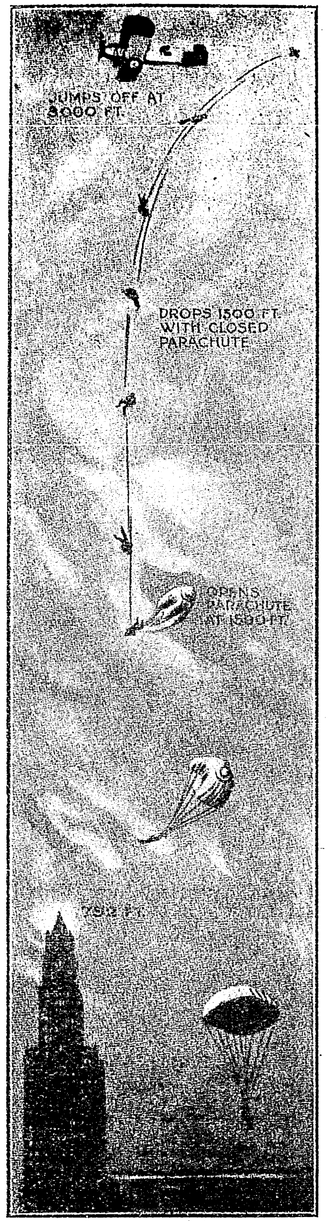

আশ্চর্য্য উল্লম্ফন

পরীক্ষা করা যে, মানুষ এত উঁচু হইতে লাফ দিয়া বাঁচিতে পারে কি না। এই পরীক্ষায় তিনি সফলকাম হইয়াছেন। তিনি এই লাফ দিয়া সফলকাম হইবার পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, এত উঁচু হইতে বন্ধ প্যারাসুট লইয়া লাফ দিয়া কেহ বাঁচিতে পারে না। প্যারাসুট খুলিবার সময় আর তাহার হয় না, তাহার পূর্ব্বেই সে মাটিতে পড়িয়া ছাতু হইয়া যাইবে।

সার্জ্জেণ্ট বোস্ নামক আর একজন লোকও ১৫০০ ফিট উঁচু স্থান হইতে লাফ দিয়া কিছু পরে প্যারাসুট খুলিয়া নিরাপদে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। ইহারা দুইজন বলেন যে "লাফ দিবার পর আমাদের কোনোপ্রকার বুদ্ধি লোপ পায় নাই। জীবনের আশাও একবিন্দু ত্যাগ করি নাই।" বোস্ বলেন "লাফ দিবার পর আমার প্রথম কথা মনে হয়— মাটিতে নামিয়া কি ভাল খাবার খাইব।"

স্বাধীন দেশের লোক যেমন জীবনকে পূরামাত্রায় ভোগ করে, তেমনি মরিবার সময়ও ইহারা মরণকে হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পারে।

অভিনব মানুষ—

আফ্রিকার কঙ্গোর জঙ্গলে নানাপ্রকার অসভ্য জাতি

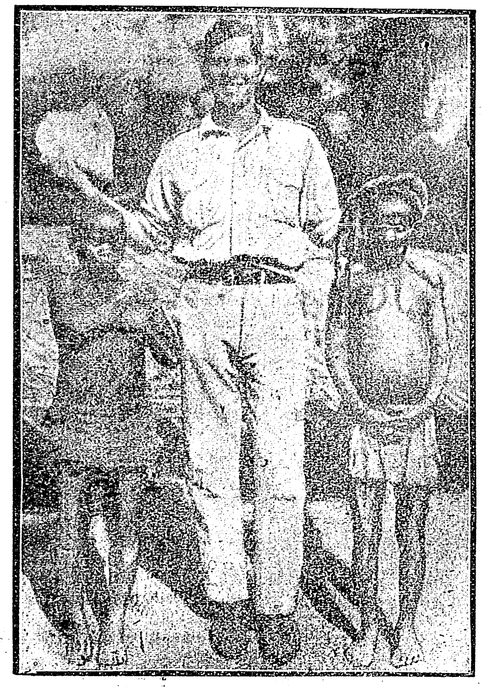

অভিনব মানুষ

বাস করে। কত রকম জাতি যে বাস করে তাহাদের সংখ্যা এখনও সব জানা যায় নাই।

"ওয়ামবুটি" 'পিগ্‌মি' অর্থাৎ বেঁটে মানুষ বা বামন বলিয়া এক জাতি এই জঙ্গলের এক স্থানে বাস করে। ইহাদের দুইজনের ছবি (পিতা ও কন্যা) এক সাধারণ মানুষের

অভিনব মানুষ

দুই পাশে দেওয়া হইল। এই পিতা ও কন্যা এই জাতির মধ্যে অত্যন্ত লম্বা বলিয়া খ্যাত।

কঙ্গোর কিভু নামক জঙ্গলে আর এক জাতির বাস। ইহারা তাহাদের পিঠ নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র করিয়া উল্কি কাটে। উল্কির নমুনা দেওয়া হইল।

হেনরি মামবোল্ট—

যে বালকটির ছবি দেওয়া হইল, তাহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর। এই বয়সেই যে গণিত-শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ইয়োরোপের চিকিৎসক-মহল এবং বৈজ্ঞানিকগণ এই বালকের অসাধারণ মস্তিষ্ক দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়াছেন। গণিত-শাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল সমস্যা এই বালক বিনা কষ্টে সমাধান করিয়া ফেলে। উচ্চ গণিতের কতকগুলি ভয়ানক জটিল প্রশ্ন এই বালককে করা হয়। বালক অতি কম সময়ে সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দানে সকলকে চমৎকৃত করিয়া ফেলে। অনেক গণিত শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দান করিতে বহুক্ষণ ধরিয়া মাথা ঘামাইতে হয়। বালক যেমন ভাবে প্রশ্নের উত্তর

হেনরী মাম্‌বোল্ট (বয়স ৬ বৎসর)

দান করে, তাহাতে মনে হয় যেন তাহার ঠোঁটের আগায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আসিয়া প্রশ্নের অপেক্ষা করিতেছে।

রুডলফ্ ভ্যালেন্‌টিনো—

বিখ্যাত বায়স্কোপ-অভিনেতা রুডলফ্ ভ্যালেনটিনো গত ২৩এ আগষ্ট নিউইয়র্ক সহরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে আমেরিকায় এবং জগতের অন্যান্য সভ্য সমাজে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নিউইয়র্কে ইহার মৃতদেহ দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী ছিল। পুলিশ অনেক চেষ্টা করিয়াও ভিড়

সরাইতে পারে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইঁহার জন্য কিছু তাজা রক্ত দরকার হয়। শত শত লোক রক্ত দিবার জন্য তাহাদের হাত বাড়াইয়া ধায়। ইঁহার অসুখের সংবাদ টেলিফোনে এত লোক জানিতে চায়, যে, তাহার জন্য বিশেষ একদল টেলিফোন অপারেটার নিযুক্ত করা হয়।

পরলোকগত মিঃ রুডল্‌ফ ভ্যালেনটিনো

ভ্যালেন্টিনোর ভক্তবৃন্দ হাসপাতালকে সকল সময় ফুলে ফুলময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিখ্যাত বায়স্কোপ-অভিনেত্রী পোলা নেগী (?) ইঁহার স্ত্রী। কিছুদিন পূর্ব্বে ইঁহাদের বিবাহ হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা সুড়ঙ্গ—

যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো শহরের ২০০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে দুইটি বৃহৎ হ্রদের জল যোগ করিবার জন্য একটি ১৫ ফিট প্রশস্ত এবং ১৩ মাইল লম্বা সুড়ঙ্গ পথ খোঁড়া হইয়াছে। পাঁচ বৎসর ধরিয়া দিবারাত্রি ক্রমাগত খোঁড়ার ফলে এই কার্য্যটি সমাপ্ত হইয়াছে। মাটি খুঁড়িয়া এই সুড়ঙ্গ পথ করিতে হইলে সময় কম লাগিত, কিন্তু সুড়ঙ্গটি আগাগোড়া কেবল লোহা অপেক্ষাও শক্ত গ্র্যানাইট পাথর কাটিয়া তৈয়ার করিতে হইয়াছে। ইহাতে খরচ পড়িয়াছে প্রায় ৫১,০০০,০০০৲ টাকা। কলের সাহায্যে এই পাথর কাটার কাজটি করিতে হয়। কার্য্যের প্রথম দিকে প্রত্যহ ১২ ফিট করিয়া পাথর কাটা হইত; কিন্তু শেষের দিকে ৩২ ফিট পর্য্যন্তও হয়। প্রায় ৩০০০ লোক দিবারাত্রি এই কাজে নিযুক্ত ছিল। যে প্রদেশে এই সুড়ঙ্গ কাটা হয়, সেখানে শীতকালে অত্যন্ত বরফ পড়ে, পথঘাট সব জমিয়া যায়। কুকুর টানা গাড়ীর সাহায্যে খাদ্য এবং চিঠিপত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। কর্ম্মীদের চিত্তবিনোদনের জন্য র‍্যাডিও সাহায্যে নানাপ্রকার গীতবাদ্য তাহাদিগকে প্রত্যহ শোনান হইত।

বেতারের সাহায্যে সুড়ঙ্গ খননের কার্য্যও পরিচালনা করিতে হইত। নভেম্বর মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটার কাজে নিযুক্ত লোকেরা লোকালয়ের সহিত সাক্ষাৎ কোন প্রকার যোগ রাখিতে পারিত না। চারিদিকে বরফের দেওয়াল। এই সময় বেতারই তাহাদের একমাত্র সম্বল। বাহিরের জগতের সহিত কথাবার্ত্তা ইত্যাদি সবই বেতারের সাহায্যে চলিত।

সুড়ঙ্গের দুই প্রান্ত হইতে কাজ আরম্ভ হয়। মাঝে আসিয়া যখন দুই দল মিলিত হইল, তখন দেখা গেল সুড়ঙ্গ মাত্র ০৩৬ ইঞ্চি বাঁকা হইয়াছে!

সুড়ঙ্গের নাম "ফ্লোরেন্স লেক টানেল"। এই সুড়ঙ্গের

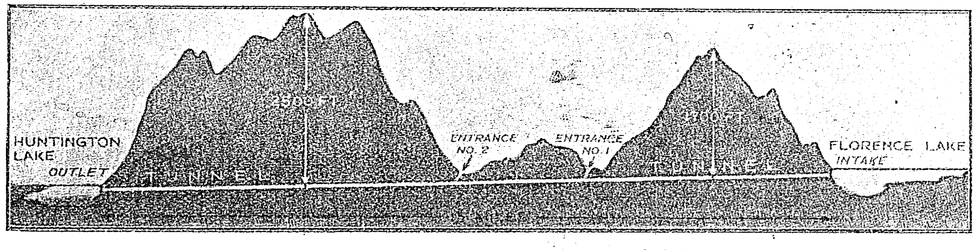

কেইসার রিজ

ফলে দুইটি বৃহৎ হ্রদ মিলিত হইল, এবং তাহার ফলে আশে-পাশের প্রদেশে তড়িৎ শক্তির পরিমাণ বহু হাজার গুণ

বেশী হইবে। ইহা ব্যবসা এবং বাণিজ্যের যে কত উন্নতি করিবে, তাহা বলা যায় না।

পৃথিবীতে এত বড় সুড়ঙ্গ আর নাই। ইহার পরেই নাম করা যায় সুইস্ আল্পসের টানেল (১২ মাইল লম্বা)।

সুগঠিত-দেহা নারী—

কুড়ি হাজার আমেরিকান্ বালিকার মধ্য হইতে মিস্ ফ্রেডি এষ্টেলি হাম্‌ফ্রিজ্‌কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর-তনু বালিকা বলিয়া বাহির করা হয়। এই বালিকার প্রত্যেকটি অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের এমন একটি চমৎকার মিল ও সামঞ্জস্য

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মিস্ ফ্রেডি হাম্‌ফ্রি

আছে যে, মনে হয় যেন কোন এক আশ্চর্য্য শিল্পী ইহাকে নিজের মানস প্রতিমার রূপে পাথর খুদিয়া গঠন করিয়াছে। গ্রীসের ভাস্করদের তৈরী কোন মূর্ত্তির দেহই এই বালিকার দেহ-সৌষ্ঠবের কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

নিউ ইয়র্কের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাসাদ—

ছবি দেখিলে মনে হয় যেন একটা ছোট খাট পর্ব্বত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমেরিকাতে বোধ হয় এত উঁচু এবং বড় আর কোন বাড়ী নাই। এই প্রাসাদের আশে পাশের সকল বড় বড় বাড়ীগুলিকে ইহার কাছে কুটীর বলিয়া মনে হয়। বিখ্যাত সিঙ্গার বিল্ডিং এই বাড়ীর কাছে দাঁড়াইতে পারে না। একটি সহরে যাহা থাকা দরকার

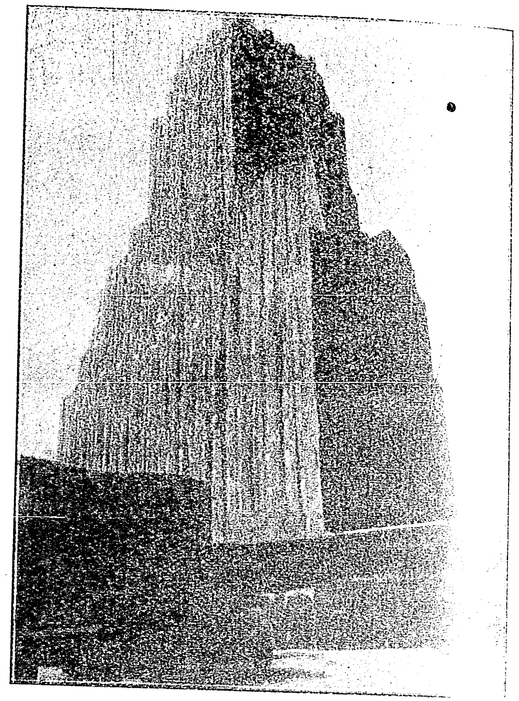

নিউইয়র্কের সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা

এবং থাকে, সমস্তই এই বাড়ীতে আছে। ইহাকে একটি সহর বলিলেও চলে।

মেয়েদের হকি খেলা—

বিলাতে এবং আমেরিকায় আজকাল মেয়েরা পুরুষদের সকল খেলা দখল করিতেছে। টেনিস খেলায় অনেক নারী আজকাল জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। মাদামোয়াজেল ল্যাং লেনের নাম এখন জগৎ-বিখ্যাত। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাও আজকাল মেয়েরা খেলিতেছে। কোমলাঙ্গী বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না মেয়েরা কোমল ভাবে এই সকল খেলা খেলে! অনেক পুরুষও নারীদের কাছে এই সব খেলায় হটিয়া যায়। ক্রমে এমন

অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের মেয়েদের হকি ম্যাচ

দিন আসিবে যখন নারীরা সকল রকম ক্রীড়াতে পুরুষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিবে। সাঁতারে নারী বর্ত্তমান সময়ে পুরুষকে অতিক্রম করিয়াছে। মেয়েদের হকি খেলার একটি ছবি দেওয়া হইল।

পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ঘোড়াকে খাওয়াইবে কি।

আমেরিকার লোকেরা পোলো খেলাকে সকলের উপযোগী করিবার জন্য বাইসাইকেল পোলো খেলা আরম্ভ

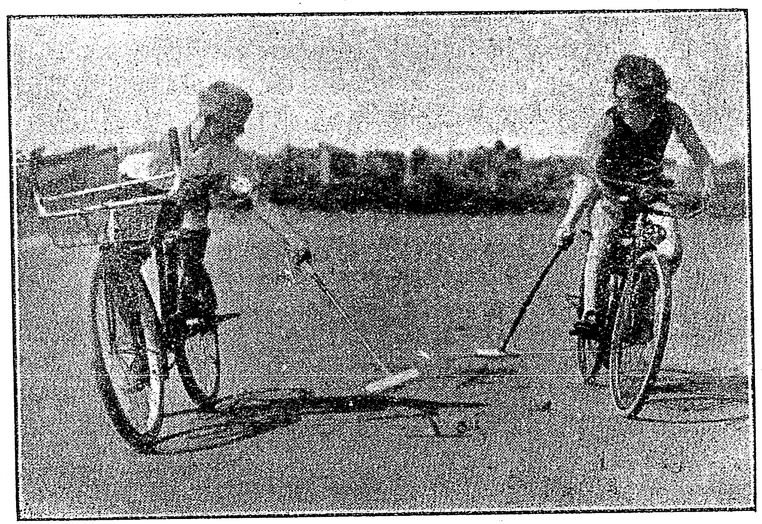

নূতন খেলা

বাইসাইকেল পোলো—

আমরা ঘোড়ায় চড়িয়া পোলো খেলা দেখিয়াছি। ইহা বড়লোকদের খেলা, কারণ গরীবরা নিজেরাই

করিয়াছে। ছেলে মেয়ে সকলেই ইহা খেলিতে পারে। ছবিতে দেখুন একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে বাইসাইকেল পোলো খেলিতেছে।

রাজ্য-পালন

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

শেষরাত্রি হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। সকালবেলার আকাশ বিধবার মত একখানি শুভ্র বসন পরিধান করিয়া আছে। পত্র-পুষ্প-লতার চক্ষু দিয়া যেন অশ্রু ঝরিতেছে। জম্বুদ্বীপের তরুণ রাজা স্মরজিৎ প্রকৃতির এই ছবি দেখিয়া করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিলেন। মনে হইল, আমার যে; সব প্রজাদের আজ ছাতা নাই, এ বৃষ্টিতে তাহাদের কত কষ্টই না ভোগ করিতে হইতেছে!

রাজা আপনার প্রাসাদ-রক্ষককে ডাকিয়া কহিলেন—"বলবন্ত, আমার প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়া এস, আমি এখনই জানিতে চাই, আমার এই রাজধানীতে কতজন এমন হতভাগ্য আছে, যাহাদের মাথায় দিবার ছাতা নাই।"

প্রাসাদ-রক্ষক তীরের মত বেগে ছুটিয়া প্রধান মন্ত্রীর আবাসে গিয়া সংবাদ দিল—"মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ এখনি জানিতে চান, এ নগরে কতগুলি লোক আছে, যাহারা ছাতা মাথায় না দিয়া হাঁটে।"

প্রধান মন্ত্রী অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া নগরপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নগরপাল ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া প্রণতিপূর্ব্বক আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন—"কতকগুলো দুষ্ট লোক মহারাজকে বুঝি বিরক্ত করিয়াছে। মহারাজ এখনি জানিতে চাহেন—কতগুলি অসভ্য লোক এ নগরে আছে, যাহাদের ছাতা নাই। আমি এত করিয়া তোমাকে সতর্ক থাকিবার পরামর্শ দিয়াছি, তাহা সত্ত্বেও তোমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়।"

নগরপাল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—"হুজুর, আপনারই উপদেশমত মহারাজের বাড়ীর চারিদিক সুন্দর পুষ্পবাটিকায় ঘেরিয়া রাখিয়াছি। সেখান হইতে বাহিরে দৃষ্টি কি প্রকারে পড়িল? আমাকে আর ঘণ্টাখানেক সময় দিন—আমি এখনি ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

নগরপাল আপনার গৃহে ফিরিয়া শান্তি-রক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শান্তিরক্ষক মুহূর্ত্তমাত্র কাল ব্যয় না করিয়া কম্পিত-কলেবরে নগরপালের সন্নিধি পৌঁছিলেন। তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে কহিলেন—'দাসকে কি জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন?' নগরপাল দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—'দাসকে কি জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন! আমি কি তোমাকে বসিয়া বসিয়া মিষ্টান্ন খাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছি? আজি তোমার কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া কাজ ছাড়িয়া দাও—তোমার :মত চাকর আমার ঢের মিলিবে।' শান্তিরক্ষক আর একবার প্রণিপাত করিয়া বলিল—'কি হইয়াছে দাসকে না বলিয়া তিরস্কার করিলে দাস কি প্রকারে বুঝিবে?'

নগরপাল একটু শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন—'নগরের কতকগুলি দুষ্ট লোকের মাথায় দিবার ছাতা নাই;—তাহারা মহারাজকে বিরক্ত করিয়াছে। মহারাজ সে রকম কতগুলি লোক আছে এই দণ্ডে জানিতে চাহিয়াছেন। পারিবে?'

শান্তিরক্ষক আর একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল—'আমি চলিলাম—শীঘ্রই আপনাকে সংবাদ দিব।'

তৎক্ষণাৎ শান্তিরক্ষকের আদেশে নগরীর চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী প্রহরী ধাবিত হইল। ছত্রহীন হতভাগ্য নরনারী যাহাকে পাইল ধরিয়া রাজধানীর কারাগারের প্রাঙ্গণে উপস্থিত করিল। তাহাদের সংখ্যা হইল সহস্রাধিক। শান্তিরক্ষকের আদেশে তাহাদের শির ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল।

বেলা ১০টা বাজিতেই প্রধান মন্ত্রী রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা [illegible] বলিলেন—'জানিয়া আসিয়াছ আমার এই নগরীতে ছত্রহীন কয়জন আছে? বল—কিছুমাত্র গোপন করিও না—আমি প্রকৃত সত্য জানিতে চাই।'

প্রধান মন্ত্রী নিবেদন করিলেন—'প্রকৃত সত্যই কহিতেছি মহারাজ। এইক্ষণে আপনার সুশাসিত রাজধানীতে এমন একটী লোক নাই, যাহার ছত্র নাই।'

রাজার মুখে আনন্দ ও তৃপ্তির আভা ফুটিয়া উঠিল। তখন বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছিল। বর্ষণ-ধৌত বৃক্ষলতা ও [illegible] সৌধরাজির উপর তপ্ত সূর্য্যকিরণ পড়িয়া তাহাদিগকে এক মধুর সৌন্দর্য্য দান করিয়াছিল।

সেই অমল-ধবল মর্ম্মর-নির্ম্মিত প্রাসাদে সুকোমল ঈষত্তপ্ত রত্নখচিত মনোরম আসনে সমাসীন হইয়া চতুর্দ্দিকের নয়ন সুখদ পুষ্পবাটিকা, শীতঘ্ন রবিকরোদ্ভাসিত কৃত্রিম প্রস্রবণ, অদূরে অন্তঃপুরের বিচিত্র হর্ম্ম্যাদি অবলোকন করিয়া রাজা ধীরে ধীরে বলিলেন—কি সুন্দর এই রাজ্য, যেখানে কাহারও কোন অভাব, কোন দৈন্য নাই,—প্রকৃতি ও বিজ্ঞান দেবতা যেখানে মুক্ত হস্তে সুখ সমৃদ্ধি দান করিতেছেন! আর এমন নগরের রাজা হইয়া ধন্য আমি!

পরদিন প্রধানমন্ত্রী, নগরপাল ও শান্তিরক্ষক তাঁহাদের কার্য্যকুশলতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য প্রচুর পুরস্কার সম্মান ও প্রকাশ্য প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন। এই গুণবান কর্ম্মচারি-ত্রয়ের বেতন রাজকোষ হইতে দ্বিগুণিত করিয়া দিবার আদেশ হইল। রাজধর্ম্মে সাহায্যকারী অস্ত্রধারী প্রহরিগণ পর্য্যন্ত রাজসম্মান ও বেতন বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইল না। রাজ্যের উৎসব ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে গতপ্রাণ লুণ্ঠিতশির হতভাগ্যগণের আত্মীয় স্বজনের কাতর ক্রন্দন কোথায় ডুবিয়া গেল!

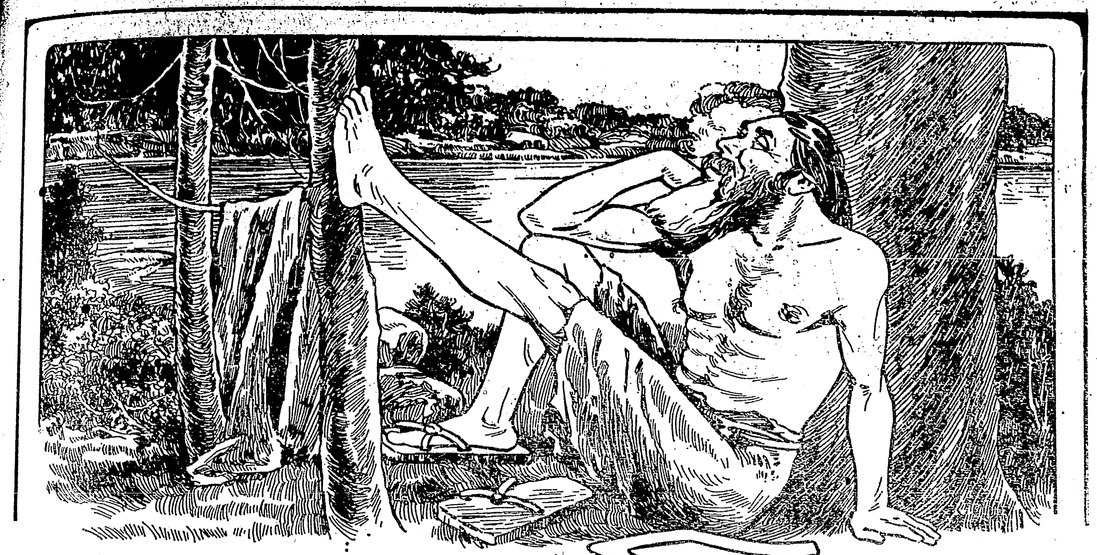

জাবালি

পরশুরাম রচিত

নারদ বিচিত্রিত

ভরতের সঙ্গে বশিষ্ঠাদি যে সকল ঋষিগণ, মহিষীগণ ও কুলপতিগণ চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ রাম অটল রহিলেন। অবশেষে মহর্ষি জাবালি বলিলেন—

রাম, তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। জীব একাকী জন্ম গ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব মাতা-পিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্তি হইয়া থাকে সে উন্মত্ত।···পিতার অনুরোধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সেই সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজ-ভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন; তিনি অন্য, তুমিও অন্য।···বৎস, তুমি স্ববুদ্ধি-দোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহা-বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃ-দেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ, কে কোথায় শুনিয়াছে যে মৃতব্যক্তি আহার করিতে পারে?···যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতি কার্য্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোক-দিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব রাম, পরলোক-সাধন ধর্ম্ম নামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্ব্ব-সম্মত বুদ্ধির অনুসরণপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।

জাবালির কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন—তপোধন, আপনি আমার হিতকামনায় যাহা কহিলেন তাহা বস্তুত অকার্য্য, কিন্তু কর্ত্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনি ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাঁহার এই কার্য্যকে যথোচিত নিন্দা

করি। বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাঁহাকে বেদ বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সঙ্গে সম্ভাষণও করিবেন না।...

জাবালি তখন বিনয়বচনে কহিলেন—রাম, আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া নাস্তিক হই, আবার অবসরক্রমে আস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত। এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত এইরূপ কহিলাম, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহা প্রত্যাহার করিতেছি। *

জাবালির কথা রামায়ণে এই পর্য্যন্ত আছে। যাহা নাই, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

মহর্ষি জাবালি ক্লান্তদেহে বিষণ্ণচিত্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সমস্ত পথ তাঁহাকে নীরবে অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কারণ অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার সংস্রব প্রায় বর্জ্জন করিয়াই চলিয়াছিলেন। খর্ব্বট খল্লাট খালিত প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে দূর হইতে নির্দ্দেশ করিয়া বিদ্রূপ করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

অযোধ্যার বিপ্রগণ কেহই জাবালিকে শ্রদ্ধা করিতেন না। স্বয়ং রাজা দশরথ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কোনো লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন রামচন্দ্র কর্ত্তৃক জাবালির প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে। সহযাত্রী বিপ্রগণের ব্যবহার দেখিয়া জাবালি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তপ্ততৈলমধ্যে মৎস্যের ন্যায় তাঁহার অযোধ্যায় বাস করা অসম্ভব হইবে।

রামচন্দ্রের উপর জাবালির কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, পরন্তু তিনি রামের ভবিষ্যতের জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ছোকরার বয়স মাত্র আটাশ বৎসর, সাংসারিক অভিজ্ঞতা এখনো কিছুমাত্র জন্মে নাই। শাস্ত্রজীবী সভাপণ্ডিতগণ এবং মুনি-পুঙ্গব বিশ্বামিত্র—যিনি এক কালে অনেক কীর্ত্তি করিয়াছেন,—ইঁহারা যেরূপ ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়াছেন, সরল-স্বভাব রামচন্দ্র তাহাই চরম পুরুষার্থ বোধে গ্রহণ করিয়াছেন।

* বাল্মীকি রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ।

বেচারাকে এর পর কষ্ট পাইতে হইবে। এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে জাবালি অযোধ্যায় নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

নগরের উপকণ্ঠে সরযূতীরে জাবালির পর্ণকুটীর। বেলা অবসান হইয়াছে। গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের এক পার্শ্বে পনসবৃক্ষতলে জাবালি-পত্নী হিঙ্গুলিনী রাত্রের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিতেছেন। নদীর পরপারবাসী নিষাদগণ যে মৃগমাংস পাঠাইয়াছিল তাহা শূল্যপক্ক হইয়াছে, এখন খান-কয়েক মোটা মোটা পুরোডাশ্ সেঁকিলেই রন্ধন শেষ হয়। হিঙ্গুলিনী যবপিণ্ড থাসিতে থাসিতে নানাপ্রকার সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁর এতখানি বয়স হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পুত্রমুখ দেখিলেন না। স্বামীর পুন্নাম নরকের ভয় নাই, পরলোকে পিণ্ডেরও ভাবনা নাই,—ইহলোকে দু' বেলা নিয়মিত পিণ্ড পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। পৌত্রমুখের কথা তুলিলে বলেন—পুত্রের অভাব কি, যখন যা'কে ইচ্ছা পুত্র মনে করিলেই হয়। কিবা কথার শ্রী! স্বামী যদি মানুষের মতন মানুষ হইতেন তাহা হইলে হিঙ্গুলিনীর অত খেদ থাকিত না। কিন্তু তিনি একটি সৃষ্টি-বহির্ভূত লোক, কাহারো সহিত বনাইয়া চলিতে পারিলেন না। সাধে কি লোকে তাঁকে আড়ালে পাষণ্ড বলে! ত্রিসন্ধ্যা নাই, জপতপ নাই, অগ্নিহোত্র নাই, কেবল তর্ক করিয়া লোক চটাইতে পারেন। অমন যে রামচন্দ্র, ব্রাহ্মণ তাঁকেও চটাইয়াছে। যতদিন দশরথ ছিলেন, অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাই। বৃদ্ধ রাজা স্ত্রৈণ ছিলেন বটে, কিন্তু নজরটা তাঁর উচ্চ ছিল। এখন কি হইবে ভবিতব্যতাই জানেন। ভরত ত নন্দিগ্রামে পাদুকা-পূজা লইয়া বিব্রত। সচিব সুমন্ত্র এখন রাজকার্য্য দেখিতেছে; কিন্তু সে অত্যন্ত কৃপণ, ঘোড়ার বল্‌গা টানিয়া তার সকল বিষয়েই টানাটানি করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রাজবাটী হইতে যে সামান্য বৃত্তি পাওয়া যায় তা'তে এই দুর্ম্মূল্যের দিনে সংসার চলেনা। হিঙ্গুলিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন সত্যযুগে এক কপর্দ্দকে সাত কলস খাঁটি হৈয়ঙ্গবীন মিলিত, কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে মাত্র তিন কলস পাওয়া যায়, তাও ভঁয়সা। ঘৃতের জন্য জাবালির কিছু ঋণ হইয়াছে, কিন্তু শোধ করার ক্ষমতা নাই। নীবার ধান্য যা সঞ্চিত ছিল ফুরাইয়া

আসিয়াছে, পরিধেয় জীর্ণ হইয়াছে, গৃহে অর্থাগম নাই, এদিকে জাবালি শত্রুসংখ্যা বাড়াইতেছেন। স্বামীর সংসর্গ-দোষে হিঙ্গুলিনীও অনাচারে অভ্যস্ত হইয়াছেন। অযোধ্যার নিষ্ঠাবতীগণ তাঁকে দেখিলে শূকরীর ন্যায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে। হিঙ্গুলিনী আর সহ্য করিতে পারেন না; আজ তিনি আহারান্তে স্বামীকে কিছু কটুবাক্য শুনাইবেন।

অঙ্গনের বাহিরে হুঙ্কার করিয়া কে বলিল—হংহো জাবালে, হংহো! হিঙ্গুলিনী ত্রস্তা হইয়া দেখিলেন দশ-বারোজন ক্ষুদ্রকায় ঋষি কুটীর-দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের খর্ব্ব বপু বিরল শ্মশ্রু ও স্ফীত উদর দেখিয়া হিঙ্গুলিনী বুঝিলেন তাঁহারা বালখিল্য মুনি।

হিঙ্গুলিনী কহিলেন—হে মহাতপা মুনিগণ, আমার স্বামী সরযূতটে ধ্যানস্থ আছেন। তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, আপনারা ততক্ষণ ঐ কুটীর-অলিন্দে আসন-গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করুন।

বালখিল্যগণের অগ্রণী মহামুনি খর্ব্বট কহিলেন—ভদ্রে, তোমার ঐ অলিন্দ ভূমি হইতে বিতস্তি-ত্রয় উচ্চ, আমরা নাগাল পাইব না। অতএব এই প্রাঙ্গণেই আসন-পরিগ্রহ করিলাম, তুমি ব্যস্ত হইও না।

জাবালি তখন সরযূ-তীরে জম্বুবৃক্ষতলে আসীন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন—এই অন্নজলাবলম্বী মানব-শরীরে পঞ্চভূতের কিম্বিধ সংস্থান হইলে সুবুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা মূর্খতা জন্মে। অপরন্তু, লাঠ্যৌষধি দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূত প্রকম্পিত করিলে মূর্খতা অপগত হইয়া যে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা স্থায়ী কিনা। এই জটিল তত্ত্বের মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া অবশেষে জাবালি উঠিয়া পড়িলেন এবং আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

জাবালি বালখিল্যগণকে কহিলেন—অহো, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে খর্ব্বট খল্লাট খালিত প্রভৃতি মহামুনিগণ আমার এই আশ্রমে সমাগত। হে মুনিবৃন্দ, তোমাদের ত সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? যাগ-যজ্ঞাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে ত? ঋষিভুক্ রাক্ষসগণ তোমাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করে না ত? তোমাদের সেই কপিলা গাভীটির বাচ্চা হইয়াছে?• রাজগুরু বশিষ্ঠ তোমাদের জন্য যথেষ্ট গব্য-দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন ত?

মহামুনি খর্ব্বট দর্দ্দুর-ধ্বনিবৎ গম্ভীরনাদে কহিলেন—জাবালে, ক্ষান্ত হও। আপ্যায়নের জন্য আমরা আসি নাই। তুমি পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া আছ, আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। প্রায়োপবেশন-চান্দ্রায়নাদি দ্বারা তোমার কিছু হইবে না। আমরা অথর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে তোমাকে অগ্নিশুদ্ধ করিব, তাহাতে তুমি অন্তে পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে। তুষানল প্রস্তুত, তুমি আমাদের অনুগমন কর।

জাবালি বলিলেন—হে খর্ব্বট, তোমাদিগকে কে পাঠাইয়াছেন? রাজ-প্রতিভূ ভরত, না রাজগুরু বশিষ্ঠ? আমার উদ্ধার-সাধনের জন্য তোমরাই বা অত ব্যগ্র কেন? আমি অতি নিরীহ বানপ্রস্থাবলম্বী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, কখনো কাহারো অনিষ্ট করি নাই, তোমাদের প্রাপ্য দক্ষিণারও অংশভাক্ হই নাই। তোমরা আমার পরকালের জন্য ব্যস্ত না হইয়া নিজ নিজ ইহকালের জন্য যত্নবান হও।

তখন অতিকোপনস্বভাব খল্লাট ঋষি অশ্বধ্বনিবৎ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—রে তপোধন, তুমি অতি দুরাচারী ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক। তোমার বাসহেতু এই অযোধ্যাপুরী অশুচি হইয়াছে, ধর্ম্মাত্মা বিপ্রগণ অতিষ্ঠ হইয়াছেন। আমরা ভরত বা বশিষ্ঠ কাহারো আজ্ঞাবাহী নহি। ব্রাহ্মণ্যের রক্ষাহেতু আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি। তুমি আর বাক্যব্যয় করিও না, প্রস্তুত হও।

জাবালি বলিলেন—হে বালখিল্যগণ, আমি স্বেচ্ছায় যাইব না। তোমরা আমাকে ব্রহ্মতেজোবলে উত্তোলন কর।

জাবালির শালপ্রাংশু বিরাট বপু দেখিয়া বালখিল্যগণ কিয়ৎক্ষণ নিম্নকণ্ঠে জল্পনা করিলেন। অবশেষে গলিত-দন্ত খালিত স্খলিতস্বরে কহিলেন—হে জাবালে, যদি তুমি অগ্নি-প্রবেশ করিতে নিতান্তই ভীত হইয়া থাক তবে প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ক্রয় স্বরূপ তিন শূর্প তিল ও শত নিষ্ক কাঞ্চন প্রদান কর। আমরা যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে পাপমুক্ত করিব।

জাবালি কহিলেন—আমার এক কপর্দ্দকও নাই, থাকিলেও দিতাম না।

তখন খর্ব্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ সমস্বরে কহিলেন—রে নরাধম, তবে আমরা অভিসম্পাত করিতেছি শ্রবণ কর। সাক্ষী চন্দ্র সূর্য্য তারা, সাক্ষী দেবগণ পিতৃগণ বষট্‌কারগণ—

জাবালি বলিলেন—শৌণ্ডিকের সাক্ষী মদ্যপ, তস্করের

সাক্ষী গ্রন্থি-ছেদক। হে বালখিল্যগণ, বৃথা দেবতাগণকে আহ্বান করিতেছ, তাঁরা আসিবেন না। বরং তোমরা জুজুগণ ও কর্ণকর্ত্তকগণকে স্মরণ কর।

হিন্দ্রলিনী বলিলেন—হে আর্য্যপুত্র, তুমি কেন এই অল্পায়ু অপোগণ্ড অকালপক্ক কুষ্মাণ্ডগণের সঙ্গে বাগ্-বিতণ্ডা করিতেছ, উহাদিগকে খেদাইয়া দাও।

রে রে রে রে—

বালখিল্যগণ কহিলেন—রে রে রে রে—

জাবালি তখন তাঁহার বিশাল ভুজদ্বয়ে বালখিল্যগণকে একে একে তুলিয়া ধরিয়া প্রাঙ্গণ-বেষ্টনীর পরপারে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।

বালখিল্যগণ প্রস্থান করিলে জাবালি বলিলেন—প্রিয়ে, আমাদের আর অযোধ্যায় বাস করা চলিবে না, কখন কোন্ দিক হইতে উৎপাত আসিবে তার স্থিরতা নাই। অতএব কল্য প্রত্যূষেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে কোনো নিরুপদ্রব স্থানে যাত্রা করিব।

পরদিন ঊষাকালে সস্ত্রীক জাবালি অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন। কয়েকজন অনুগত নিষাদ তাঁহাদের সামান্য গৃহোপকরণ বহন করিয়া অগ্রে অগ্রে পথ-প্রদর্শন পূর্ব্বক চলিল। মাসাধিক কাল তাঁহারা নানা জনপদ গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিমালয়ের সানুদেশে শতদ্রুতীরে এক রমণীয় উপত্যকায় উপনীত হইলেন। জাবালি তথায় পর্ণকুটীর রচনা করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতবাসী কিরাতগণ তাঁহার বিশাল দেহ, নিবিড় শ্মশ্রু ও মধুর সদয় ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং নানাপ্রকার উপঢৌকন দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিল। জাবালি তথায় বিবিধ দুরূহ তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধানে নিবিষ্ট রহিলেন এবং অবসরকালে শতদ্রু নদীতে মৎস্য ধরিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।

দেবতাগণের খ্যাতি আছে—তাঁহারা অন্তর্যামী। কিন্তু বস্তুত তাঁহাদিগকেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয় এবং তাহার ফলে জগতে অনেক অবিচার ঘটিয়া থাকে। অচিরে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট সমাচার আসিল যে মহাতেজা জাবালি মুনি শতদ্রু-তীরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন,—তাঁহার অভিসন্ধি

কি, তাহা এখনও সম্যক্ অবধারিত হয় নাই; তবে সম্ভবত তিনি ইন্দ্রত্ব বিষ্ণুত্ব কিম্বা ঐরূপ কোনো একটা পরম-পদ আয়ত্ত না করিয়া ছাড়িবেন না। দেবরাজ চিন্তিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন—উর্ব্বশীকে ডাক।

মাতলি আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—হে দেবেন্দ্র, উর্ব্বশী আর মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে চাহে না—

ইন্দ্র কহিলেন—হুঁ, তার ভারি তেজ হইয়াছে।

আবার নৃত্য সুরু করিলেন।

দেবর্ষি নারদ কহিলেন—মর্ত্ত্যের কবিগণই স্তুতি করিয়া তার মস্তকটি ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন কিছুকাল তাকে বিরাম দাও, দিনকতক অমরাবতীতে আবদ্ধ থাকিলে আপনিই সে মর্ত্ত্যলোকে যাইবার জন্য আব্‌দার ধরিবে। জাবালির জন্য অন্য কোনো অপ্সরা পাঠাও।

মাতলি বলিলেন—মেনকা তার কন্যাকে দেখিতে

গিয়াছে। তিলোত্তমাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এখনো তিনমাস বাহির হইতে দিবেন না। অলম্বুষার পা মচ্‌কাইয়াছে, নাচিতে পারিবে না। অষ্টাবক্র মুনি দেবগণের উপর বিমুখ হইয়া বাঁকিয়া বসিয়াছেন, রম্ভা তাঁকে সিধা করিতে গিয়াছে। নাগদত্তা হেমা সোমা প্রভৃতি তিনশত অপ্সরাকে লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ করিয়াছেন। বাকী আছে কেবল মিশ্রকেশী ও ঘৃতাচী।

ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমাকে না জানাইয়া কেন অপ্সরাগণকে যত্র তত্র পাঠানো হয়? মিশ্রকেশী ঘৃতাচীর বয়স হইয়াছে, তাদের দ্বারা কিছু হইবে না।

নারদ বলিলেন—হে ইন্দ্র, সেজন্য চিন্তা করিও না। জাবালিও যুবা নহেন! একটু গৃহিণী-বাহিনী-জাতীয়া অপ্সরাই তাঁকে ভালরকম বশ করিতে পারিবে।

ইন্দ্র বলিলেন—মিশ্রকেশীর চুল পাকিয়াছে, সে থাক্। ঘৃতাচীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। তাকে একপ্রস্থ সূক্ষ্ম চীনাংশুক ও যথোপযুক্ত অলঙ্কারাদি দাও। বায়ু, তুমি মৃদুমন্দ বহিবে। শশধর, তুমি মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া উজ্জ্বল হইয়া লও। কন্দর্প, তুমি সেই অভ্রের পোষাকটা পরিয়া যাইবে, আবার যাতে ভস্ম না হও। বসন্ত, তুমি সঙ্গে একশত কোকিল লইবে।

নারদ বলিলেন—আর একশত বন্যকুক্কুট। ঋষি বড়ই মাংসাশী।

ইন্দ্র বলিলেন—আচ্ছা, তাহাও লইবে। আর দশ কুম্ভ ঘৃত, দশ স্থালী দধি, দশ দ্রোণী গুড় এবং অন্যান্য ভোজ্য-সম্ভার। যেমন করিয়া হোক জাবালির ধ্যান ভঙ্গ করা চাই।

সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে ঘৃতাচী জাবালি-বিজয়ে যাত্রা করিলেন।

জাবালির তপোবনে তখন ঘোর বর্ষা। মেঘে পর্ব্বতে একাকার হইয়া দিগন্তে নিবিড় প্রাচীর রচনা করিয়াছে। শতদ্রুর গৈরিকবর্ণ জলে পালে পালে মৎস্য বিচরণ করিতেছে। বনে ভেকবংশের চতুর্প্রহরব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ঘৃতাচী সাঙ্গোপাঙ্গসহ জাবালির আশ্রমে পৌঁছিলেন। আক্রমণের উদ্‌যোগ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, কারণ বহুবার এইরূপ অভিযান করিয়া তাঁহারা পরিপক্ক হইয়াছেন। নিমেষের মধ্যে মেঘ দূরীভূত হইল, মলয়ানিল বহিতে লাগিল, শতদ্রুর স্রোত মন্দীভূত হইল, নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিল, পাদপসকল পুষ্পস্তবকে ভূষিত হইল, অলিকুল গুঞ্জরিতে লাগিল, ভেকগণ নীরব হইয়া পল্বলে লুকাইল।

জাবালি শতদ্রু-তীরে ছিপহস্তে নিবিষ্টমনে মাছ ধরিতেছিলেন। আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে তিনি বিচলিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। সহসা ঋতুরাজ বসন্তের খোঁচা খাইয়া নিদ্রাতুর কোকিলকুল আকুল চীৎকার করিয়া উঠিল। জাবালি চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা কটিতটে বামকর, চিবুকে দক্ষিণকর নিবদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতেছে।

ধীমান জাবালি সমস্ত ব্যাপারটি চট্ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ঈষৎ হাস্যে বলিলেন—অয়ি বরাঙ্গনে, তুমি কে, কি নিমিত্তই বা এই দুর্গম জনশূন্য উপত্যকায় আসিয়াছ? তুমি নৃত্য সম্বরণ কর। এই সৈকতভূমি অতিশয় পিচ্ছিল ও উপল-বিষম। যদি আছাড় খাও তবে তোমার ঐ কোমল অস্থি আস্ত থাকিবে না।

অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ স্ফুরিত করিয়া ঘৃতাচী কহিলেন—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি ঘৃতাচী স্বর্গাঙ্গনা। তোমাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। এই সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার তোমারই। এই ঘৃতকুম্ভ দধিস্থালী গুড়দ্রোণী—সকলি তোমার। আমিও তোমার। আমার যা' কিছু আছে—নাঃ, থাক্।—এই পর্য্যন্ত বলিয়া লজ্জাবতী ঘৃতাচী ঘাড় নীচু করিলেন।

জাবালি বলিলেন—অয়ি কল্যাণি, আমি দীন হীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। গৃহিণীও বর্ত্তমানা। তোমার তুষ্টি বিধান করা আমার সাধ্যের অতীত। অতএব তুমি ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া যাও। অথবা যদি তোমার নিতান্তই মুনি-ঋষির প্রতি ঝোঁক হইয়া থাকে তবে অযোধ্যায় গমন কর। তথায় খর্ব্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ আছেন; তাঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা এবং যতগুলিকে ইচ্ছা তুমি হেলায় তর্জ্জনী-হেলনে নাচাইতে পারিবে। আর যদি তোমার অধিকতর উচ্চাভিলাষ থাকে তবে ভার্গব দুর্ব্বাসা কৌশিক প্রভৃতি অনল-সঙ্কাশ উগ্রতেজা মহর্ষিগণকে জব্দ করিয়া যশস্বিনী হও। আমাকে ক্ষমা দাও।

ঘৃতাচী কহিলেন—হে জাবালে, তুমি নিতান্তই নীরস। তোমার ঐ বিপুল দেহ কি বিধাতা শুষ্ক কাষ্ঠে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? তুমি দীন হীন তাতে ক্ষতি কি, আমি তোমাকে কুবেরের ঐশ্বর্য্য আনিয়া দিব। তোমার ব্রাহ্মণীকে বারাণসী প্রেরণ কর। তিনি নিশ্চয়ই লোলাঙ্গী বিগতযৌবনা। আর আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর,—চিরযৌবনা, নিটোলা, নিখুঁতা। উর্ব্বশী মেনকা পর্য্যন্ত আমাকে দেখিয়া ঈর্ষায় ছট্‌ফট্ করে।

জাবালি সহাস্যে কহিলেন—হে সুন্দরি, কিছু মনে করিও না। তুমিও নিতান্ত খুকীটি নহ। তোমার মুখের

লোধ্ররেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপংক্তিতে ও কিসের ফাঁক?

ঘৃতাচী সরোষে কহিলেন—হে মূর্খ, তুমি নিশ্চয়ই রাত্রান্ধ, তাই অমন কথা বলিতেছ। পথশ্রমের ক্লান্তিহেতু আমার লাবণ্য এখন সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। আগে সকাল হোক্, আমি দুধের সর মাখিয়া চান করি, তখন দেখিও, মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে।—এই বলিয়া ঘৃতাচী আবার নৃত্য সুরু করিলেন।

অদূরবর্ত্তী দেবদারুবৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া জাবালি-পত্নী সমস্ত দেখিতেছিলেন। ঘৃতাচীর দ্বিতীয়বার নৃত্যারম্ভে তিনি আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সম্মার্জ্জনী হস্তে ছুটিয়া আসিয়া ঘৃতাচীর পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

তখন কন্দর্প বসন্ত শশধর মলয়ানিল সকলেই মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন। আকাশ আবার জলদজালে আচ্ছন্ন হইল, দিঙ্‌মণ্ডল তিমিরাবৃত হইল, কোকিলকুল চুলিতে লাগিল, মধুকরনিকর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিল, শতদ্রু স্ফীত হইল, ভেককুল মহা উল্লাসে বিকট কোলাহল করিয়া উঠিল।

জাবালি পত্নীকে কহিলেন—প্রিয়ে, স্থিরাভব। ইনি স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী, ইন্দ্রের আদেশে এখানে আসিয়াছেন,—ইঁহার অপরাধ নাই।

হিঙ্গুলিনী কহিলেন—হলা দগ্ধাননে নির্লজ্জে ঘেঁচি, তোর স্পর্দ্ধা কম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস! আর, ভো অজ্জউত্ত, তোমারই বা কি প্রকার আক্কেল যে এই উৎকপালী বিড়ালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে!

জাবালি তখন সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিয়া অতি কষ্টে পত্নীকে প্রসন্না করিলেন এবং রোরুদ্যমানা ঘৃতাচীকে বলিলেন—বৎসে, তুমি শান্ত হও। হিঙ্গুলিনী তোমার পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ ইঙ্গুদী তৈল মর্দ্দন করিয়া দিলেই ব্যথার উপশম হইবে। তুমি আজ রাত্রে আমার কুটীরেই বিশ্রাম কর। কল্য অমরাবতীতে ফিরিয়া গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ এবং ঘৃত-দধি-গুড়াদির জন্য বহু ধন্যবাদ জানাইও।

ঘৃতাচী কহিলেন—তিনি আমার মুখ-দর্শন করিবেন না। হা, এমন দুর্দ্দশা আমার কখনো হয় নাই।

জাবালি বলিলেন—তোমার কোনো ভয় নাই। তুমি দেবেন্দ্রকে জানাইও যে ইন্দ্রত্বের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতে থাকুন।

ঘৃতাচীর পরাভব শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে কহিলেন—হে দেবর্ষে, এখন কি করা যায়? জাবালি ইন্দ্রত্ব চাহেন না জানিয়াও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। জনরব শুনিতেছি যে ঐ দুর্দ্দান্ত ঋষি সমস্ত দেবতাকেই উড়াইয়া দিতে চায়।

নারদ কহিলেন—পুরন্দর, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।

নৈমিষারণ্যে সনকাদি ঋষিগণের সকাশে দেবর্ষি নারদ আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—হে মুনিগণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ, পাপ নাস্তি। কিন্তু এই ত্রেতাযুগে পুণ্য ত্রিপাদ মাত্র এবং একপাদ পাপও দেখা দিয়াছে। ইহার হেতু কি তোমরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?

মুনিগণ বলিলেন—আশ্চর্য্য, ইহা আমরা কেহই ভাবিয়া দেখি নাই।

তখন নারদ বলিলেন—তবে তোমাদের যাগ যজ্ঞ জপ তপ সমস্তই বৃথা।—ইহা কহিয়া তিনি তাঁহার কাষ্ঠ-বাহনে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট অপর এক ষড়যন্ত্র করিতে প্রস্থান করিলেন।

মুনিগণ নারদীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী প্লবাদি সপ্তদ্বীপ হইতে বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্রগণ নৈমিষারণ্যে সমবেত হইলেন। মহর্ষি জাবালিও আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন।

অনন্তর সকলে আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—ভো পণ্ডিতবর্গ, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ ছিল, এখন তাহা ত্রিপাদ হইয়াছে। কেন এমন হইল এবং ইহার প্রতিকার কি, যদি তোমরা কেহ অবগত থাক তবে প্রকাশ করিয়া বল।

তখন জ্বলন্ত পাবকতুল্য তেজস্বী জামদগ্ন্য মুনি কহিলেন—হে প্রজাপতে, এই পাপাত্মা জাবালিই সমস্ত অনিষ্টের মূল। উহার সংস্পর্শে বসুন্ধরা ভারগ্রস্তা হইয়াছেন।

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন—ঠিক, ঠিক, আমরা তাহা অনেকদিন হইতেই জানি।

জামদগ্ন্য কহিলেন—এই জাবালি ভ্রষ্টাচারী উন্মার্গগামী নাস্তিক। ইহার শাস্ত্র নাই, মার্গ নাই। রামচন্দ্রকে এই পাষণ্ডই সত্যধর্ম্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বালখিল্য-গণকে এই দুরাত্মাই নির্য্যাতিত করিয়াছে। দেবরাজ পুরন্দরকেও এই পাপিষ্ঠ হাস্যাস্পদ করিয়াছে। ইহাকে বধ না করিলে পুণ্যের নষ্টপাদ উদ্ধার হইবে না।

পণ্ডিতগণ কহিলেন—আমরাও ঠিক তাহাই ভাবিতে-ছিলাম।

দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—হে জাবালে, সত্য করিয়া কহ তুমি নাস্তিক কিনা। তোমার মার্গ কি, শাস্ত্রই বা কি।

জাবালি বলিলেন—হে সুধীবৃন্দ, আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি, আমার তুচ্ছ অভাব অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনোপ্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্র তত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্ত্তন-সহ।

দক্ষ কহিলেন—তোমার কথার মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝিলাম না।

জাবালি বলিলেন—হে ছাগমুণ্ড দক্ষ, তুমি বুঝিবার বৃথা চেষ্টা করিও না। আমি এখন চলিলাম। বিপ্রগণ, তোমাদের জয় হোক।

তখন সভায় ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল এবং ধর্ম্মপ্রাণ বিপ্রগণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কয়েকজন জাবালিকে ধরিয়া ফেলিলেন। জামদগ্ন্য তাঁহার তীক্ষ্ণ কুঠার উদ্যত করিয়া কহিলেন—আমি একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষ করিয়াছি, এইবার এই নাস্তিককে সাবাড় করিব।

স্থিরপ্রজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—হাঁ হাঁ কর কি, ব্রাহ্মণের দেহে অস্ত্রাঘাত। ছি ছি, মনু কি মনে করিবেন! বরং উহাকে হলাহল প্রয়োগে বধ কর।

মহাচীন হইতে আনীত কৃষ্ণবর্ণ হলাহল জলে গুলিয়া জাবালিকে জোর করিয়া খাওয়ানো হইল। তারপর তাঁহাকে গভীর অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিলোকদর্শী পণ্ডিতগণ কহিলেন—পাষণ্ড এতক্ষণে কুম্ভীপাকে পৌঁছিয়াছে।

চৈনিক হলাহল জাবালির মস্তিষ্কে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

জাবালি যজ্ঞের নিমন্ত্রণে বহুবার সোমরস পান করিয়াছেন; প্রথম-যৌবনে বয়স্য ক্ষত্রিয়কুমারগণের পাল্লায় পড়িয়া গৌড়ী মাধ্বী পৈষ্টী প্রভৃতি আসবও চাখিয়া দেখিয়াছেন; ছেলেবেলায় মামারবাড়ীতে একবার ভৃগু-মামার সঙ্গে চুরি করিয়া ফেনিল তালরসও খাইয়াছিলেন,—কিন্তু এমন প্রচণ্ড নেশা পূর্ব্বে তাঁহার কখনো হয় নাই। জাবালির সকল অঙ্গ নিশ্চল হইয়া আসিল, তালু শুষ্ক হইল, চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিল, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল।

সহসা জাবালি অনুভব করিলেন তিনি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া রক্তমাল্যধারণ পূর্ব্বক গর্দ্দভ-যোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে নীয়মান হইতেছেন। রক্তবসনা পিঙ্গলবর্ণা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃত-বদনা রাক্ষসী তাঁহার রথ আকর্ষণ করিতেছে। ক্রমে বৈতরণী পার হইয়া তিনি যমপুরীর দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় যমকিঙ্করগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ধর্ম্মরাজের সকাশে লইয়া গেল।

যম কহিলেন—জাবালে, স্বাগতোঽসি, আমি বহুদিন যাবৎ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তোমার পারলৌকিক ব্যবস্থা আমি যথোচিত করিয়া রাখিয়াছি, এখন আমার অনুগমন কর। দূরে ঐ যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গবাক্ষহীন অগ্ন্যুদ্গারী সৌধমালা দেখিতেছ, উহাই রৌরব; ইতর-প্রকৃতি পাপীগণ তথায় বাস করে। আর সম্মুখে এই যে গগনচুম্বী তাম্রচূড় রক্তবর্ণ অলিন্দ-পরিবেষ্টিত আয়তন, ইহাই কুম্ভীপাক; সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এখানে অবস্থান করেন। তোমার স্থান এখানেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভিতরে চল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যম জাবালিকে কুম্ভীপাকের গর্ভমণ্ডপে লইয়া গেলেন। এই মণ্ডপ বহুযোজনবিস্তৃত, উচ্চ ছাদ, বাষ্পসমাকুল, গম্ভীর আরাবে বিধুনিত। উভয় পার্শ্বে জ্বলন্ত

রে নারকী যমরাজ

চুল্লীর উপর শ্রেণীবদ্ধ অতিকায় কুম্ভসকল সজ্জিত আছে। তাহা হইতে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ বাষ্প ও আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে। নীলবর্ণ যমকিঙ্করগণ ইন্ধন-নিক্ষেপের জন্য মধ্যে মধ্যে চুল্লীদ্বার খুলিতেছে, জ্বলন্ত অনলচ্ছটায় তাহাদের মুখ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছে।

কৃতান্ত কহিলেন—হে মহর্ষে, এই যে রজতনির্ম্মিত কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত সুবৃহৎ কুম্ভ দেখিতেছ, ইহাতে নহুষ যযাতি দুষ্মন্ত প্রভৃতি মহাযশা মহীপালগণ পরিপক্ক হইতেছেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই সংশোধিত হইয়া গিয়াছেন, কেবল যযাতির কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আর এক প্রহরের মধ্যে সকলেই বিগতপাপ হইয়া অমরাবতীতে গমন করিবেন। ঐ যে বৈদূর্য্যখচিত হিরণ্ময় কুম্ভ দেখিতেছ, উহার তপ্ত তৈলে

ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকেন। গৌতমের অভিশাপের পরে সহস্রাক্ষ পুরন্দরকে বহুকাল এই কুম্ভমধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন অগ্নি-প্রয়োগে ইহার তলদেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে রুদ্রাক্ষমালাবেষ্টিত গৈরিকবর্ণ প্রকাণ্ড কুম্ভ দেখিতেছ, ইহার অভ্যন্তরে ভার্গব, দুর্ব্বাসা, কৌশিক প্রভৃতি উগ্রতপা মহর্ষিগণ সিদ্ধ হইতেছেন।

বৎস আমি প্রীত হইয়াছি

জাবালি কৌতূহল-পরবশ হইয়া বলিলেন—হে ধর্ম্মরাজ, কুম্ভের ভিতরে কি হইতেছে দয়া করিয়া আমাকে দেখাও।

ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা পাইয়া জনৈক যম-কিঙ্কর কুম্ভের আবরণী উন্মুক্ত করিল। যম তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ দারুময় দর্ব্বী নিমজ্জিত করিয়া সন্তর্পণে উত্তোলিত করিলেন। সিক্তজটাজুট, ধূমান্বিত-কলেবর কয়েকজন ঋষি দর্ব্বীতে সংলগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত আরম্ভ করিলেন—রে নারকী যমরাজ, যদি আমাদের কিঞ্চিদপি তপঃপ্রভাব থাকে—

দর্ব্বী উল্টাইয়া কুম্ভের ঢাকনী ঝটিতি বন্ধ করিয়া যম কহিলেন—হে জাবালে, এই কোপনস্বভাব ঋষিগণের কাঠিন্য দূর হইতে এখনো বহু বিলম্ব আছে। ইঁহারা আরো অষ্টাহকাল পরিসিদ্ধ হইতে থাকুন।

এমন সময় কয়েকজন যমদূতের সহিত খর্ব্বট খল্লাট খালিত বিষণ্ণবদনে কুম্ভীপাকের গর্ভগৃহে প্রবেশ

জাবালি কহিলেন—হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানে কেন, ব্রহ্মলোকে কি স্থানাভাব ঘটিয়াছে?

খর্ব্বট উত্তর দিলেন—জাবালে, তুমি বিরক্ত করিও না, আমরা এখানে তদারক করিতে আসিয়াছি।

যমরাজের ইঙ্গিতে কিঙ্করগণ বালখিল্যত্রয়কে একত্র বাঁধিয়া উত্তপ্ত পঞ্চগব্যপূর্ণ এক ক্ষুদ্রকায় কুম্ভে নিক্ষেপ করিল। কুম্ভ হইতে তীব্র চীৎকার উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতান্তের বাপান্তকর বাক্যসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন—হে মহর্ষে, এই নরকের অনুষ্ঠানসকল অতিশয় অপ্রীতিকর, কেবল বিপন্না ধরিত্রীর রক্ষা হেতুই আমাকে সম্পন্ন করিতে হয়। যাহা হউক, আমি আর তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না, এখন তোমার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই পালন করিব। দেখ, যে পাপ মনের গোচর তাহা আমি সহজেই দূর করিতে পারি। কিন্তু যাহা মনের অগোচর, তাহা জন্ম-জন্মান্তরেও সংক্রামিত হয়, এবং তাহা শোধন করিতে হইলে কুম্ভীপাকে বার বার নিষ্কাশন আবশ্যক। তোমার যাহা কিছু দুষ্কৃত আছে তাহা তুমি জানিয়া শুনিয়াই দৌর্ব্বল্যবশাৎ করিয়া ফেলিয়াছ, কদাপি আত্ম-প্রবঞ্চনা কর নাই। সুতরাং আমি তোমাকে সহজেই পাপমুক্ত করিতে পারিব, অধিক যন্ত্রণা দিব না।

এই বলিয়া কৃতান্ত জাবালিকে সুবৃহৎ লৌহসংদংশে বেষ্টিত করিয়া একটি তপ্ত তৈলপূর্ণ কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ছ্যাক্ করিয়া শব্দ হইল।...

সহস্র বিহগ-কাকলীতে বনভূমি সহসা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। প্রাচীদিক্ নবারুণকিরণে আরক্ত হইয়াছে। জাবালি চৈতন্যলাভ করিয়া সাধ্বী হিঙ্গুলিনীর অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন বদনে মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।

জাবালি বলিলেন—হে পিতামহ, ঢের হইয়াছে। আর বরে কাজ নাই। আপনি সরিয়া পড়ুন, আর জ্বালাইবেন না।

লোকপিতামহ বলিলেন—জাবালে, অভিমান সম্বরণ কর। তুমি বর না চাহিলেও আমি ছাড়িব কেন? আমিও প্রার্থী। হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশঃবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না, লোক-সমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হোক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন কর। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না, অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানব-মনকে সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাক।

জাবালি বলিলেন—তথাস্তু।

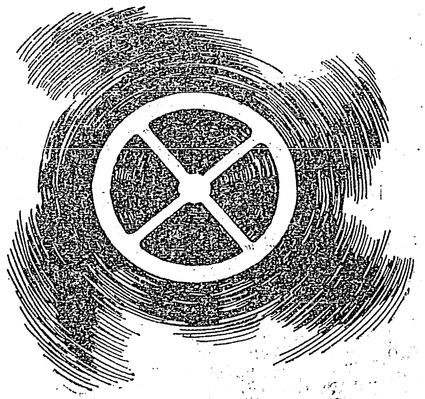

পাহাড়পুরের স্তূপ

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

জগতের প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পে ভারতের স্থান কোথায়, তাহার উত্তর না দিয়াও এ কথা আজ নিঃসঙ্কোচেই বলা যায় যে, ভারতবর্ষ এই শিল্পটিতে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলিতেও দ্বিধা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না যে, সময় বা কালের প্রভাব তাহার এ শিল্পটার যতটা সর্ব্বনাশ না করিয়াছে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী করিয়াছে বিদেশী বিজয়ীদের নিষ্ঠুরতা।

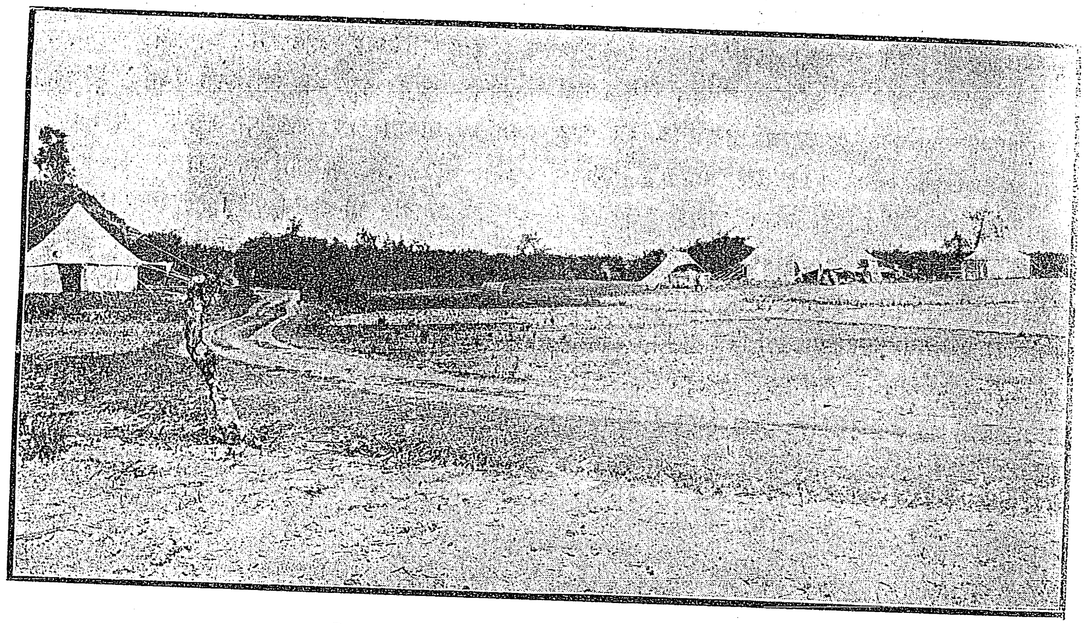

নূর নদীর বর্ত্তমান গর্ভ—দূরে পাহাড়পুরের মন্দিরের স্তূপ

ভারতবর্ষে বহু স্থানে খনন করিয়া ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধ-শিল্পের যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, এখন তাহাই উদ্ধার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে তক্ষশিলা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, কৌশম্বী, কাশী, কুশীনগর প্রভৃতি স্থান খুঁড়িয়া যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সমজ্‌দারদের লেখনী তাহারই প্রশংসায় আজ মুখরিত।

বাংলায় এ ধরণের শিল্পোদ্ধারের চেষ্টা এতদিন ছিল না। কেবল সম্প্রতি পাহাড়পুরে এ চেষ্টা প্রথম সুরু হইয়াছে। এখনও খননের কাজ শেষ হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই সেখানে যে সমস্ত জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাংলার শিল্প-পরিচয়ের দিক হইতে এবং জাতীয় ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার দিক হইতে তাহা অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাহাড়পুরের এই স্তূপের বিষয় লইয়া ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মাথার টনক অনেক আগেই নড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মার্টিনের 'ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে। ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন ইহার এমন একটা বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন, যাহা হইতে ইহার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনটা স্পষ্ট হইয়াই ধরা পড়ে। তাঁহার পর দিনাজপুরের কলেক্টর মিঃ ই-ডি-ওয়েষ্টম্যাকট ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক

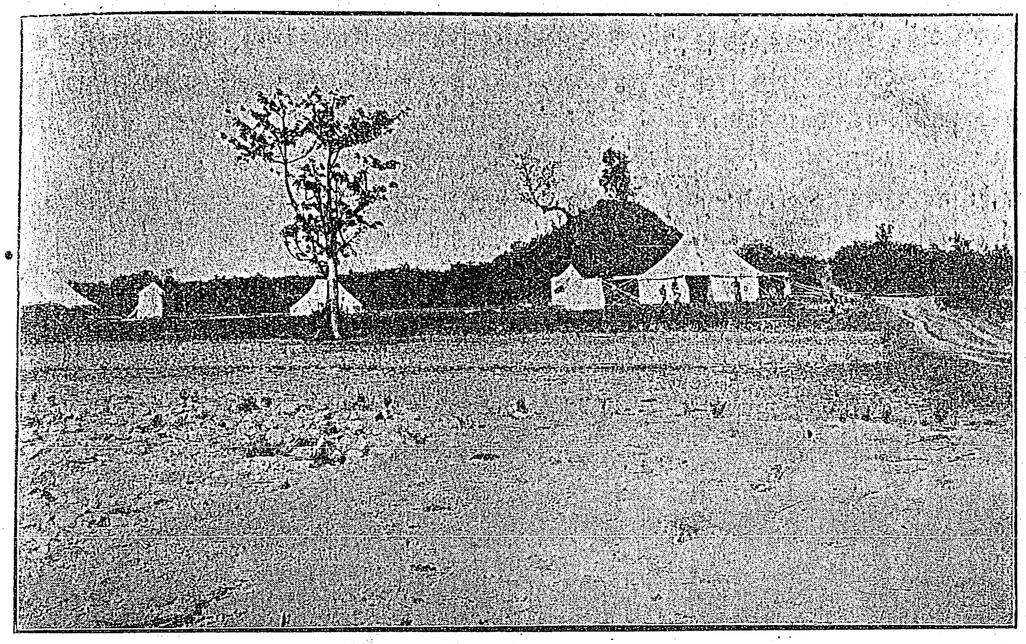

নূর নদীর গর্ভ হইতে পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ—দূরে প্রধান মন্দিরের ধ্বংসের স্তূপ

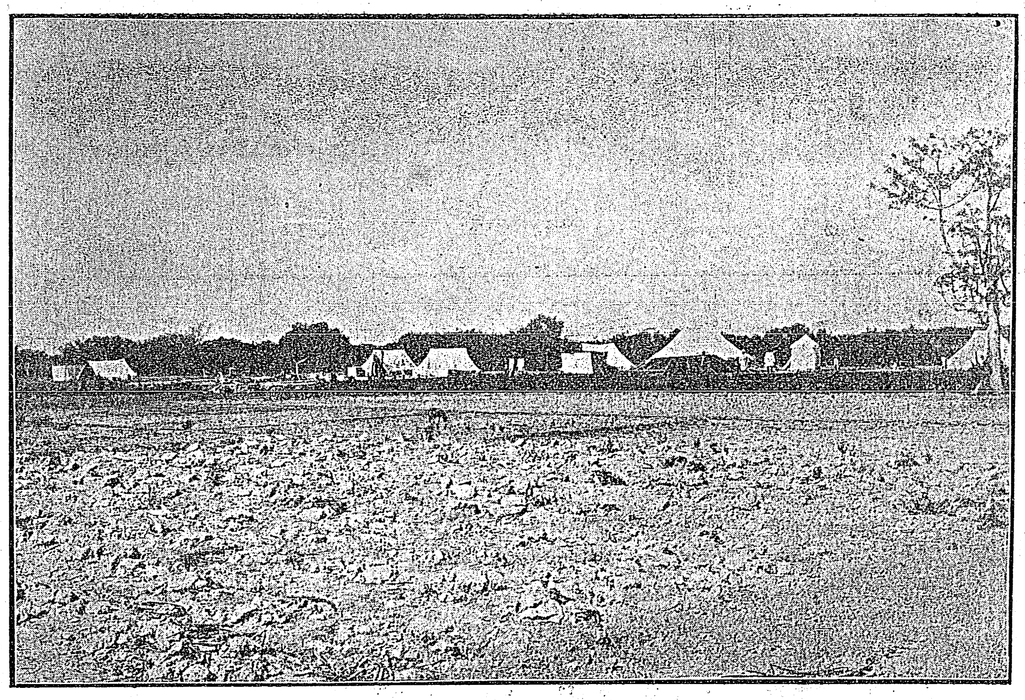

নূর নদীর গর্ভ হইতে পাহাড়পুর মন্দিরের বাহিরের প্রাকার

সোসাইটির জার্ণালে' এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার পর স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহামও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্থানটি পরিদর্শন করিয়া আসেন। তাঁহার রিপোর্ট ক্ষুদ্র হইলেও বহু আবশ্যকীয় আলোচনায় পরিপূর্ণ ছিল।

সুতরাং স্থানটি যে বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইবার যোগ্য, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার অনুসন্ধানের কাজ যথেষ্ট তৎপরতার সহিত আরম্ভ হয় নাই। যে কাজ বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, তাহা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র তিন বৎসর আগে—১৯২৩ খৃষ্টাব্দে।

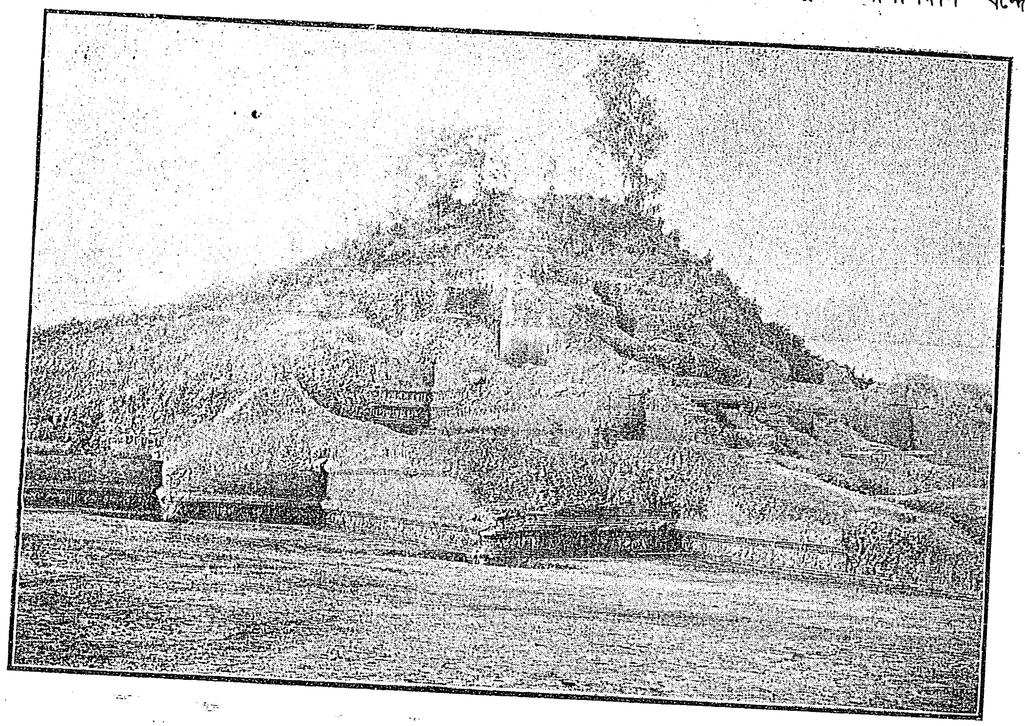

পাহাড়পুর স্তূপের দৃশ্য—(উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্ব হইতে গৃহীত)

এই খননের কাজ সম্বন্ধে তিনজন লোকের নিষ্ঠা এবং আগ্রহ বিশেষ ভাবেই প্রশংসনীয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই এবং শ্রীযুক্ত রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এই তিন মহারথীর নাম ইহার খননের উদ্যোগ-পর্ব্বের সঙ্গে চিরদিনের জন্য যুক্ত হইয়া থাকিবে।

প্রথমবারে ইহার খননের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের নিকট হইতে ২৫০০৲ টাকা এবং গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ২০০০৲ টাকার অর্থ-সাহায্য পাইয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকার ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে খননে ব্রতী হন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাহা পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আবার কাজ সুরু হইয়াছিল। এবার ভার লইয়াছিলেন—ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ নিজে। বরেণ্য প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবারকার খননের কাজ চলিয়াছিল। ইহাতে যে সমস্ত বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ভারতের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিবে।

পাহাড়পুর রাজসাহী জেলার একেবারে উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। এখন ইহাকে রাজসাহীর বাদলগাছি থানার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের জামালপুর ষ্টেশনে নামিয়া এখানে যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে ইহার ব্যবধান ৪ মাইল মাত্র। সমৃদ্ধির দিনে করতোয়া নদীর

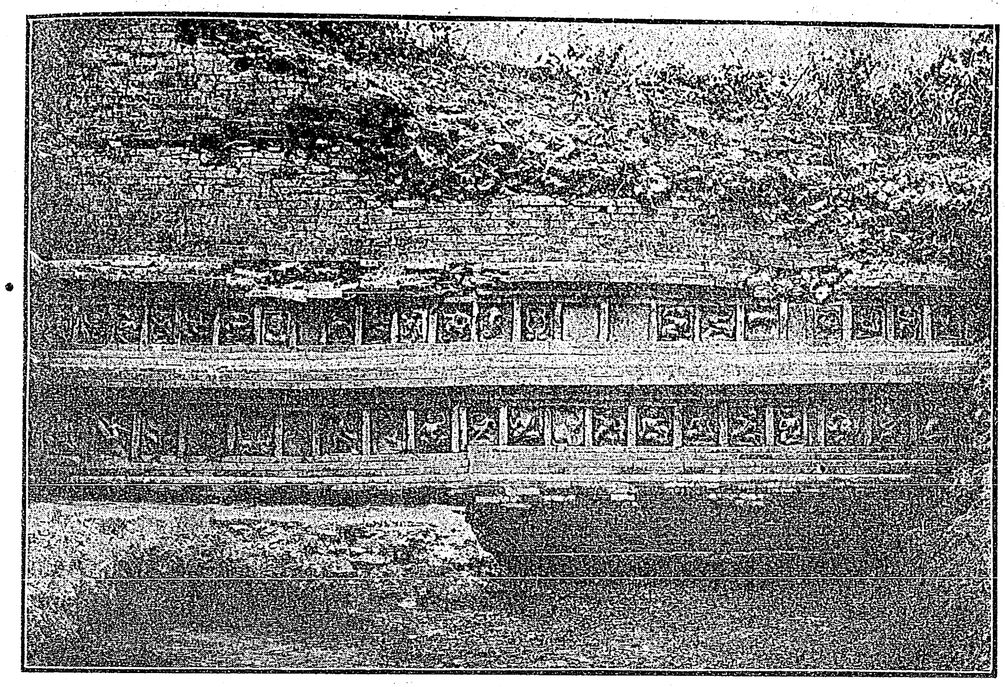

মধ্যভাগের মন্দিরের চারিপার্শ্বের প্রাকার

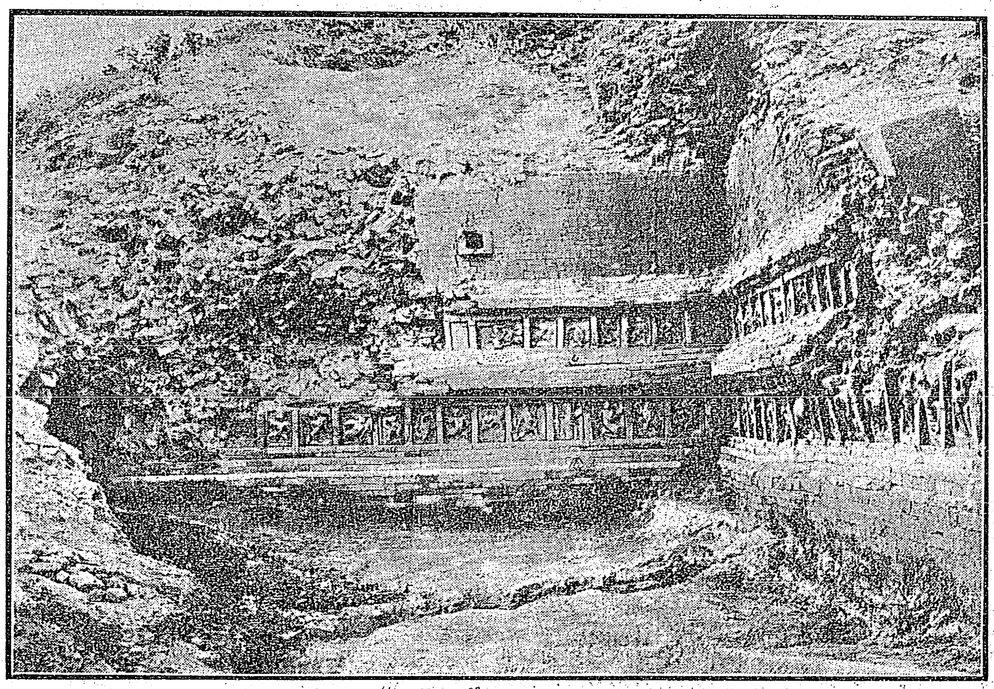

মধ্যভাগের বেষ্টনী-প্রাঙ্গণ

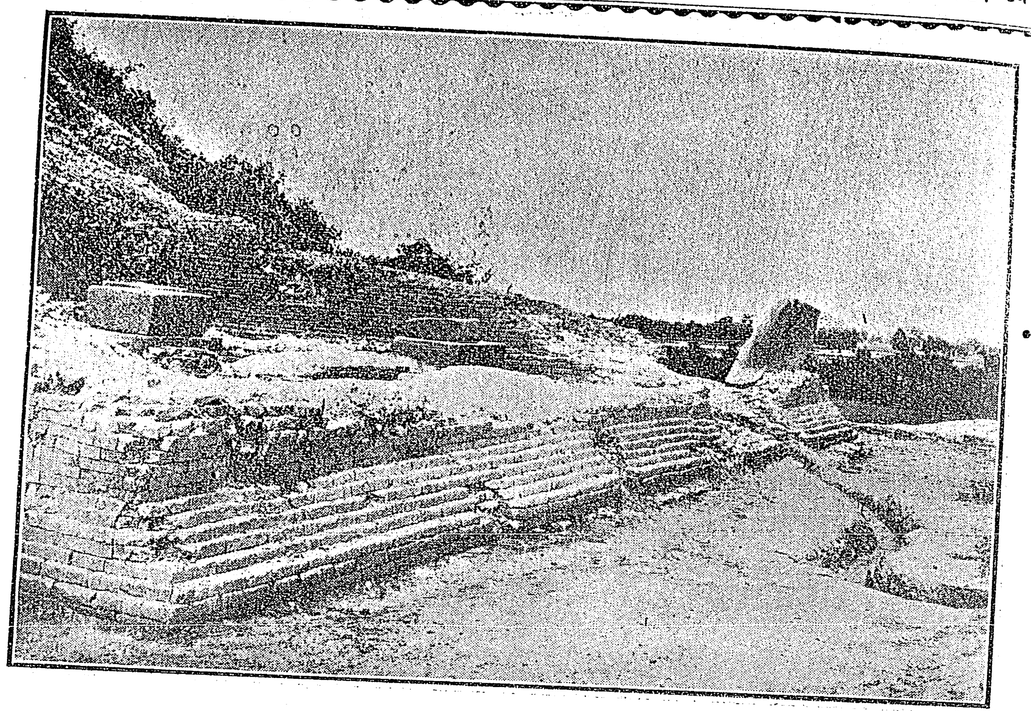

উত্তর দিকের মণ্ডপের সম্মুখভাগ

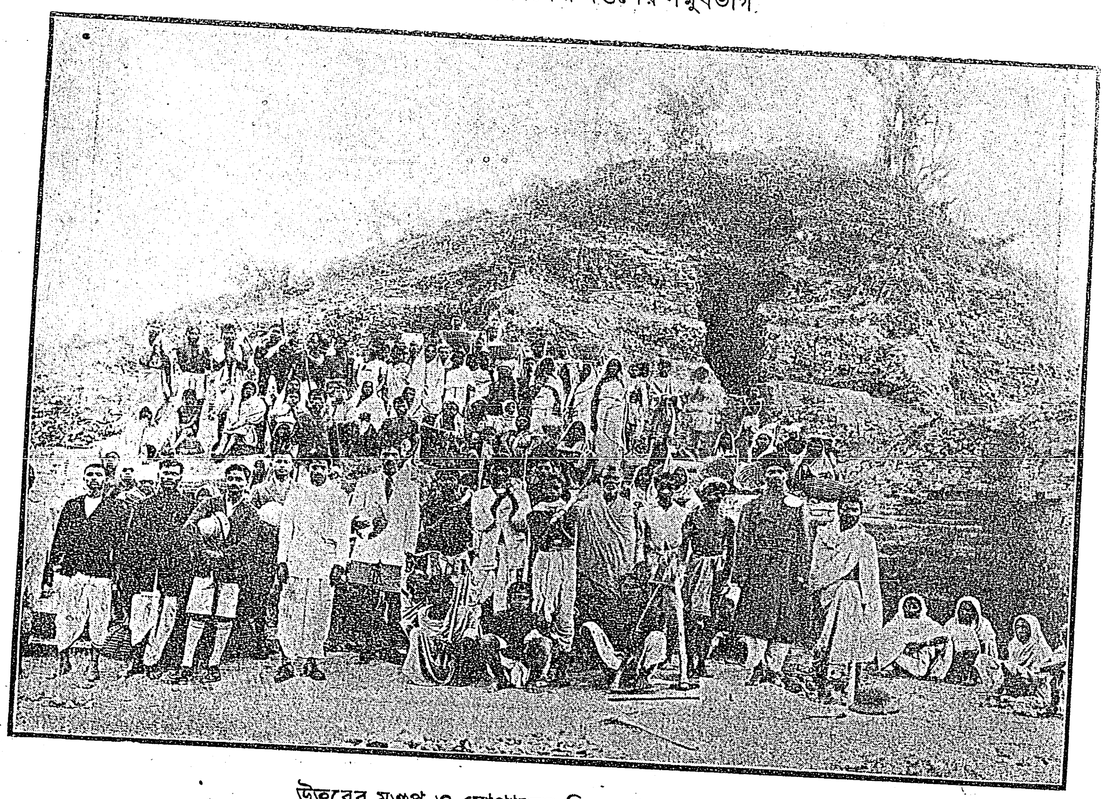

উত্তরের মণ্ডপ ও সোপানের নিম্নে পাহাড়পুরের খনকগণ

একটি শাখা ইহার পদতল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। এ নদী এখন শুষ্ক। স্থানীয় লোকেরা এ নদীর নাম দিয়াছিল নুর নদী। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর ইহার উপর একটি ঘাটের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার পাহাড়ের মত বিরাট স্তূপ হইতেই সম্ভবতঃ ইহার নাম হইয়াছে পাহাড়পুর।

এই স্তূপটি একটি প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ গড়ের ভিতর

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠিত। গড়ের চারি দেয়ালের প্রত্যেকটিরই মধ্যস্থলে একটি করিয়া তোরণ ছিল। তোরণগুলির ভিতর উত্তর দিকের তোরণটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

মধ্যস্থলের স্তূপটি একটি বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে খনন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অন্যান্য জিনিষের সহিত দুইটি প্রস্তর-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের একটিতে রাজা মহেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ মহেন্দ্র সম্ভবতঃ প্রতীহার-সম্রাট মহেন্দ্র পাল। মহেন্দ্র পাল আনুমানিক ৮৯০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, মুঙ্গেরের যুদ্ধের পর বিহার পাল-রাজাদের করচ্যুত হইয়া প্রতীহারদের করতলগত হইয়াছিল। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতীহার-সম্রাট ভোজ পাল রাজা নারায়ণ পালকে মুঙ্গের-যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রথম মহেন্দ্র পাল এবং প্রথম ভোজের অনুশাসন-লিপি দক্ষিণ বিহারের বহু স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরের এই শিলালিপিটি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সমস্ত উত্তর-বঙ্গ পালদের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতীহারদের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল এবং প্রতীহার-সাম্রাজ্য আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই শিলালিপিগুলিতে দেখা যায় যে মহেন্দ্র পালের রাজত্বকালে পাহাড়-পুরের এই মন্দিরটির সংস্কার করা হইয়াছিল। সংস্কারের পরিচয় ইহার বিভিন্ন ধরণের ইষ্টকের ভিতর দিয়াও ধরা পড়ে। সুতরাং পাহাড়পুরের মন্দিরটি নবম শতকেরও অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই নবাবিষ্কৃত মন্দিরটি এ যুগের এক অপূর্ব্ব আবিষ্কার। ইহার গঠন, ইহার পরিকল্পনা একেবারে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। এ ধরণের মন্দির হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন-স্থাপত্যের ভিতর আর কোথাও চোখে পড়ে না। নর, বানর, হংস, মৎস্য, কুক্কুট, কচ্ছপ, সিংহ, হস্তী প্রভৃতি নানা জীবের ছাঁচে ইষ্টক তৈরী করিয়া তাহার দ্বারাই এ মন্দির গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এ ধরণের ইষ্টকও আর কোনো স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শের ভিতর পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া এগুলি শিল্প ও কারু-নৈপুণ্যেরও চরম নিদর্শন।

সরলা

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ

১

ভবশঙ্কর কবিরাজের কপাল ভাল!—ছেলেটি মূর্খ, গোঁয়ার; মেয়েটী একটু আড়-পাগল; আর জামাইটি পাঁড় মাতাল! অদৃষ্টাকাশে এই ত্রাহস্পর্শের সংঘটন সত্ত্বেও ভবশঙ্কর মেয়েটীকে ভালবাসিতেন এবং সেই সঙ্গে খানিকটা শ্রদ্ধাও করিতেন। ছেলে-জামাইয়ের আচরণে তাঁহাকে যেমন মধ্যে মধ্যে লজ্জিত, মর্ম্মাহত হইতে হইত, সরলার পাগলামীর জন্য তাঁহাকে তেমন কখনও হইতে হয় নাই। বরং অনেক সময় মেয়ের পাগলামী তাঁহাকে মহত্ত্বের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।—অর্থাভাবে রোগী ঔষধের মূল্য দিতে অক্ষম বলিয়া ভবশঙ্কর তাহাকে ঔষধ দেন নাই। সরলা জানিতে পারিয়া, তাহাকে গোপনে অর্থ দিয়া পিতার কাছে পাঠাইয়া দিল। পরদিন ভবশঙ্কর সংসার-খরচের তহবিল মিলাইতে গিয়া দেখেন, যে পরিমাণ অর্থ তিনি সেই নিঃস্ব রোগীর নিকট হইতে ঔষধের মূল্য স্বরূপ আদায় করিয়াছিলেন, সেই পরিমাণ অর্থই তাঁহার তহবিলে কম পড়িতেছে। অনুমানে জানিলেন, তাঁহার পাগল মেয়ে বাপের দাবী মিটাইবার জন্য তাঁহারই বাক্সের চাবি খুলিয়া সেই দরিদ্রকে সাহায্য করিয়াছে! শুধু কি এই এক-রকম পাগলামী সরলার?—রান্নাশালের রকে ছোট-বড় দুইটা ঘটি ছিল, ভিখারী ভিক্ষা করিতে আসিয়া সুযোগ দেখিয়া একটা লইয়া চলিয়া গেল। সরলা উপর হইতে তাহা দেখিয়াও কোন কথা বলিল না। পরে ঘটির খোঁজ পড়িলে সরলা জানাইল—"দুপুর বেলা একটা ভিখিরী নিয়ে গেছে।" সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"ভিখিরী নিয়ে গেছে কি রে?...তা তুই কিছু বল্লি নি?...অমন মস্ত ঘটিটা..." সরলা কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—"ওমা! বড় ঘটিটা নিয়ে গেছে?.. আমার মনে হ'ল যেন ছোট্‌টা নিয়ে গেল। তবে বোধ হয় তার বড় ঘটিরই দরকার ছিল।" সকলে সরলার বুদ্ধির সৎকার করিতে লাগিল।

সরলার পাখী পুষিবার সখ—বে-তর। কিন্তু কোন পাখীই সাত দিনের বেশী সরলার আতিথ্য স্বীকার করিত না। পাখী কিনিয়া দু-তিন দিন পরেই সরলা খাঁচা খুলিয়া দিয়া পরীক্ষা করিত—পাখী পোষ মানিল কি না। এই বোকামীর জন্য তাহাকে কেহ কিছু বলিলে, সরলা বলিত, যে-পাখী দু-তিন দিনেও পোষ না মানে, সে কোন জন্মেও পোষ মানিবে না। সুতরাং তাকে খাঁচায় পুরিয়া রাখিয়া লাভ?

সরলার এইরূপ মতিগতিতে তার পিতা প্রকাশ্যে কোন রকম সায় না দিলেও, মনে মনে তিনি খুসী হইতেন না। তাঁর ধারণা, মেয়ের এই রকম কাণ্ডকারখানা দেখিয়াই তাকে তার শ্বশুরবাড়ীর কেহ পছন্দ করে না। মেয়ে যদি একটু চালাক চতুর হইত, তবে কি স্বামী অমন বিগড়াইয়া যায়, না, তা এমন বার মাস বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখে?

২

"বলি সরি, তোর এ কাণ্ডখানা কি বল্ দেখি?"—

সরলাও মাতার কথার ঝঙ্কারে সুর চড়াইয়া বলিল—"আমার আবার কাণ্ডখানা কি দেখলে?"

"তা নয় ত কী...বেলা দুটো বাজতে যায়, তবু জ্ঞের দেখা নেই...এত পাড়া-বেড়ান অভ্যেস্ ভাল নয়, সরি..."

"আহা, আমি বুঝি পাড়া-বেড়াতে গিছলুম?—আমি তো বাগ্দী পিসীর বাড়ী ছিলুম!"

"কি মহাভারত শুনছিলে, শুনি,—যে নাওয়া-খাওয়ার কথা মনে ছিল না?"

"মা, তুমি যদি সেখানে যেতে, তুমিও নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে যেতে!"

"কি এমন দুগ্‌গোচ্ছব হচ্চিল—শুনি?"

"দুগ্‌গোৎসব নয় মা,—ওদের ছোট বৌ প্রসব-বেদনায় যা কষ্ট পাচ্ছিল—মা!"

"তা ওদের ছোট বৌ কষ্ট পাচ্ছিল, তুই তার কি করবি?...তুই দাই, না, ডাক্তার?"

"দাই ডাক্তার না হলে বুঝি আর কিচ্ছু করা যায় না? এই তো আমি গিয়ে দেখি—তারা একটা আনাড়ি দাইয়ের হাতে দিয়ে বৌটাকে শুধু কষ্টই দিচ্ছিল।...

মাতা গম্ভীর ভাবে বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"তা—তুই গিয়ে কি করলি?...পাকা দাই সেজে ছেলে প্রসব করিয়ে দিলি?"

"আহা তা কেন, আমি ডাক্তার ডাক্‌তে বল্লুম। তাতে তারা বল্লে—তাদের অত টাকা নেই! তখন আমি গিয়ে ডাক্তারের বউয়ের হাতে-পায়ে ধরে বিনা ভিজিটে ডাক্তার আনালুম।"

মেয়ের হৃদয়ের পরিচয়ে মাতা তুষ্ট হওয়া দূরে থাক্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তোর কি মান-অপমান জ্ঞান কিচ্ছু নেই, সরি?...পরের জন্যে আর একজনের পায়ে-হাতে ধরার দরকার কি ছিল—শুনি?"

"আহা, মা, তারা বড্ড গরীব...ডাক্তার না এলে বৌটা নিশ্চয়ই মরে যেত!"

"মরে যেত, না, আর কিছু!...তোর যত সব বাড়া-বাড়ি!...আসল কথা, তুই একটা হুজুক নিয়ে এ পাড়া ও-পাড়া করতে ভালবাসিস! হলি-ই বা ঝিউড়ী, তা বলে কি লাজ-লজ্জা সব বিসর্জ্জন দিতে হয়—আসুন উনি!"

৩

সেই বছর অসহযোগের একটা বড় রকম ঢেউ আসিয়া ভবশঙ্করদের মহকুমায় বিষম গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়া বসিল। উচ্চ-ইংরেজী ইস্কুলটী প্রায় ছাত্রশূন্য হইয়া হেলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; কলেজ স্থাপনের উৎকট চেষ্টায় চাঁদা তোলা অর্দ্ধেক পথে থামিয়া গেল! ডাক্তার গুহের বৈদ্যুতিক বক্তৃতার আগুনে মা-লক্ষ্মীদের এক এক সুট বিলাতী-সেমিজ শাড়ী ব্লাউজ বডি ভস্মীভূত হইয়া গেল। আব্‌কারী দোকানে আর উকীল-মোক্তারের আস্তানায় যথাক্রমে মাতাল ও মক্কেলের অভাবে হা-হাকার উঠিল। হেম দত্তের সাত-পুরুষের বিলাতী-বস্ত্রের দোকানখানা দেখিতে দেখিতে স্বদেশী লেবেল-আঁটা বিলাতী সুতার গুদামে পরিণত হইল। গাঁয়ের হরিসভায় জাতীয় বিদ্যালয় জমকাইয়া উঠিল। ভবশঙ্করের বৈঠকখানার পাশের ঘরে জমীদার-বাড়ীর ভাঙা চেয়ার টেবিলে সুসজ্জিত কংগ্রেস আপিস খদ্দরের দোকান ঘাড়ে করিয়া দেখা দিল। জমীদার-পুত্র প্রাজাপত্য বি-এ ডিগ্রি লাভ করার পর হইতে সারস্বত বি এ ডিগ্রি লাভে বীতশ্রদ্ধ হইয়া লেখাপড়া ত্যাগ করিবার অছিলা অন্বেষণ করিতেছিলেন, এই সুযোগে তিনি কলেজ-ত্যাগ করিয়া 'ত্যাগী' ডিগ্রি পাইয়া কংগ্রেস আপিসের কর্ণধার হইয়া বসিলেন। শ্রীনিবাস অধিকারী ওকালতীতে উপবাস করিতেছিল। সে, এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে—বুঝিয়া চলিতে পারিলে—বেশ দু-পয়সা করা যায় শুনিয়া, দীর্ঘ উপবাসের পর পারণের আশায় অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া 'বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী' রূপে পথে-ঘাটে মহাত্মার বাণী বিলাইতে লাগিল। অসহযোগ ভাল-না-মন্দ লইয়া আজন্ম বন্ধুতে বন্ধুতে মতের অমিল হইতে মনের অমিল দাঁড়াইল। এক কথায়, দামোদরে বন্যার ন্যায় 'অসহযোগের' ঢেউ আসিয়া সব ওলট-পালট করিয়া দিল।

'অসহযোগে'র অঙ্গে সাবেক 'স্বদেশী'র গন্ধ থাকায়, ভবশঙ্কর দেখিলেন, তাঁহার স্বদেশী কবিরাজী ঔষধের—বিশেষতঃ তাঁহার "জ্বরান্তকচূর্ণ" নামে বর্ণান্তর-প্রাপ্ত বিলাতী কুইনিনের কাট্‌তি খুব বাড়িয়া গেল! সুতরাং তিনি অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ হইয়া পড়িলেন।

একদিন সরলা বলিল—"বাবা আমি 'ডলী' দিদির সঙ্গে খদ্দর বিক্রী করতে যাব!"

"কোথায় রে?"

"এই পাড়ার মেয়েদের কাছে।"

"মোট ঘাড়ে করে?"

"তাতে কি?...ডলীদি' তিন্‌টে পাশ করেছেন,—তিনিও মোট নিয়ে বাড়ী-বাড়ী ফিরি করে বেড়াবেন!"

"তাই না কি?...আচ্ছা, তা যাস!"

৪

সংসারের সঙ্কীর্ণ কাজে সরলার সহায়তা পাওয়া সুলভ না হইলেও, দেশের কাজে সে মাতিয়া উঠিল। সে আহার বিশ্রাম ভুলিয়া গ্রামে গ্রামে খদ্দরের মোট ঘাড়ে করিয়া ঘুরিতে লাগিল। অধিনেত্রী 'ডলীদিদি' সরলার কাজের ঝোঁকে হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। সে বেচারা কয়-বছর কলেজে পড়িয়া কেবল যে নামের প্রান্তে উপাধির অক্ষর গাঁথিয়া আনিয়াছে তাহা নয়, সেই সঙ্গে অম্ল, অজীর্ণতা, হিষ্টিরিয়া (মূর্চ্ছা) প্রভৃতি কয়েকটী সভ্য ব্যাধির আধার হইয়া আসিয়াছে। কাজেই অত পরিশ্রম তাহার সহ্য হইবে কেন? এ অবস্থায় 'অবরোধ অঞ্চলে' খদ্দর প্রচারে অধিনেত্রী হইল—সরলাই!

এক দিন সরলা এক কংগ্রেস ছোকরাকে সঙ্গে লইয়া

কোন দরিদ্র পল্লীতে খদ্দর প্রচার করিতে গেল। গিয়া দেখিল—এক বৃদ্ধার চালে খড় নাই, লজ্জানিবারণের উপযুক্ত পরিধেয় বস্ত্রেরও সংস্থান নাই। বৃদ্ধার দুরবস্থার পরিচয়ে কংগ্রেসকর্ম্মী তাহাকে চরকার উপযোগিতা সম্বন্ধে লেকচার দিতে গেলে সরলা বলিল—"ও-সব থাক্, তুমি একখানা কাপড় একে বা'র করে দাও।"

কর্ম্মী বিস্মিত ভাবে বলিল—"ও কি আর এই দেড়া দামের কাপড় কিন্‌তে পারবে?"

"বিক্রী নয়,—অমনি—"

"অমনি!" কর্ম্মী চমকাইয়া উঠিল।

"হাঁ—অমনি।" এই বলিয়া সে বৃদ্ধাকে কাপড়খানা ও খদ্দর বিক্রয়ের তহবিল হইতে চারি আনা পয়সা দিয়া বলিল—"এই নাও, আমি আর এক দিন আবার আসব।"

এই অপরিচিতা করুণাময়ীর অযাচিত দানে বৃদ্ধার চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"রাজরাণী হও মা!"

কংগ্রেস-কর্ম্মী ভাবিল—এ তো দেখছি মুস্কিল করবে! কংগ্রেসের পয়সা এই রকম বাজে কাজে নষ্ট করলেই হয়েছে—আর কি! সে সরলার কাছে গিয়া মৃদুস্বরে বলিল "এ সব গরীব দুঃখীর দিকে চাইতে গেলে কংগ্রেসের কাজ কিন্তু এগুবে না!—আপনি চলে আসুন!"

আশ্চর্য্য ও ঈষৎ বিরক্তির স্বরে সরলা বলিল—"কি রকম? গরীব-দুঃখীর দিকে চাইতে গেলে কংগ্রেসের কাজ চলবে না? ওরা কি দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি নয়?"

কংগ্রেসের ছোকরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আপনার তাহলে দেখচি কংগ্রেসের কাজের সম্বন্ধে ক্লিয়ার আইডিয়া (স্পষ্ট ধারণা) নেই!—কংগ্রেসের আসল কাজ হচ্চে—গওর্মেণ্টের সঙ্গে নন্‌ভায়লেণ্ট ফাইট্ করে'—দেশের স্বরাজ আদায় করা!···স্বরাজ এলেই দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য সব ঘুচে যাবে!"

"আর যত দিন স্বরাজ না আসে?"

"ততদিন দুঃখদৈন্য ভোগ করতেই হবে আমাদের! কংগ্রেস তার কি করবে বলুন?"

সরলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"তাহলে বল, কংগ্রেস হচ্চে—পাইকারী দোকান···খুচরা খরিদ্দারের ঠাঁই সেখানে নেই!"

"তা কি করে থাক্‌তে পারে—বলুন?···ব্রিটিশ গওর্মেণ্টের মত শক্তিশালী পক্ষের সঙ্গে যাকে পাল্লা দিতে হবে, তার কি খুচরো দুঃখদৈন্যের দিকে নজর দেবার সময় আছে, না, সে পারে?"

"সময়ও আছে, শক্তিও যে নেই, তা নয়···! আসলে নেই—মরজি! এই দেখ না, ব্রিটিশ গওর্মেণ্টও তো তোমাদের নিয়ে কম নাস্তানাবুদ হচ্চে না, কিন্তু তাই তারা তো এ দেশের মঙ্গলের জন্য যে কটা কাজ আরম্ভ করেছিল, তা তো বন্ধ করে দেয়নি?"

"তা'রা কি, ভাবেন, প্রাণের টানে এ দেশের উপকার করছে?—যা কিছু করেছে বা করছে তা রাজত্বের ঠাট বজায় রাখবার জন্যে। হাঁসপাতাল বলুন—দু চারটে মিলিফ ফণ্ড বলুন, ফ্রেণ্ডিট্ সোসাইটি বলুন স্রেফ্—পলিসি!"

"স্বীকার করলুম—'পলিসি!' তোমরাও কেন পলিসি স্বরূপ তাই কর না!"

বুড়ী এতক্ষণ তাহাদের তর্ক শুনিতেছিল; এবং কিছু না বুঝিলেও, সরলা যাহা বলিতেছিল, তাহাতেই সে ঘাড় নাড়িয়া অনুমোদন করিতেছিল। হঠাৎ তর্ক থামিয়া গেলে সে কংগ্রেস-কর্ম্মীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তোমরা এসেছিলে বলে দুটো ভাল কথা শোনা গেল; আর একখানা কাপড়ও পেলাম—শীতের দিনে গায় দিয়ে বাঁচব!···হাঁ বাছা, তোমরা বেরাম্মোন?—পেন্নাম!"

৫

কংগ্রেসওয়ালারা দেখিল, সরলার দ্বারা খদ্দর বিক্রয়ের কাজ চালানো নিরাপদ নহে। মাসের মধ্যে যদি সে পাঁচখানা খদ্দর খয়রাৎ করিয়া বসে—এবং খদ্দরের তহবিল হইতে রোজ দু-চারি আনা দান করিতে থাকে, তবে কংগ্রেসের খদ্দর বিভাগে শীঘ্রই 'লালবাতি' জ্বালিতে হইবে!

কংগ্রেসের অর্থ ঐ প্রকারে অপব্যয় করিতে নিষেধ করিলেও সরলা শোনে না। বলে,—"আমার নামে খাতায় খরচ লিখে রেখো!" খাতায় খরচ লিখিয়া রাখিলে হিসাব দুরস্ত থাকে বটে, কিন্তু তহবিলের অবস্থা যে সুস্থ থাকে না, এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সকলেই সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছে—বিশেষতঃ (কংগ্রেস আপিসের জন্য কেহ বাড়ী ভাড়া দিতে রাজী না হওয়ায়) যখন তাহারা ভবশঙ্করের বাড়ীতেই আশ্রয় লাভ করিয়া আসিতেছে।

অবশেষে কংগ্রেসওয়ালাদের মাথায় এক ফন্দি আসিল। তাহারা এক দিন সরলাকে বলিল—"দেখুন, আমরা এই কংগ্রেস কমিটীর লাগাও একটা সেবা-সমিতি খুলিতে ইচ্ছা করছি। কিন্তু আপনি যদি তার ভার নিতে স্বীকার হন—তবেই সাহস করি খুল্‌তে!"

সরলার মনের মত কাজ হইবার উপক্রম দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"বেশ তো! আমি খুব রাজী আছি, তবে একবার বাবার মতটা নিই।"

পিতৃর মত পাইয়া সরলা সেবা-সমিতির যোগ্যা অধিনেত্রী হইবার প্রবল উৎসাহে ধাত্রী-বিদ্যা ও রোগি-পরিচর্য্যা সংক্রান্ত কয়েকখানা বাংলা বই আনাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ইতিমধ্যে এক দিন তাহার কাণে গেল—পুলিশের জমাদার শৈলজা সিকদার টাইফয়েড রোগে মরণাপন্ন, আর ওদিকে তার পত্নী প্রসব-বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের দুইজন সেবক এত দিন শুশ্রূষা করিতেছিল; কিন্তু তাহারাও ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। শৈলজা বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় মারা যাইতে বসিয়াছে।

সেদিন বড় দুর্য্যোগ!—সমস্ত দিন আকাশ অন্ধকার করিয়া মুষলধারে শ্রাবণের মেঘ বৃষ্টি ঢালিতেছিল—যেন বিধাতার সৃষ্টি ধুইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে! এই দুর্য্যোগে শৈলজার কথা শুনিয়া সরলা কংগ্রেসের আপিস-ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

সরলার মুখে সমস্ত শুনিয়া তাহারা মুনিজনতুল্য অনুদ্বিগ্নমনাঃ হইয়া বলিল,—"ওরা গওর্মেণ্ট-সারভেণ্ট···ওদের জন্যে আমাদের ভাবতে হবে না···ওদের লোকের অভাব হবে না—আপনি অত ব্যস্ত হবেন না!···কাল আমরা খোঁজ নেব'খন।"

সরলা দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—"কা—ল খোঁজ নেবেন!—হয়েচে!"

আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া সরলা সেই দুর্য্যোগে শৈলজার বাড়ীর দিকে চলিল।

(৭)

সরলার বাড়ী হইতে শৈলজার বাড়ী যাইতে সোজা পথ পড়ে থানার কম্পাউণ্ডের মধ্য দিয়া। এই পথে সরলা শৈলজার বাড়ী যাতায়াত করে। এক দিন মধ্যাহ্নে সরলাকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া পুলিশের এক কর্ম্মচারী তাহার এক সহকর্ম্মীকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—"অমন টুক্‌টুকে হাতের সেবা পেলে ঘাটের মড়াও, বাবা, বেঁচে উঠে!···শৈলজার বরাত আচ্ছা বল্‌তে হয়!"

অনুচ্চস্বরে বলিলেও কথাটা সরলার কাণে গেল। সে অমনি ফিরিয়া নিকটে আসিয়া বলিল—"শৈলজার কি আচ্ছা বলচেন, বাবা?"

পুলিশ-কর্ম্মচারী তাহার বে-ফাঁস কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"না, এই বলছিলুম, শৈলজার আচ্ছা বরাত বল্‌তে হবে যে, আপনার মত সেবা করবার লোক পেয়েছিল—"

সরলা সটান তাহার মুখের উপর বলিল—"না বাবা, আপনি ঠিক ও-ভাবে বলেন নি তো· যাই হোক্, অমন বল্‌তে নেই···আমরা যে মায়ের জাত!"

বলিয়াই সরলা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। দ্বিতীয় পুলিশের ভদ্রলোকটী বলিল—"কেমন, মুখের মত হ'ল তো?"

"আঃ, কি আর এমন বলে গেল?···তবে ওঁর সতীগিরি বের করছি—শীগগীর!"

"দোহাই, পঞ্চা, আর তোর পুলিশী বিক্রম দেখাতে হবে না!···নিজের দোষ স্বীকার করতে একটু শেখ!"

পঞ্চানন গুপ্ত মুখে আর কিছু বলিল না বটে, কিন্তু ইহার কয়েক দিন পরে সরলার স্বামী তাঁর স্ত্রীর চরিত্র-সংক্রান্ত এক বে-নামী পত্র পাইল।

(৮)

সে রাত্রে শৈলজার বাসায় জীবন-মৃত্যুর তুমুল লড়াই চলিতেছিল। সরলা পাশের ঘরে শৈলজার মূর্চ্ছিতা পত্নীকে কোলে লইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে সাংঘাতিক সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সরলার বাপ এক দিন বলিয়াছিলেন—ভগবানকে প্রাণভরে ডাকিলে কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না। সেইমত সরলা ভগবানকে ডাকিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু নিরাকার ভগবানকে সরলা আপন ধ্যানের মধ্যে ধরিতে গিয়া বার-বার বিফলতার অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজ রাত্রে সরলা আবার চক্ষু মুদিয়া ভগবানকে ডাকিতে চেষ্টা করিল। প্রথমে চক্ষু মুদিতে আধ-আলো, আধ-অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তার পর কেবল অন্ধকার;—ক্রমে সে অন্ধকার সুদূর প্রসারী সুড়ঙ্গের আকার ধারণ করিল। অনেকক্ষণ এইরূপে গেল। তার পর সে অন্ধকারের শেষ প্রান্তে জ্যোতির্ম্ময় একটা বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সেই বিন্দু দেখিতে দেখিতে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া দ্বাদশ সূর্য্যের প্রভায় সেই আঁধারের সুড়ঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই সেই জ্যোতির্ম্ময় সুড়ঙ্গের শেষভাগে মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট এক মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখা দিল। সরলা প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না। ক্রমে এই স্বর্ণাসন আলোক-তরঙ্গে যেন ভাসিতে ভাসিতে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অবশেষে সরলা বিস্ময়ে আনন্দে দেখিল, সে—তাহার স্বামীর মূর্ত্তি!

এই দৃশ্যে সরলা কতকটা অভিভূত হইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে কে তাহাকে তার স্বামীর কণ্ঠে ডাকিল—"সরলা!" চক্ষু চাহিতেই স্বামীকে দেখিয়া সরলা কোন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া কেবল ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমার শৈলজাকে বাঁচাও!"

সরলার স্বামী নরেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—"শৈলজা কে ?"

"আমার ছেলে।...যাও, শীগ্‌গির তাকে বাঁচাও।"

বে-নামী পত্র পাইয়া সরলার স্বামী যে জ্বালা লইয়া অতর্কিত ভাবে ছুটিয়া আসিয়াছিল, এখানে আসিয়া সরলার অবস্থা দেখিয়া সে জ্বালা মুহূর্ত্তে শীতল হইয়া গেল। শৈলজার বাটী প্রবেশের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা নরেশের মনে পড়িয়া গেল। নরেশ বলিল—"বাড়ী ঢুকিবার সময় এইমাত্র কে একজন আমার হাতে এই শিকড়টা দিয়ে বল্লে—'এইটে বেঁটে শৈলজার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিতে বলগে—' আমি শিকড়টা নিয়ে দু-পা এসে আবার পিছন ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই।"

মাসখানেক পরের কথা। শৈলজা সেই দৈব ঔষধেই মরণের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সরলার স্বামী এক দিন সেই বে নামা চিঠিখানা সরলার হাতে দিল। তাহা পাঠ করিয়া সরলা অনেকক্ষণ গম্ভীর হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। পরে স্বামীকে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ চিঠি বিশ্বাস করেছ ?"

নরেশ বলিল—"না, যদি তা করতুম, তবে তুমি আমি আজ এমন জ্যান্ত থাকৃতুম না! তোমার আড়ালে তোমার কত বড় শত্রু আছে, তাই শুধু জানিয়ে দিতে দেখালুম! হাঁ, একটা খবর এসে পর্য্যন্ত তোমায় দিই নি—"

"কি ?"

"আমি মদ ছেড়ে দিইচি।"

সরলা মৃদু হাস্তে বলিল—"কদ্দিনের জন্যে—শুনি ?"

"না ঠাট্টা নয়! জন্মের মতন।"

আনন্দে সরলার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সরলা জিজ্ঞাসা করিল—"তা এখন আমার সম্বন্ধে কি স্থির করলে ? এবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্চ তো ?"

"নিয়ে যেতেও লোভ হচ্চে, আবার এমন [illegible] কাজ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিতেও ক্ষোভ হচ্চে।"

"দোহাই তোমার! আর আমায় মহৎ কাজের লোভ দেখিও না...বিশেষতঃ সতীত্বের ওপর অপবাদের [illegible] নিয়ে আমি বড় কাজে মহীয়সী হতে চাইনে।"

নরেশ সরলার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—"তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।"

প্রচ্ছদপট

কার্ত্তিকের "ভারতবর্ষে"র প্রচ্ছদপটে যে মহাত্মার ত্রিবর্ণ চিত্র মুদ্রিত হইল, তিনি সুবিখ্যাত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। ব্রহ্মবান্ধব জন্মাবধি সংস্কারক। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম যৌবনে ইনি প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে গমন করেন। তথায় তিনি খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত মিলিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হন, এবং খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তৎপরে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি বিলাতে গিয়া অক্সফোর্ডে বেদান্তের ব্যাখ্যামূলক কয়েকটি বক্তৃতা করেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি "সন্ধ্যা" নামে প্রসিদ্ধ দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'সন্ধ্যা'র বিরুদ্ধে যে রাজদ্রোহের মামলা হয়, সেই মামলার রায় প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ২৭শে অক্টোবর প্রবল অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে অস্ত্রোপচারের ফলে ক্যাম্বেল হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজনীতিক সংবাদপত্র পরিচালনে ইনি অনন্যসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আমরা এই প্রকৃত দেশ-নেতার প্রতিকৃতি 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ প্রণীত "বাঙালীর খাদ্য" মূল্য ৷৷০ আট আনা
শ্রীমতী সাহানাদেবী প্রণীত "মালিকা" স্বরলিপি, মূল্য ১৲
ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পি-এইচ্-ডি প্রণীত "আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা", মূল্য ১৷০
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গুরুগোবিন্দসিংহ" জীবনী, মূল্য ১৲
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "শিক্ষা ও দীক্ষা" মূল্য ২৲
শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা সোম প্রণীত "দু'টী-প্রাণ" উপন্যাস, মূল্য ১৲
শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় কাব্যলঙ্কার প্রণীত "স্পর্শমণি" কাব্য, মূল্য—[illegible]
শ্রীসুখরঞ্জন রায় প্রণীত "হিমানীর বর" গল্পপুস্তক, মূল্য—১৷৷০
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত "রায়তের কথা" মূল্য—৶০
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "মহারাজা সীতারাম" নাটক, মূল্য—[illegible]
নজরুল ইস্‌লাম প্রণীত "সর্ব্বহারা" কাব্য মূল্য—১৷৴০
শ্রীঅমিয়কান্তি দত্ত প্রণীত "অদ্বৈতাচার্য্য" মূল্য—৶০
শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত "শাহজলাল" মূল্য—৷০
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ প্রণীত "শ্রীচৈতন্য" মূল্য—৷৴০
শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রণীত "ঠাকুরবাণী" মূল্য—৷৶০
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বিশী প্রণীত "নরনারী" মূল্য—১৷৷০

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

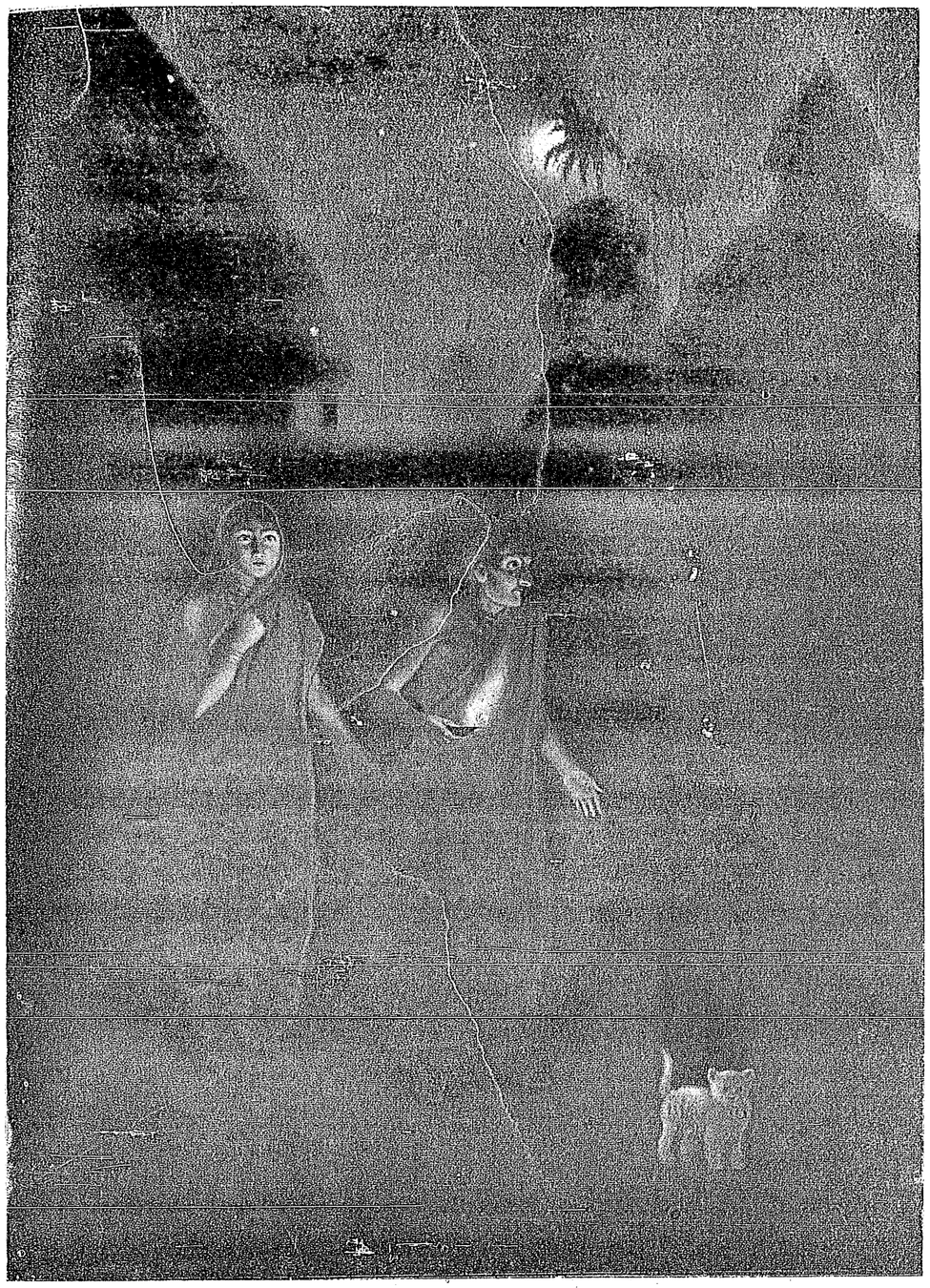

গোরা-হারা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রকাশিত।

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION